সুশীল রায়ের
গল্প-সঞ্চয়ন

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬০

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫-এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

॥ সুশীল রায় ॥

যে গল্পের শেষ নেই সে হচ্ছে মানুষের বিচিত্র জীবন। আশ্চর্য ছোটগল্পের মতই হঠাৎ তার আরম্ভ। পরতে-পরতে তার নানা অকল্পনীয় ঘটনার রঙের রসের পোঁচ লাগতে লাগতে হঠাৎ একদিন রাঙা হয়ে উঠেই হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া। তাইতেই জীবনের শেষ হয়, কিন্তু গল্পের হয় না। তাই জীবনের ন'টে গাছটি মুড়িয়েও যেখানে গল্প থামল না সেখানে বলবার জন্য কারও থাকা চাই। তিনি গল্প-লেখক। জীবনে গল্পের তাই এত দাম, লেখকের তাই এত সম্মান। জীবন-খাতার শূন্য পাতাগুলো যিনি আপন রঙে ভরিয়ে দিলেন আমাদের চোখের সামনে সেই স্রষ্টিকর্তার নেপথ্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার কৌতূহল বড়োই ক্ষুধার্ত। এই জন্যেই আজ সুশীল রায়ের জীবনের পাতাগুলো ইতিকথার পাতায় একটুকরো জলছবির ঢঙে ছাপা হল। জলছবির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে জলের লোভ দেখিয়ে ছবি দেখার তৃষ্ণাকে পুরো না মিটিয়ে বরং বাড়িয়েই দেয়।

জীবনে অনেক ধাক্কার টাল সামলাতে গিয়ে অনেক পাক খেয়েছেন সুশীল রায়। এই বিদগ্ধ জীবন অপরের ক্ষেত্রে কি কাজে লাগত জানিনে, কিন্তু সুশীল রায়ের শিল্পী-মন তাকে সংকাজেই লাগিয়েছেন। একই রোদে কেউ পুড়ে হয় খাক, কারও গায়ে ধরে পাক।

সুশীল রায়ের শুরুতে আসব এবার। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে তিনি উত্তরবঙ্গের রাজসাহী শহরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় শ্রীগোবিন্দ রায় ছিলেন ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি; তিনি ছিলেন রাজসাহীর সরকারী উকিল, জিলা-কংগ্রেসের সেক্রেটারী, 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে তাঁর অকালমৃত্যুতে অতি শৈশবেই সুশীলবাবুর ভাগ্য-বিপর্যয় উপস্থিত হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষার্থী-জীবন দ্রুততালে অগ্রসর হয়ে আসে। তাঁর ছাত্র-জীবন অনুসরণ ক'রে দেখলে দেখা যাবে তাঁর অস্থির চিত্ত চঞ্চলভাবে বিজ্ঞান বাণিজ্য-বিভাগ প্রভৃতি ঘুরে অবশেষে সাহিত্যে নির্বাণ লাভ করে। তিনি রিপন কলেজ থেকে আই. এস্-সি., বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. কম., ও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষায় এম. এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র-জীবন যখন এইভাবে ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেছে, সাহিত্যচর্চাও সেই সঙ্গে চলেছিল মহা-উৎসাহে। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে তাঁর কবিতা-রচনার সূত্রপাত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে, তখনো তিনি কলেজের প্রাঙ্গণ পার হননি, রচনা করেন 'একদা' নামক মনোরম উপন্যাসখানি। একটি মাত্র দিনের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস। এই 'একদা'র মাধ্যমেই সুশীল রায় একদা কখন্ সাহিত্য-রসিক ও পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বসলেন বলা শক্ত। নানা আক্রমণাত্মক সমালোচনায় উপল-প্রহত-প্রতিভা কিছুতেই রচনার ধারাকে শুদ্ধ হতে দেয়নি। লেখনী স্বচ্ছন্দ গতিতে ব'য়ে চলল।

এর পরে 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু' 'ত্রিবেণী' 'রুদ্রাক্ষ' এই তিনখানা উপন্যাস ও 'পাঞ্চালী' 'সুচরিতাসু' নামে দুখানা কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু'-ই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এখানা হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে। এছাড়া 'লক্ষ্মীহরণ নাট্য' 'কুলাঙ্গার' 'রাক্ষসী' 'মাথা' 'মধু গাউলি' প্রভৃতি বহু গল্প আছে যারা নিজেরাই সুশীলবাবুকে সাহিত্য-সমাজে চিরচিহ্নিত করে রাখবে। সুশীলবাবুর রচনাশৈলীতে একটা মিঠে সুর মেলে, মেলে হৃদয়-ঘনতার আমেজ। সুশীলবাবুর চোখ আছে খুঁটিয়ে দেখবার, অতি সহজ ভাষা আছে ফুটিয়ে তুলবার। তাঁর রুচি আছে, রসবোধ আছে।

নেপথ্যে বাস করাই এঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই বেনামের আড়ালে বসে তিনি কালিদাসের রঘুবংশ ও মেঘদূত কাব্যের অপূর্ব সাহিত্যিক আলোচনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'উদয়ন' ছদ্মনামে তিনি 'আলেখ্যদর্শন' পর্যায়ে এই দুই মহাকাব্যের বিচার করেছেন, সুধী-সাধারণের কাছে সে রচনা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। আর, 'অমরু' ছদ্মনামে আনন্দবাজারেই তিনি লিখেছেন 'জল্পনা ও কল্পনা' পর্যায়ে অনেকগুলি লেখা, এ রচনায় গল্পের আমেজ ও রম্যরচনার রস একত্রে মিশে সার্থক রচনা হয়ে উঠেছে। স্বনামে তিনি দেশ পত্রিকায় অনেকগুলি রম্যরচনা লিখেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। সুশীল রায় জাত-কবি। একালে দীর্ঘকাব্য রচনা প্রায় উঠে গিয়েছিল; সুশীলবাবু কাব্যের সে অপবাদ দূর করেছেন। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে দু'টি দীর্ঘকাব্য রচনা করেছেন, 'সুলভার তপস্যা' ও 'সুভদ্রা-প্রণয়কথা'—১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সনের আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ দোল-সংখ্যায় এই কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়েছে।

জীবন তাঁর কর্মবহুল। ছোট-বড় বহু কাজই তিনি করেছেন অস্থিরভাবে, অস্থায়ীভাবে। টুথ-পাউডারের ক্যানভাসিং থেকে শুরু করে মেডিকাল কলেজে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টান্ট-গিরি, সরকারী চাকুরী, পত্রিকা সম্পাদনা, শিক্ষকতা ইত্যাদি নানাকাজের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে বিশ্বভারতীতে কাজ করেন।

—'ইতিকথা' থেকে উদ্ধৃত। সংশোধিত



প্রস্তাবনা

ভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার প্রয়োজন নেই; পৃথিবীর যে-ক'টি সেরা সাহিত্য তার দরবারেও বাংলা ছোটগল্পের স্থান কিছু তুচ্ছ করবার মতন নয়। কাব্য ও উপন্যাস নিয়ে নানা চিত্তে নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নাটক নিয়ে তো বটেই; কিন্তু বাংলা ছোটগল্প বৃহৎ সাহিত্য-দরবারেও নিঃসংশয়ে নিজের আসন দাবি করতে পারে। সে দাবির অধিকার রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়ে গেছেন এবং সেই থেকে শুরু করে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের ভেতর বাংলা ছোটগল্প যে দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠেছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। এত স্বল্পকালের ভেতর এমন সুষ্ঠু এবং স্বাস্থ্যময় বিবর্তনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

বর্তমান বাংলা ছোটগল্পের রূপ, তার আকৃতি-প্রকৃতি, গঠননৈপুণ্য, কাঠামো, ভঙ্গী ও সাজসজ্জা—একান্তভাবে ধার করা না হলেও বহুলাংশে যে ইংরেজি-ফরাসী-জার্মান-রুশীয় ছোটগল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ফলে গড়ে উঠেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, লাভও নেই, প্রয়োজনই বা কি! কিন্তু বাঙালী লেখক পৃথিবীর এই ঐশ্বর্যকে যেভাবে আত্মস্থ করেছেন, পরদেশী বীজ ও কলমের চাষ করে যে সমৃদ্ধ ফসল ফলিয়েছেন নিজের জমিতে, তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ—প্রভাতকুমার—প্রমথ চৌধুরী—শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের যে-কোনো জনপ্রিয় গল্পলেখক পর্যন্ত তার পরিচয় সুবিস্তৃত।

তবু, আঙ্গিকের সৌষ্ঠব, গঠনের নৈপুণ্য, ভাবাকাশের বিস্তৃতি, কল্পনা-ভাবনার গভীরতা সূক্ষ্মতা ও সমৃদ্ধি ইত্যাদি বাংলা ছোটগল্পে যতই-না থাকুক, তার ভেতর জীবনের যে-পরিধি ধরা পড়ে সে-পরিধি সংকীর্ণ, স্বল্প-পরিসর, একথা স্বীকার করতেই হয়। তার হেতু বাঙালী

জীবনের মধ্যেই; সে জীবনও আজ পর্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর। বৃহত্তর জীবনের তরঙ্গময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজও আমাদের পরিচয় ঘটবার সুযোগ কম। এই সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসর জীবনেরও সমগ্রতা সাধারণত আমাদের লেখকদের চেতনায় বস্তুঘনিষ্ঠতায় ধরা পড়ে না। তার প্রধান কারণ, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লেখক সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা, ভাবনাকল্পনা, উত্তরাধিকার প্রভৃতির সঙ্গে দেশের বৃহত্তর চেতনার সুদীর্ঘ ও গভীর বিচ্ছেদ, যে-বিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে গত দু'শ বছর ধরে।

এরই ভেতর, অবান্তর হলেও একটা কথা মূল্যবান বলে মনে হয়। আজ না হোক্, পঞ্চাশ বছর পর যদি কেউ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের ইতিহাস রচনা করতে বসেন তাহলে তাঁর সবচেয়ে বড় দলিল হবে বাংলা ছোটগল্প; সে-ইতিহাস আদমসুমারীর বিবরণে বা সরকারী লাল-নীল-সাদা পুঁথিতে ততটা মিলবে না। বাংলা ছোটগল্পের লেখক বাঙালী মধ্যবিত্তের নানা স্তরের বস্তু ও ভাবপুঞ্জ যে-রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, যে-সত্য ও গভীর পরিচয় বহন করে এনেছেন সে-পরিচয় ও বিশ্লেষণ আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান গল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

সুশীল রায়-মশায় সাম্প্রতিক বাংলার সেরা ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে অন্যতম; তার শক্তি ও প্রতিভা ইতিমধ্যেই বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভূমিকা লিখে তাঁর পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন, অবান্তরও বটে। জানি, ব্যক্তিগত ভাল বা মন্দ লাগার সঙ্গে সাহিত্যবিচারের কোনো সম্বন্ধ নেই, তবু, বলতে ইচ্ছে হয়, সুশীলবাবুর এই গল্পগুলি আমার ভালো লেগেছে, আমি খুব খুসী বোধ করেছি গল্পগুলি পড়ে। তা ছাড়া, আমি তো সুশীলবাবুর সাহিত্যবিচার করতে বসিনি।

সুশীলবাবু গল্প ফাঁদতে জানেন, শেষ করতে জানেন, এবং গল্প

বলবার কৌশল তাঁর আয়ত্তে। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের অনুবৃত্তি করে বলা যায়, এই রচনাগুলি ছোটও বটে, গল্পও বটে। সুশীলবাবুর ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ; বাক্যগুলি ছোট, তাদের গতি মাঝে মাঝে আচমকা, কিন্তু সর্বত্র সহজ ও সাবলীল; কথাবার্তা খুব ঘরোয়া, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এবং মধ্যবিত্ত ধ্যানধারণা ও ব্যবহারাকাশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বস্তুঘনিষ্ঠ। গল্পের কাঠামো আঁটসাট, গড়ন ধারালো। কল্পিত ঘটনা বস্তুজ্ঞানকে কোথাও আঘাত করে না, খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মনে স্বীকৃতিলাভ করে। কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে সুশীলবাবু পাঠকের চমক লাগাতে ভালবাসেন, এবং সে-কাজে তিনি নিপুণ। হঠাৎ বাঁক ফিরিয়ে দেওয়ার, আচম্‌কা একটা পরিণতি দানের কাজটা খুব সহজ নয়; অথচ কয়েকটি গল্পেই তিনি অত্যন্ত সহজে অথচ সুকৌশলে এই দুরূহ কাজটি করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের নানাস্তরে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও গভীর, এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, একটা সহানুভূতির সুর সর্বত্র প্রত্যক্ষ এবং তাঁর ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গীর ভেতর দরদের লেশমাত্রও যাতে ধরা না পড়ে সে-চেষ্টা তিনি সজ্ঞানে করেছেন।

সুশীলবাবুর এই গল্প-সঞ্চয়ন পাঠকসমাজে আদৃত হবে, এই বিশ্বাস রাখি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পয়লা বৈশাখ, ১৩৬০

সূচী

এই গল্পগুলি নির্বাচনে সহায়তা করেছেন
শ্রীমতী কল্যাণী প্রামাণিক। তাঁকে
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুশীল রায়ের গল্প-সঞ্চয়ন

মাথা

অনেক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করেছে মালতী। কিন্তু কিছুতেই শোয়াটা জুৎসই হচ্ছে না। শব্দ করে হাতপাখা নাড়ছে, তবুও ঘাম শুকোচ্ছে না। সেমিজ ভিজে গেছে, কোমরের কাছটাও স্যাঁৎসাঁ্যাৎ করছে।

দুপুরে দুবার দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তবুও গরম কমল না। কমল তো না-ই, বরঞ্চ এখন আরও যেন বেড়েছে। কিছুক্ষণ আগে দশটা বেজেছে, এখন ঘড়িতে ঠিক কয়টা, দেখার ইচ্ছে হল মালতীর, কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় না।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। হেরম্ব কাগজ দিয়ে হারিকেনের আলো আড়াল করে মাথা গুঁজে পড়ছিল। মালতী বলল, এক মিনিট। ঘড়িটা দেখব।

হেরম্ব মাথা তুলল না, কথা বলল না। আপত্তিও করল না, অসুবিধেও জানাল না।

হারিকেন উঁচু করে তুলে ধরে মালতী দেয়ালের ঘড়ি দেখল—দশটা কুড়ি।

—এখন শোবে নাকি ?

হেরম্ব সাড়া দিল, বলল, হুঁ।

—তবে এস। যেমন গরম লাগছে, তেমনি ঘুম পেয়েছে আমার।

অনেক্ষণ কেটে গেল। হেরম্ব শুতে এল না।

বাইরে হুস-হুস শব্দ শুনে মালতী সোজা হল। কাৎ হয়ে শোয়ায় একটা কান বালিশে চাপা ছিল। শব্দটা ভালো করে শোনার জন্যে চিৎ হয়ে শুল। ট্রেন নাকি? না, বৃষ্টি।

বিছানা ছেড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে পড়ল। নিজের মনেই সে বলল, অন্ধকারের আড়ালে তাহলে খুব তোড়জোড় হচ্ছিল এতক্ষণ। উঃ, বাঁচোয়া।

হেরম্ব বলল, কি হল?

—বৃষ্টি।

—কোথায়?

মালতী বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার মাথায়।

হেরম্বর আর উত্তর না পেয়ে মালতী তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, আলোটা কমিয়ে দিল।

হেরম্ব চমকে উঠে বলল, হল কি?

—বৃষ্টি।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল হেরম্ব। কোনো উত্তর না পেয়ে মালতী বলল, কোথায় বৃষ্টি জিজ্ঞেস করলে না তো। একবার উঠে এসে দাঁড়াও জানলায়, মাতামাতি-দাপাদাপি দেখে যাও একবার।

—কাদের?

—তাল-নারকেলের, বিদ্যুতের, হাওয়ার, মেঘের।

হেরম্ব উঠে এল, মালতীর পাশে এসে দাঁড়াল জানলায়, অনেকক্ষণ বাইরে চেয়ে রইল, কিছু দেখতে পেল না, বাইরেটা নিরেট অন্ধকার, বৃষ্টিও যেন গলা-আঁধারের মত ঝরছে।

—কই, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

—দেখবে, দাঁড়াও, চম্‌কাক।

—কে?

—বিদ্যুৎ।

চমকে উঠল হেরম্ব, বলল, মাথা খারাপ হয়েছে।

মালতী বলল, তোমার।

এর পর আর কোনো কথা নেই কারো। দু'জনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে যেন অন্ধকার দেখছে, আর বৃষ্টির শব্দ শুনছে অকারণে। এমন সময় ডেকে উঠল মেঘ, দুভাগ হয়ে ছিঁড়ে গেল আকাশ।

মালতী বলল, দেখলে?

—ভারি সুন্দর তো।

—কে?

হেরম্ব বলল, তুমি। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম।

ওই বিদ্যুতের মতই চমকে উঠল মালতী। এমন কথা হেরম্ব বলতে জানে, তা সে জানত না। এমন কথা শোনার জন্যে তৈরিও ছিল না সে। তার কেবল ইচ্ছে ছিল, বৃষ্টির অছিলা করে হারিকেনের সামনে থেকে তাকে তুলে আনা, বইয়ের পাতা থেকে তার চোখ দুটোকে অন্যদিকে ছড়িয়ে দেওয়া।

—তবে যে সবাই বলে আমি কালো।

—কালোই তো। ফর্সা বলল কে?

মালতী একটু ভাবল, বলল, না, কেউ না।

অনেক কথা বলার ইচ্ছে হল মালতীর। কথা বলার এমন সুযোগ হয়তো আর আসবে না। এমন বৃষ্টি কি রোজ নামে? এই শব্দের মধ্যে নিজের কথাগুলো আজ যদি সে শুনিয়ে দিতে পারত হেরম্বকে। কেউ শুনতে পেত না। পাশের কামরায় দিদিরা নিশ্চয় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হেরম্ব ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, আমাকে কেমন দেখতে পেলে, তা তো বললে না।

মালতী দম নিয়ে বলল, ভীষণ ভালো, ভারি গম্ভীর।

দরজার ওপাশ থেকে কুন্তলা-দিদির গলা এলো—তোরা এখনো জেগে? জানলা দিয়ে ঘরে জল আসছে না তো?

মালতী সাড়া দিল, বলল, আমাদের জানলা বন্ধ।

—এদিকে আমরা তো ভিজে কাঁথা হয়ে গেলাম, মণির পায়ের তলা দিয়ে জল গড়াচ্ছে, ঘুলঘুলি দিয়ে ছাট এসে মেঝে ভিজে গেছে একেবারে। দরজাটা খোলো একবার।

হেরম্ব ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

মালতী ইশারায় বলল, মাথা।

ফিসফিস করে হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, কার?

মালতী হেরম্বর হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, রক্ষে কর। জানি নে।

দরজা খুলতেই দিদি রুখে উঠলেন, আছ বেশ আরামে। শুকনো খটখটে ঘরে পুটপুট করে কথা হচ্ছে। একবার ডেকেও তো জিজ্ঞেস করতে হয়। নর্দমা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে গেলাম কিনা, জানতে তো হয়। জান তো ছাদ ফাটা, জানলার পাল্লা নেই, ঘুলঘুলি বন্ধ করা হয় নি।—আমরা এ ঘরে শোব। উপায় নেই।

হেরম্ব বলল, নিশ্চয়।

মালতী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুন্তলা বাধা দিল, বলল, থাক্, আর ভদ্রতায় কাজ নেই, কৈফিয়তের দরকার নেই। মণি, মায়া, উঠে এস।

মেঝেয় ঢালা বিছানা করে কুন্তলা তার দুই মেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

মালতী হারিকেন হাতে নিয়ে দেয়ালের গায়ে পেরেক খুঁজছিল, কুন্তল বলল, থাক্, মশারি টাঙাতে হবে না। জলে যখন ভেসে যাই নি, মশাও তখন উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

মালতী হঠাৎ শব্দ করে উঠল, উঃ।

হেরম্ব ব্যস্ত হয়ে বলল, কি হল?

শঙ্কিত হয়ে মালতী কুন্তলার দিকে একবার তাকিয়ে নিল, বলল, কিছু না, গরম।

কুন্তলা বলল, এত বর্ষায়ও তোমার গরম গেল না বৌ। ও তোমার টাকার গরম—বাপের টাকার। ওসব ভোলো, এখন যেমন ঘরে এসেছ, তেমনিভাবে মানিয়ে নাও নিজেকে।

হেরম্ব জিজ্ঞেস করল, কিসের টাকা?

কুন্তলা বলল, ওসব দিয়ে তোমার দরকার নেই, হেরম্ব। তোমার কাজ তুমি কর। পড়তে হয় পড়, শুতে হয় শোও।

মালতী পাশের ঘরে চলে গেল। হেরম্ব হারিকেনের কাগজ ঠিক করে বসে গেল টেবিলে।

কুন্তলা চাপা গলায় হেরম্বকে বলল, বৃষ্টি-বাদল দেখা তোমার কাজ নয়, ওসবে মাথা ঘামিয়ো না। নিজের কাজ কর, পড়।

কুন্তলা শুয়ে শুয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকাল। মালতী চৌকির উপর টান হয়ে শুয়ে পড়েছে।

—একটা বালিশ নিয়ে গেলেই হয়।

হেরম্ব বলল, দিয়ে আসব?

—তোমার কাজ তুমি কর, হেরম্ব। মেয়েদের কথার মধ্যে এস না। তোমার ভুললে চলবে না যে, তুমি পুরুষ মানুষ।

এর পর চুপচাপ হয়ে গেল সব। হেরম্ব বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। আশ্চর্য হয়ে গেল সে নিজেই। এমন তো তার কোনোদিন হয় না—বই নিয়ে বসে অন্য কথা মনে হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, কেবলই মনে হচ্ছে ভিজে যাচ্ছে মালতী।

সত্যি, মালতী ভিজে গেছে একেবারে।

হারিকেন কমিয়ে দিল হেরম্ব। কুন্তলার নিশ্বাসের শব্দ শুনল কিছুক্ষণ। তার পর উঠে এল, পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গেল। কই, ঘর তো ভিজে

নয়। অন্ধকারে হাতড়ে মালতীর গায়ে হাত দিল। পাশ ফিরে শুয়ে মালতী বলল, থাক্।

ফিরে এসে হেরম্ব টেবিলে বসল, কিন্তু আলো বাড়াল না।

সকালবেলা হেরম্ব মালতীকে বলল, তুমি কাল কেঁদেছ, আমি জানি।

—কিচ্ছু জান না। কাঁদব কেন? বলেই মালতী বাইরে চলে গেল।

মণিকে পেটে নিয়ে দিদি বিধবা হয়েছেন, সে আজ তের-চোদ্দ বছরের কথা। মায়া এখন ডাগর হয়ে উঠেছে, মণিও দু-এক বছরের মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠবে। কুন্তলাদির নজর সেদিকে পুরোদস্তুর।

বাড়িতে দুটি ঘর। একটা ঘরে ব'সে হেরম্ব পড়াশুনা করে, তার ইস্কুলের ছাত্ররা এসে ভিড় করে; আর-একটা ঘরে পলিটিক্স করেন কুন্তলাদি, তাঁরও সাঙ্গোপাঙ্গো আসে অনেক। মাঝখান থেকে একা পড়ে যায় মালতী। ছাত্রদের দলে ভিড়ে ছাত্র হয়ে যাবে, না, দিদির দলে ভিড়ে তাঁর সঙ্গী হয়ে যাবে—এমন দ্বন্দ্বে তাকে পড়তে হয় মাঝে-সাঝে। দ্বন্দ্বের যখন কোনো মীমাংসা না হয়, তখন সে গিয়ে বসে থাকে রান্নাঘরে। সেখান থেকে চা সাপ্লাই করে কুন্তলাদির ঘরে।

শেখর চায়ে চুমুক দিয়েই তারিফ করে উঠল, চমৎকার। কে তৈরি করল, কুন্তলাদি? মণি, না, মায়া?

—না, বৌ করেছে।

শেখর বলল, এও একটা আর্ট, চা করাটা।

কুন্তলাদি বলল, আর্ট কি সায়েন্স জানিনে, রোজ তৈরি করে করে হাত পেকেছে—এই আর কি।

মণি ছুটে ভিতরে এসে বলল, তোমার চা নাকি বেশ মিষ্টি হয়েছে আজ, শেখর-মামা বলছে।

—চিনি বেশি পড়েছে হয়তো।

মণি বলল, তা হতে পারে।

হেরম্বর ছাত্রদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। তারা চলে যাচ্ছে একে একে। এইবার হেরম্বকেও তৈরি হতে হবে। ইস্কুলের বেলা হয়ে এল। মালতী রান্নাঘর গোছগাছ করে বেরিয়ে এল। ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, হেরম্ব কাগজ দেখছে।

মালতী কাছে গিয়ে বলল, এবার উঠবে না?

হেরম্ব চোখ তুলে বলল, কোথায়?

মালতী অন্যকিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তা না বলে বলল, ইস্কুলে যেতে হবে না?

—বাজল ক'টা?

মালতী হেরম্বর মাথার ওপর বাঁ হাত ও চিবুকের নীচে ডান হাত দিয়ে তার মাথা টেনে তুলল উপরে, বলল, ওই যে ঘড়ি, দেখে নাও।

—সময় আছে।

—নেই। দাড়ি কামাতে হবে আজ। হয় দাড়ি রাখবে, নাহয় রোজ কামাবে—মাঝামাঝি কিছু চলবে না।

হেরম্ব বিব্রত গলায় বলল, আদেশ করছ যে।

—না, অনুরোধ।

অনুরোধ রক্ষা করতে অনেকটা সময় লাগল। পনেরো-ষোলো বছর ধরে দাড়ি কামিয়েও তার হাত চালু হল না। মুখ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল অনেক। মুখের উপর ক্ষুর ঘষে আর মাঝেমাঝেই জিজ্ঞাসা করে, টাইমের দিকে চোখ রাখছ তো, মালতী? ঘণ্টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছতেই হবে। মাস্টারমশাইরা যদি সময় না মানে তাহলে ছাত্রদের দিয়ে মানিয়ে নেবে কি করে?

—এই হুঁশটা পাঁচ মিনিট আগে হলেই তোমার গালের দিকে চোখ দিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না আমাকে। যেমন বেপরোয়া ক্ষুর টানছ—আনাড়ির মত।

হেরম্ব মুখ নানাভাবে বিকৃত করে দাড়ি কামাতে লাগল, এর যেন আর শেষ নেই।

দিদির গলা, কুন্তলাদির। বললেন, চা করতে না হয় ওস্তাদ হয়েছ, লোকে তারিফ-টারিফ করে। দাড়ি-কামানোর আর্টও রপ্ত করেছ বুঝি। পেয়েছ ভালোমানুষ, তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নেবার তাই নানান ফিকির খুঁজছ। ওসব ছাড় বৌ। নিজের কাজে যাও।

মালতী নিজের কাজে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে কোনো কাজ খুঁজে পেল না। রান্না-বান্না শেষ হয়ে গেছে। হেরম্বর জন্যে আসন পাতা হয়েছে, গেলাশে জল ভরে রাখা হয়েছে আসনের পাশে। এবার কাকস্নান সেরে সে এসে বসলেই মালতী ভাত বেড়ে দিতে পারে।

কুন্তলাদিদের পার্টির সেদিন মিটিং ছিল। দু মেয়েকে নিয়ে তিনি বিকেলেই বেরিয়ে গেছেন, বলে গেছেন, ফিরতে রাত হতে পারে। রাত্রে আর ভাত খাবেন না—রুটি। মালতী যেন রুটি সেঁকে গরম জলে ধুয়ে রাখে, তা না হলে চিবনো যায় না।

রুটি নাহয় সে করে রাখবে, সেটা বড় কথা নয়। তার যে আজ ছুটি এইটেই মস্ত লাভ। বিকেলে হেরম্ব যদি ইস্কুল থেকে সটান চলে আসে, তাহলে মালতী নির্ভয়ে নির্ভাবনায় তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবে, কয়েকটা কথা জানতে চাইবে। আড়াই বছর হয়ে গেছে, এর মধ্যে একদিন হেরম্বকে সে আড়ালে পেল না, এটা তার মস্ত আক্ষেপ। হেরম্ব বাস করে যেন কোন্-এক সুদূর রাজ্যে; হাত বাড়িয়ে যদি-বা কখনো সে রাজ্যের নাগাল পাওয়া যায়, কিন্তু তখনি কুন্তলাদি তার আলুলায়িত কুন্তলের চিক নামিয়ে তাদের মাঝখানে একটা ব্যবধানের বেড়া টেনে দেন। মালতী লক্ষ্য করছে, কুন্তলা তাকে হেরম্বর কাছে ঘেঁষতে দিতে চায় না। কেন?

হেরম্ব বলল, দুর পাগোল। দিদিকে অমন ভাবো কেন? অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক, তাই হয়তো কখনো তাঁর ভুল হয়ে যায়।

মালতী কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তার পর বলল, শুধু তোমার দিদিই সরল নন, তুমিও অত্যন্ত সরল। তুমিও ভুলে যাও, আমরা স্বামী-স্ত্রী।

—তার মানে ?

—এরও মানে চাই ? হিসেব কর, বিয়ে করেছ কবে। মালতী হেরম্বর হাতে পেন্সিল গুঁজে দিল, সামনে খাতা টেনে দিল, বলল, ভাবতে হবে না, মানসাঙ্ক নয়, কাগজে লিখেই বল।

হেরম্ব বিব্রত হয়ে বলল, জানি নে অত হিসেব।

—জান না ? এই সামান্য অঙ্কটাই পারলে না ? তবে যে অত মাথার গর্ব। তবে যে অত মেধার বড়াই। রাগে হাঁফাতে লাগল মালতী, বলল, বাবারই মাথা খারাপ হয়েছিল।

হেরম্ব এতক্ষণে কিছু যেন বুঝল, বলল, তোমার বাবার কথা বলছ ?

—না, বলছি তাঁর মাথার কথা।

হেরম্ব ছেলেমানুষের মত বলল, তোমার কি যেন হয়েছে, কথার খেই হারিয়ে ফেলছ।—বলছিলে তো আমার মাথার কথা।

মালতী বলল, না না না, তোমারও নয়, বাবারও নয়, আমার। আমারই মাথার কথা বলছি।

একটু থেমে বলল, ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি করলে কেন অত ?

হেরম্ব এবার বিরক্ত হয়েছে, বলল, সর, কাজ আছে।

—মস্ত পণ্ডিত।

হেরম্ব আড়-চোখে একবার মালতীর দিকে তাকাল, কিছু বলল না। সত্যি সত্যি তাকে পণ্ডিত বলে স্বীকার করল, না, তাকে বিদ্রূপ করল—ঠিক বুঝল না সে। না, বিদ্রূপ করবে কেন, মালতী তেমন মেয়েই না। হেরম্ব বই খুলে বসল।

নলিনাক্ষবাবুর জীবনে ট্র্যাজিডি আছে। কিন্তু তাঁর বাইরেটা দেখে সে কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝবার উপায় নেই। তিনি নিজেকে কেবল আর-পাঁচজনের

কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখেন নি, নিজের কাছ থেকেও গোপন করে রেখেছেন। তিনি নিজেকেও জানতে দিতে যেন চান না যে, তিনি জীবনে কিছু চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। তাই সর্বদাই তিনি নিজেকে হাসি আর ফুর্তির মোড়ক দিয়ে মুড়ে রাখেন। মেধা নলিনাক্ষবাবুরও ছিল, মেধাবী বলে খ্যাতিও ছিল তাঁর। কিন্তু নিজের সেই ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে পারলেন না, এই হচ্ছে তাঁর আক্ষেপ।

বারো বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলেন, সতেরো বছরে যখন পা দিয়েছেন, তখন মারা গেলেন তাঁর মা। সম্বল গেল, অবলম্বন গেল। প্রথমটা নলিনাক্ষ মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে চাঙ্গা রাখলেন। বলা যায় না, হয়তো তাঁর মেধাই তাঁকে এ শক্তি দিয়েছিল। তিনি নিজেই এ কথা বলেন। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কোনো আশা-ভরসা না পেয়ে, কারো কাছে কোনো আশ্রয় না পেয়ে তিনি নন্দনগাছির বাড়ি থেকে একদিন ভোর রাত্রে হেঁটে রওনা দিলেন ভাগ্যের অন্বেষণে। তার পরের ইতিহাস নাকি অনেক লম্বা। মাঝের অজস্র টুকরো অধ্যায় বাদ দিয়ে তিনি বলেন, পেয়ে গেলাম ; অনেক হোঁচট আর হয়রানির পর ভাগ্যকে পেয়েছি আজ, রিটায়ার করেছি, দেড় হাজার পেন্সন পাচ্ছি আজ। গোপন করে লাভ নেই, ব্যাঙ্কেও আছে কিছু।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই সময় কেটে যায় অনেক। বেশি বয়সে বিয়ে করেন। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বছর-দশ হল। একটি মাত্র মেয়ে। তার উপরেই সবটা স্নেহ, তার উপরেই সব ভরসা। হো হো করে হেসে ওঠেন নলিনাক্ষ, বলেন, আমার মত সুখী কে।

কিন্তু এ সুখ নাকি চান নি তিনি, তিনি চেয়েছিলেন অন্য সুখ। এত টাকাও নাকি নয়, এত পয়সাও নয়। নিজের মেধার চর্চা করার একটা সুযোগই ছিল তাঁর চাহিদা। সেই সুযোগ যাতে পান, সেইজন্যে দাঁড়াবার একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজতে গিয়ে জোগাড় হল ছোট চাকরি। ছোট

চাকরিটা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে মস্ত বড় হয়ে উঠল যেদিন, সেদিন চমকে উঠলেন নলিনাক্ষ—আয়নায় চোখে পড়ে গেল, শুধু মাথায় চুলে নয়, জ্রতেও পাক ধরেছে। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি, মেধাটা তাহলে মাঠে মারা গেছে। চাকরির ঘানিতে জীবনের সার নিঙড়ে বার হয়ে গেছে একেবারে।

—সুতরাং আমি চাই, তোমাকে দিয়ে আমার জীবনের সাধ মেটাতে।

মালতী উল বুনছিল আর বাবার জীবনের কাহিনী শুনছিল, বলল, কঠিন দায়িত্ব।

নলিনাক্ষ মেয়েকে উপদেশ বড়-একটা দেন না, কিন্তু আজ তাঁর জীবনের যবনিকা কি করে যেন ফাঁক হয়ে গেছে একটু। তিনি বললেন, খুঁজে নিতে হবে একটা ধ্রুবতারা। সেইটে হবে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো যদি নাও যায়, ক্ষতি নাই। ওই ধ্রুব-লক্ষ্য চোখের সামনে রেখে রওনা হলে যতটাই কেন-না এগনো যাক, ততটাই লাভ। টাকার উপর মোহ যেন না আসে, ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ যেন না হয়। মানুষের মত বাঁচবার এই একমাত্র উপায়।

কোল থেকে পড়ে উলের গুটিটা গড়িয়ে গিয়েছিল। মালতী উঠে গিয়ে গুটি কুড়িয়ে আনল।

নলিনাক্ষ বললেন, ঠিক। আসল লক্ষ্যে গিয়ে ছোঁ মারতে হবে এইভাবে। উপলক্ষ্য ধরে টানলে লক্ষ্যের নাগাল মেলে না। যদি সুতো ধরে টানাটানি করতে তাহলে ওটি গড়িয়ে যেত, পেতে না ওকে।

মালতী বাবার মুখের দিকে তাকাল। তার আশ্চর্য লাগছিল। বাবা হাসিখুশি বটে, কিন্তু এমনভাবে প্রাণ খুলে অন্তরঙ্গ আলাপ এর আগে কখনো তো করেন নি।

—তোমার কি আজ শরীর খারাপ?

নলিনাক্ষ হাসলেন না, বললেন, শরীর ঠিক আছে। কেন, খারাপ দেখাচ্ছে নাকি?

মালতী উল থেকে চোখ তুলে বলল, না। বেশি কথা বলছ কিনা।

নলিনাক্ষ বললেন, তবে চুপ করে বসে থাকি।

বুননটা আর গুটিটা নামিয়ে রেখে মালতী উঠে এসে বাবার হাত ধরল, না না, বল।

নলিনাক্ষ আজ প্রথম তাঁর জীবনের পুরো কাহিনী বলতে শুরু করলেন। ছেঁড়া খোঁড়া টুকরো অধ্যায়গুলোও জোড়াতালি দিয়ে বলে গেলেন সব।

আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক কাহিনীর মত শোনাচ্ছিল মালতীর কাছে। বিকেল গড়িয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্তির বাড়তে লাগল, তবু সে কাহিনীর যেন শেষ নেই।

—এত স্ট্রাগ্‌ল্ করেছ? মালতী ডুকরে ওঠার মত করে বলল।

—স্ট্রাগ্‌ল্ নয়, সত্তারক্ষার জন্যে সংগ্রামও নয়, একে বলে জীবনধারণের জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি। সত্তা রাখতে পারি নি, জীবনটাই কেবল জীইয়ে রাখা গেছে।

পর দিন থেকে মালতী তার বাবার দিকে তাকায়, আর মনে হয়, এ যেন একটা নতুন মানুষ। এই আসল মানুষটা এতদিন একটা নকল মুখোশ পরে কিভাবে নিজেকে হাসি-খুশি দিয়ে মাতিয়ে রেখেছে, এইটেই তার আশ্চর্য লাগছে ভয়ানক। কাল যে দায়িত্বটাকে সে কঠিন বলে ঘোষণা করেছে, তা তার কাছে আজ অতি সহজ আর সোজা বলে ঠেকছে। তার বাবার ইচ্ছে ছিল, তিনি হবেন মস্ত পণ্ডিত, কিন্তু হয়ে গেলেন মাত্র একজন বড় দরের চাকুরে। তার বাবার এ ট্র্যাজিডির মানে বুঝতে পেরেছে মালতী। বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধা অগাধ, সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে এবার মিশে গেল সহানুভূতি। স্ট্রাগ্‌ল্ করার জন্যে মালতীর হঠাৎ আগ্রহ এসে গেল অসীম।

মেয়ের মনের ইচ্ছের আভাস পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন নলিনাক্ষ। বললেন, সংগ্রাম চাও? ওটা চেয়ে পাওয়ার জিনিস নয়; ওটা হচ্ছে পেয়ে গ্রহণ করার। আমার ইচ্ছে, তুমি সাধারণ মেয়ে হয়ে থাকবে না, তুমি হবে অনন্যসাধারণ। তার জন্যে তৈরি হও।

কয়েকদিন ধরে মালতী অনেক ভাবছে। কি করে অনন্যসাধারণ হওয়া যায়, কি করলে পাঁচের মধ্যে একজন না হয়ে হওয়া যায় পঞ্চম।

ছুপুরে কলেজে যাওয়া আছেই। কলেজ থেকে ফিরে বিশ্রাম নেওয়া। বিশ্রাম সে বাতিল করে দিল। বিকেলে হিন্দী ক্লাসে ভর্তি হল। সেখান থেকে ফিরে সে বসে সেতার নিয়ে। তার পর বাবার সঙ্গে মুখোমুখী বসে রাত্রের আহার শেষ করে। বাবা তাঁর শোবার ঘরে যান, মালতী নিজের ঘরে এসে বই খুলে বসে। রাত বারোটা, কোনো দিন আরও বেশি রাত অবধি সে পড়াশুনা করে। কোন্ এক ডাক্তারের লেখা পড়েছে—চার ঘণ্টা ঘুমই নাকি শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর চারটেয় ওঠে। বই খুলে বসে তখনই ; কলেজের পড়া, হিন্দীর পাঠ শেষ করে সে বাড়ির কাজে হাত দেয়। চরকির মত ঘুরে সারা বাড়ি সাফ করে। চাকর আর চাকরানীদের অনেক কাজ হাল্কা করে দেয় সে।

নলিনাক্ষবাবু লক্ষ্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন্তব্য করেছেন না কিছু। মালতীর এই সাধের সংগ্রাম দেখে তিনি খুশিই হন। কিন্তু আসলে এ যে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের মহড়া—একথা বলেন না মেয়েকে।

একদিন হেসে বললেন, কালো হয়ে গিয়েছিস কিন্তু।

—ফর্সা তাহলে ছিলাম বলো। মালতী হেসে উঠল, এতদিন তা স্বীকার কর নি, আজ স্বীকার করতে হল তো !

শুধরে নিয়ে নলিনাক্ষবাবু বললেন, আরো কালো হয়ে গিয়েছিস।

মালতী কালো, নির্ভেজাল কালো। এতে খারাপ দেখায় না, টানাটানা চোখ-মুখের সঙ্গে রংটা খাপ খেয়ে গেছে। ওই চোখমুখ আর ওই গড়নের উপর রং যদি ফর্সা হত তাহলে হয়তো এত ভালো দেখাত না মালতীকে।

নলিনাক্ষবাবু বললেন, সংগ্রাম তাহলে কেমন চলছে বল।

মালতী বলল, ওভাবে ঠাট্টা করো না, বাবা। তুমি যা চাও, তাই হবার জন্যে চেষ্টা করছি বলতে পারো। সংগ্রাম-টংগ্রাম কিছু না।

হরগোপাল মুনশি চট করে কিছু মন্তব্য করলেন না, বললেন, ঘর-দোরের খোঁজ নাও, আমিও ভেবে দেখি।

অনেকটা বিরক্ত হয়েই যেন চলে এলেন নলিনাক্ষবাবু। হরগোপালের উপর তাঁর আস্থা আর শ্রদ্ধা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল যেন। গুণের কদর তবে এঁর কাছেও নেই, ইনিও তাহলে পয়সার খোঁজ নিতে চান আগে, নলিনাক্ষের কাছে এ জিনিসটা আঘাতের মত ঠেকল। নিজের ইজিচেয়ারে ফিরে এসে তিনি গুম হয়ে বসলেন।

—কারো সঙ্গে রাগারাগি করে এলে নাকি? মালতী পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সোজা হয়ে বসলেন নলিনাক্ষ, বললেন, রাগারাগি করার মত সাচ্চা মানুষ কি আছে দুনিয়ায়? বাইরেটা সকলের বিজ্ঞতার মোড়কে ঢাকা, ডালা তুললেই আসল লোভী মানুষের চেহারা বেরিয়ে পড়ে। হরগোপালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, দেখলাম, ও-ও একটা ভণ্ড। বেজায় টাকা চেনে।

—কিছু বাকী আছে বুঝি? আমার ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে ক'দিন এসেছিলেন, ওষুধ দিয়েছিলেন, তার বিল শোধ করা হয়নি?

মেয়েকে ধমক দিয়ে উঠলেন নলিনাক্ষ, বললেন, সে কি কথা? আমার বাড়িতে চিকিৎসা করে, তোকে দেখতে এসে টাকা নেবে ও? সে কথা নয়। কিন্তু লোকটাকে বড় সুবিধের বলে মনে হল না। বলে, অবস্থা কেমন?

—কার? মালতী বাবার কাঁধে হাত দিল।

—কারো না, এখন আমাকে একা বসে ভাবতে দে।

ভাবনার বা চিন্তার কোনো উপকরণ নেই, তাই সাধ করে এই একটা উপলক্ষ্য সংগ্রহ করে ভাবতে বসলেন নলিনাক্ষ। অনেক্ষণ ধরে ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে হয়তো উত্তেজিতই হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দোতলার বারান্দায় পায়চারি করলেন অনেক্ষণ ধরে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন উপরে, দরজার

ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন, বই হাতে নিয়ে সারা ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে মালতী। হিন্দী মুখস্থ করছে, হিন্দীর ব্যাকরণ।

দরজার কবাটে হাত দিয়ে আর-একটু ফাঁক করে নলিনাক্ষ বলে উঠলেন, সংগ্রাম।

চমকে উঠল মালতী, হাত থেকে বই প্রায় পড়ে গিয়েছিল।

নলিনাক্ষ ঘরে ঢুকে বললেন, আসল সংগ্রাম। এই বাড়ির, আমার টাকার কোনো প্রত্যাশা না রেখে এবার প্রকৃত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হও, মালতী। মনে কর, তোমার কেউ নেই, কিছু নেই, তুমি একা।

বাবার কি-যেন হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে মালতী, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না। একদৃষ্টে সে অনেক্ষণ চেয়ে রইল নলিনাক্ষের দিকে। চোখে মুখে অসুখের কোনো ছাপ নেই। কিন্তু সারা শরীরে একটা চাঞ্চল্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার, বাবা। খুলে বল।

নলিনাক্ষ জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে নেমে গেলেন নীচে। মালতীর সকাতর প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হয়ে থাকবেন।

এর পর দিন-দুই নলিনাক্ষ বিশেষ কোনো কথা বলেন নি। এক মনে বসে বসে বই ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজের পাতা উল্টেছেন। হর-গোপালের ডিস্‌পেনসারীতেও যান নি।

অগত্যা হরগোপালকে তাই আসতে হল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বারান্দায় নলিনাক্ষকে দেখে সিঁড়ির গভীর থেকেই বললেন, খোঁজ করলে নাকি হে?

নলিনাক্ষ মাথা নেড়ে বললেন, এস, বসো। অত তাড়াহুড়ো কেন?

ডাক্তারের কাছে রুগী তার রোগের ইতিহাস যেন বলছে, এইভাবে নলিনাক্ষ হরগোপালকে বলতে লাগলেন সব। বললেন, তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন তাঁকেই ওই ছেলেটির মধ্যে। তাঁর ছাত্রজীবনের রেকর্ডের সঙ্গে

এর রেকর্ড অবিকল এক। এমন মিল যখন তিনি পেয়েছেন, তখন একে আপনার করে নিতেই হবে। কোনো রকমেই হাতছাড়া করা যায় না। তাই খোঁজ-খবরের ঝুকি নিতে তিনি রাজী না; যদি তাতে কোনো গলতি বেরিয়ে পড়ে, যদি কোনো বাধা দেখা দেয়। যদি পেয়ে যান এই ছেলেকে তবেই তিনি নাকি কৃতার্থ হয়ে যাবেন।

—তুমি তো বিয়ে করছ না হে, মেয়ে কৃতার্থ হবে কি না দেখ।

—হবে। সংগ্রামের জন্যে সে তৈরি।

হরগোপাল নালিনাক্ষের পিঠ চাপড়ে বললেন, ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। বয়েস হল কত? আমার কাছে আর লুকিয়ে লাভ কি? ঠিক বয়েসটাই বলো। রিটায়ার করেছ কততে?

নলিনাক্ষ ছেলেমানুষের মতই হাসলেন, বললেন, জানোই তো?

হরগোপাল হাসলেন, বললেন, তোমার বুদ্ধিমান্দ্য হয়েছে। এর কোনো দাওয়াই নেই।

নলিনাক্ষও হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। কথাটার গুরুত্ব স্বীকার করতে তিনি রাজি না যেন আদপেই।

আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেল মালতীর কাছে। সব সে শুনেছে আজ। তাই নিজেকে আজ তার খুব হালকা বলে ঠেকছে। ভালোই তো, যদি তাকে দিয়ে তার বাবার স্বপ্ন সার্থক হয়, তাহলে তা-ই নাহয় সে করবে। এমন একজন লোককে তার বাবা যদি মনে মনে নির্বাচন করে থাকেন, তাহলে নির্বিকারভাবে সেও তা গ্রহণ করতে রাজি। এর মধ্যে কোনো যদি নেই, কোনো কিন্তু নেই। একে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ যদি বলা হয়, তবে তাই।

মালতী তেতলার জানলায় বসে বসে ভাবছিল। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শুকনো। মাঠ ভরে পড়ে আছে নিস্তব্ধ রাত্রির তপস্যা। দূরে ঝাউগাছের মাথায় ছাতা ধরে থাকার মত তালগাছের সার এক পায়ে ঠায় খাড়া হয়ে আছে।

বৃষ্টি রোজ আসে না। পরম রোমাঞ্চময় বৃষ্টির সে রাত্রিটা ব্যর্থ করে দিয়েছেন সেদিন কুন্তলাদি। এ কথা এখনো মনে পড়ে মালতীর। অনেক রাত্রি তার নিষ্ফল কেটে গেছে, অনেক তপস্যা অর্থহীন হয়ে গেছে, সে কথা তত ভাবে না মালতী। কেবল ভাবে, সেদিন তার ঘরে কুন্তলাদির সেই অনধিকার প্রবেশের কথা। তাঁর জীবনে সেদিন কোনো লাভ হয় নি, কিন্তু মালতীর লোকসান হয়েছে অপূরণীয়। আর কোনোদিন এমন সুযোগ এমন সুবর্ণশোভায় দেখা দেবে কি না, কে বলতে পারে। আড়াই বছরে কত দিন হয়? থাক্, সে অঙ্কে কাজ নেই। এতগুলি দিনের মধ্যে একটা দিন মালতী হেরম্বর তপস্যা ভাঙতে পারে নি। ধোঁয়াভরা হারিকেনের কিনার থেকে ওই মাংসল শরীরটাকে টেনে নিয়ে আসতে পারে নি সে তার কাছে।

হাত ধরে টেনেছে মালতী, হেরম্ব বলেছে, কেন, কি চাও?

—কি চাই, জানো না? বোঝ না?

হেরম্ব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, কই, বলো নি তো।

এমনি রোজ। এমনি প্রত্যহ।

সকালে কুন্তলাদি বলেছে, রাত্রে বড় বিরক্ত কর ওকে। তোমার জ্বালায় পাশের ঘরে আমারই ঘুম হয় না। ও যদি বই নিয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে, থাক্ না। তুমি নিজের মনে ঘুমিয়ে পড়লেই পার।

এত পরিষ্কার, এত পরিচ্ছন্ন, এমন অকপটভাবে এসব কথা দিনের আলোয় এভাবে আলোচনা করা যায়, জানত না মালতী। তার সারা শরীরে কাঁটা দেয়, উনুনের তাতা চাটু চেপে ধরতে ইচ্ছে হয়। মণি আর মায়ারা শুনেই-বা ভাবে কি। তাদের মুখের দিকে তাকাতেও সঙ্কোচ হয় মালতীর। কিন্তু কিছু বলে না। মনে হয়, সত্যি হয়তো অপরাধই করে ফেলেছে সে। আরও সঙ্কোচ হয় আর একজনের কথা ভেবে। কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা যদি একবার এসে দেখে যেতেন তার এই সংগ্রাম, তাহলে তিনি খুশি হতেন কিনা কে জানে? সামনে নরককুণ্ডের মত এই উনুন জ্বালিয়ে তার

সামনে সকাল-সন্ধ্যে বসে থাকা। ও-ঘরে চা সাপ্লাই, এ-ঘরের ফুট-ফরমাশ খাটা।

কুন্তলাদি গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে উঁকি দিলেন রান্নাঘরে, শোনো বৌ, আর পাঁচ কাপ চায়ের জল চাপাও। দীনেশ, মনোহর, দেবেশরা হঠাৎ এসে পড়ল। ও কি, জল কেন চোখে?

মালতী বলল, ধোঁয়া।

—ধোঁয়া কই? গনগনে আগুন, তবু চোখে ধোঁয়া দেখছ?

মালতী চোখ মুছে ফেলে বলল, তবে হয়তো এমনি।

—বড়লোকী রাখো বউ, অল্পেই মুষড়ে প'ড়ো না। আমাদের দেখছ না খাটতে? সকাল নেই, দুপুর নেই, রোদ নেই, জল নেই, টই-টই ঘুরছি। আমাদের পায়ে তো চাকা বাঁধা নেই। পা চালিয়েই চলি। চালাও, চালাও, হাত চালাও। ওরা বসবে না—অনেক কাজ ওদের।

চলে যাচ্ছিলেন কুন্তলাদি, ফিরে এসে বললেন, চায়ের বাটিগুলো পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। মণি আর মায়া ড্রেস করছে, ওরা সঙ্গে যাবে, ওরা ব্যস্ত।

হাসি পেল মালতীর। প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করল তার। যেভাবে হাসেন তার বাবা। অদ্ভুত। অদ্ভুত লোক বটে কুন্তলাদি।

ওদের ফিরতে আজও রাত হল অনেক। অনেক দূরে নাকি যেতে হয়েছিল। দিদি ফিরলেন কিছু আগে, মায়ারা আলাদাভাবে পরে এল।

ওদের ফেরার দেরি দেখে মালতী হেরম্বর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, দিদি ফিরছেন না এখনো।

—কাজে গেছেন, কাজ শেষ হলেই আসবেন।

—কি কাজ করেন উনি?

—দেশের কাজ।

মালতী বলল, তুমিও তো ওদের সঙ্গে যোগ দিলে পার। পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

—তাতে লাভ ?

—কিছু না। একটা প্রফেসরীও তো পেয়ে যেতে পার ?

হেরম্বর ভালো লাগল না, বলল, ইস্কুলই আমার বেশ।

মালতী বলল, তা আর নয় ? ভালোই তো। তোমার দিদি কিন্তু ভারী সরল।

—তোমার দিদি মানে ? তোমারও তো দিদি!

মালতী হেসে বলল, তোমার আর আমার দিদি। এদিকে তো হুঁশ আছে, কিন্তু অত উদাসীন সেজে থাক কেন বল তো ? মেধার জন্যে ?

হেরম্ব যখন মুখ খুলেছে, বাড়িতেও যখন কেউ নেই, তখন হেরম্বর পাশে বসা যেতে পারে। মালতী টিনের চেয়ার টেনে এনে হেরম্বর পাশে বসল, বলল, দিদির নামে যা-সব কথা রটেছে! বিশ্রী সব কথা।

হেরম্ব বলল, জানি। সব বাজে। আজকাল দিদি আর তেমন নেই।

হেরম্বর কথা শুনে মালতীর ভয়ানক হাসি পেল, বলল, আমিও তো তাই বলি। দিদি এখন ভালো হয়ে গেছে।

হেরম্ব চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে মালতীর মুখোমুখী হল, বলল, আগে যা-সব করেছে দিদি—উঃ, সাংঘাতিক। আমি যখন বাচ্চা, তখন কত কথা শুনেছি তার নামে। আর জামাইবাবু ? বেচারাকে সুইসাইড করতে হল।

—কেন ? কেন ? গলা বাড়িয়ে দিল মালতী।

হেরম্ব বলল, আর না। এবার পালাও। ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।

—পালাব কেন ? ভয় কিসের ? অন্যায়টা কি করছি বল ?

হেরম্ব বলল, অন্যায় না ? আমার পড়ার ডিস্টার্ব করছ।

শেখরকে নিয়ে কুন্তলাদি ফিরলেন। ফিরেই উঁকি দিলেন হেরম্বর ঘরে। ঠিক আছে। শেখরকে বসিয়ে এদিকে আসতেই মালতী বলল, মায়া মণি ?

—রাত বারোটার সময় চেঁচামেচি করে পাড়া মাৎ ক'রো না বৌ, তারা আসছে। দাঁত দিয়ে কাপড় কামড়ে ধরে কাপড়ের নীচ দিয়ে গায়ের জামা টেনে বার করলেন কুন্তলাদি।

গায়ের জামা খুলে ওঘরে গিয়ে চৌকিতে টান হয়ে শুয়ে পাখা চালাতে লাগলেন শব্দ করে।

শেখর বলল, বেজায় গরম পড়েছে।

কুন্তলাদি এর কি জবাব দিলেন, শোনা গেল না।

বড় সাধ হচ্ছে, বড় ইচ্ছে হচ্ছে মালতীর—বাবাকে টেনে এনে একবার তার এই রণক্ষেত্রটা দেখিয়ে দিতে। দোতালার বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে তিনি এখন কিসের স্বপ্ন দেখছেন, জানতে ইচ্ছে করছে মালতীর। সেই বিয়ের দিন ছাড়া একদিনও তিনি এ বাড়িতে এলেন না।

পরদিন সকাল থেকেই মালতীর মনটা বড় ভারী দেখা গেল। কুন্তলাদি কয়েকবার লক্ষ্য করেছেন কিন্তু মন্তব্য করেন নি কিছু। কলতলায় দাঁতন নিয়ে উবু হয়ে বসে দাঁতই ঘষছেন আর রান্নাঘরের দিকে আড়-চোখে তাকাচ্ছেন। মোটা শরীর, বসেছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। মালতী বালতি হাতে এসে দাঁড়াল।

থুতু ফেলে কুন্তলাদি জিজ্ঞেস করলেন, চাই কি ?

—জল নেব।

—একটু পরে এস। মুখ ধুয়ে নিতে দাও। এক কাঁধ থেকে সেমিজের স্ট্র্যাপ নেমে গিয়েছিল, সেটা টেনে তুলে নিয়ে কুন্তলাদি কুলকুচি করতে আরম্ভ করলেন।

করগেট-টিনের চালের পাশ দিয়ে সকালের ঠাণ্ডা রোদ এসে পড়েছে এক ফালি। কুন্তলাদি মুখের জল ছড়িয়ে ফেলছেন, সেই জলের গুঁড়োয় রোদ পড়ে ঝিলমিল করে নেচে উঠছে রামধনুকের বর্ণচ্ছটা। কুন্তলাদির রোখ চেপে গেল, অনবরত কুলকুচি করে তিনি সেই রং দেখার জন্যে

জল ছড়াতে লাগলেন। মন মাৎ হয়ে গেছে তাঁর। তিনি যেন তাঁর জীবনের জলছবি দেখছেন এইভাবে।

ওদিকে রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর বালতি রেখে চৌকাঠের উপর বসে অপেক্ষা করছে মালতী।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কুন্তলাদি ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, ভোর থেকে দেখছি মুখ ভার। ব্যাপার কি? কার কথা ভাবছ অমন।

কথা বলল না মালতী। শব্দ করে বালতি তুলে সে চলে গেল কল-তলার দিকে। বালতির এই শব্দটাই তার প্রতিবাদ।

কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয় কুন্তলা। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, বয়সটা কম, রং না থাকলেও রূপ আছে—সাবধানে থেক বৌ। কার কখন চোখ লেগে যায় বলা যায় কি!

ওদিক থেকে মায়ার গলা এল, মা, শেখরমামা এসেছে।

কুন্তলাদি মুচকি হেসে বললেন, ওই সে এসেছে। চা চাপাও।

হঠাৎ ফণা তোলার মত করে মুখ তুলে তাকাল মালতী। কথা বলল না। ছোবল দিল না কুন্তলাকে।

দুপুরবেলা একে একে বেরিয়ে গেল সকলে। হেরম্ব মায়া আর মণি একসঙ্গে ইস্কুলে রওনা হল। মামার বড় আদরের ভাগ্নী, মামা তাই বেশির ভাগ দিনই ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজে ইস্কুলে যান। তার পর কুন্তলাদি বসে বসে সর্বাঙ্গে পাউডার মাখল, সাদা কাপড়ের জামা পরল, নরুন পাড় কাপড়। বলল, কাজ আছে, জলদি যেতে যবে আজ। কেউ এলে আর বসতে ব'লো না।

সবাই চলে গেল। মালতীও তৈরি হতে আরম্ভ করল। আজ বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবে, বোঝাপড়া করে আসবে সে। ছয় মাস হয়ে গেল, বাবা একবার ডেকেও পাঠালেন না তাকে। আজ সে সব বলবে। এ-বাড়ির চাল-চলন, এবং এদের কদর্য ইঙ্গিতের কথা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখতে লাগল, এ যেন এক অচেনা মালতী। নলিনাক্ষবাবুর মেয়ে বলে চেনাই দায়। হাতের নখের দিকে তাকানো যায় না, বাসন মাজতে গিয়ে কয়েকটা নখ ক্ষয়ে কেমন কুৎসিত হয়ে গেছে। যাক গে। যার মুখের চেহারাই কদাকার হয়েছে, তার নখের শ্রী না থাকলেও চলবে।

চুল বাঁধা সাঙ্গ করে সিঁথিতে সিঁদুর দিল, কপালে টিপ। আগুনের মত জ্বলছে কপালের উপর সিঁদুরের টিপটা, কালো রঙের উপর সিঁদুর মানায় ভালো। কিন্তু হাসি পেল মালতীর। কেন এ সিঁদুর কিসের জন্যে এ বাহার। সে যদি সধবা, তাহলে কুমারী কাকে বলে।

পায়ে চটি, হাতে ছাতি। এখান থেকে ট্রামের রাস্তা অনেকটা, সাত-আট মিনিট লাগে। রাস্তা যেন ফুরোয় না। ট্রামে উঠে তারা রোডের মোড়ে নেমে পড়ল। সেখান থেকেও হাঁটতে হবে খানিকটা। হরগোপালবাবুর সঙ্গে আবার দেখা না হ'য়ে যায়, সংকোচ হচ্ছিল তার। ওর ধারণা, ওর মনের ভিতরের আক্ষেপ অনুতাপ অভিমান—সবই যেন ওর মুখে ছাপ ফেলেছে। কিন্তু রক্ষে, ডিস্‌পেন্সারীতে কোলাপ্‌সিবল্‌ গেট লাগানো। তবু সে ছাতা আড়াল দিয়ে পেরিয়ে গেল ডাক্তারখানাটা।

এতদিন বাদে মেয়েকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েও কোনো আগ্রহ নেই, অভ্যর্থনা নেই; নিরুত্তাপ নির্বিকার নলিনাক্ষ কেবল বললেন, অনেকদিন বাদে। শরীর ভালো তো?

মালতীর চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, কেমন দেখছো।

—খাসা। বলেই নলিনাক্ষ হো হো করে হেসে উঠলেন।—হেরম্বর খবর কি? ওর মধ্যে একটা উচ্চ-আশার ইচ্ছে ইন্‌জেক্‌শন করা হয়তো দরকার। তা না হলে উন্নতি করবে কী করে?

মালতী প্রতিবাদ করল, বাবাকে আঘাত দেবার জন্যেই হয়তো বলল, তুমিও বড় টাকা চিনেছ, বাবা। উন্নতি মানে? বড় একটা চাকরি—মোটা মাইনের

গোলামী? আর-একটা প্রতিভারও তাহলে অপমৃত্যু দেখার ইচ্ছে হয়েছে তোমার?

নলিনাক্ষবাবু বলার কথা পেলেন না, চোখ বুজলেন। চোখ বুজেই বললেন, এখানে আসার সময় বলে এসেছ নিশ্চয়।

—কাকে?

—হেরম্বকে। বা তার দিদিকে।

মালতীর বিরক্তি বোধ হল। সে কোনো কথা না বলে উঠে তেতলার ঘরে চলে গেল—তার নিজের জীবনের কোনো চিহ্ন এখনো সেখানে লেগে আছে কিনা, হয়তো তাই দেখতে।

নলিনাক্ষবাবু চোখ বুজেই ছিলেন, চোখ বুজেই কথা বললেন মালতীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে এ জীবন?

উত্তর না পেয়ে আবার বললেন, কেমন লাগছে? অম্লমধুর, না, তিক্তকষায়?

এবারও উত্তর না পেয়ে তাকালেন। মালতী নেই। লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। দরজার গায়ে ছাতা দাঁড় করানো, সিড়ির পাশে চটি। আবার বসলেন নলিনাক্ষ। তাঁর মনের ভিতর হয়তো ঝড় বয়ে চলেছে, কিন্তু তা তিনি জানতে দিতে হয়তো চান না। তিনি নিজেকে মিথ্যে খুশির মোড়কে মুড়ে বসে রইলেন।

মালতী অনেকক্ষণ বাদে নেমে এল। সিঁড়ির পাশ থেকে চটি নিল, দরজার গা থেকে ছাতা। বলল, বিকেল হয়ে এল, ইস্কুল থেকে ফেরার সময় হয়েছে, এবার যাই, বাবা।

নলিনাক্ষ উঠেও এলেন না, নড়েও বসলেন না, বললেন, আচ্ছা। সুবিধা পেলে আবার এস। আমাকে এখানেই পাবে, এই বারান্দায়।

এ কথায় কি যে রসিকতা আছে, কে জানে। কিন্তু নলিনাক্ষ হেসে আকুল হতে লাগলেন। মালতী নেমে গেল।

বদলে গেছেন বাবা, ভুলে গেছেন হয়তো মালতীকে। কোনো কথাই তার বলা হল না। কাকে বলবে? ওই নির্জীব, নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ জীবটিকে? মালতী মোক্ষম আঘাত পেয়ে ফিরে এল নিজের বাসায়। দরজার তালা খুলল, ঘরে গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এত শিগগীর মানুষের বুক থেকে স্নেহ এ ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়? যাকে দিয়ে নিজের জীবনের স্বপ্ন সফল করার ইচ্ছে হয়েছিল একদিন, তাকে এমন করে কেউ কখনো মুছে দেয় মন থেকে।

কুন্তলাদি হন্তদন্ত হয়ে ফিরেই জিজ্ঞেস করল, কেউ এসেছিল।

মালতী বলল, না।

—অমনভাবে না বলছ যে, হল কি? শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে তাকালেন মালতীর দিকে।

মালতী বলল, কয়লা আনাতে হবে, উনুন জ্বালাতে পারছি নে।

শোনা মাত্র আগুন হয়ে উঠলেন কুন্তলা। গুম-গুম শব্দে পা ফেলে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে এলেন। বললেন, একটি টুকরোও নেই। দুপুরে কয়েকটা গুল দিয়ে রাখলেও তো পারতে। সবার অবস্থা তো তোমার বাবার মত নয় যে, নেই বলা মাত্র পাঁচ লরী কয়লা এসে পড়বে। এক দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। আমার হাতে কিছু নেই। ঘুঁটে থাকে তো ঘুঁটে পুড়িয়ে আমাকে আগে এক কাপ চা দাও—দম নিয়ে নিই, তার পর দেখা যাক্ কি হয়!

কাপে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর বিড়বিড় ক'রে কিসব বলছেন কুন্তলা, এক বর্ণ বোঝা যাচ্ছে না। তার পর স্পষ্ট করে বললেন, যত সব অনাছিষ্টি! মায়া-মণিদের যেতে দিই নে আগুনে, পড়া কামাই হবে, রং ঝলসে যাবে ব'লে। ওরা যদি যেত তাহলে এমন হতে পারত না—কখ্খনো না। ছেলেমানুষ হলে কি হবে, যে হুঁশ ওদের আছে, তোমার তাও নেই। বড়লোকী দেমাক নিয়েই বসে থাক। আসুক হেরম্ব, সব বলব। বলেই-বা কি, সে ছেলেমানুষ, কি বোঝে?

মণিরা ইস্কুল থেকে ফিরল। মায়ের মূর্তি দেখেই থমকে দাঁড়াল। তাদের বইয়ের ভাঁজ, রবার-পেন্সিল নেবার সাবানের বাক্স ঝেড়ে কয়েক আনা পয়সা বেরল। হাঁফ ছেড়ে কুন্তলা বললেন, এতে চলুক এখনকার মত—দশ সের কয়লা আসুক। মামার আদুরে ভাগ্নী সব, তোদের না হলেও মামার সংসার চলবে না, মামা না হলেও তোদের চলবে না। এই দু'দিকে তাল রাখার জন্যে আমার তো প্রাণান্ত।

সন্ধ্যের কিছু পরে হেরম্ব ফিরল। কারো দিকে তাকাল না, খেতে চাইল না, মেঝে থেকে হারিকেন টেবিলের উপর তুলে নিয়ে বই খুলে বসে গেল।

পাশের ঘরেও লোকজন এসেছে। কি-একটা ভয়ানক সমস্যা নিয়ে আলাপ হচ্ছে। হঠাৎ আলোচনায় ছেদ পড়ল। আর একজন কে বুঝি এল।

কুন্তলাদির গলা শোনা গেল, এত দেরি হল আসতে?

—হয়ে গেল দেরি। দুপুরের দিকেও একবার এসেছিলাম।

—দুপুরে এসেছিলে?

শেখর বলল, হ্যাঁ।

আর কোনো কথা নয়। শেখর আর কি বুঝি বলত, তাতে কান না দিয়েই তীরবেগে ভিতরে এসে ঢুকলেন কুন্তলা, উল্কার মত ছুটে গেলেন রান্নাঘরের দরজায়, বললেন, মিথ্যুক। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে? দুপুরে কেউ বলে আসেনি?

মালতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কে এসেছিল?

—ন্যাকা। কিছু জান না! চাপা গলায় কুন্তলা বলছেন, হেরম্বকে পাচ্ছ না ব'লে মরিয়া হয়ে উঠেছ? পাবে না তাকে, পেতে দেব না।

সারা শরীর কেঁপে উঠল মালতীর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে অসংকোচে বলল, কেন? হেতু?

কুন্তলা রাগে কাঁপছিলেন, বললেন, কুৎসিত কথা বলিয়ে নিয়ো না আমাকে দিয়ে। তুমি এসেছ, এসেছ। এ সংসারে আর কেউ যেন না আসে, এই আমি চাই।

এই অশোভন আব্দারের অর্থ কি? আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ভরসা হল না মালতীর। তার কেবল মনে হ'তে লাগল, এই নরককুণ্ড থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উধাও হয়ে চলে যাক কোথাও।

—বাপ-মরা মেয়ে আমার। তাদের আর আছে কে মামা ছাড়া? সেই মামাকে বুঝি পর ক'রে দেবে ভেবেছ? কখ্খনো না? বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলেন কুন্তলা, ফিরে এসে বললেন, তুমি গোপন করেছ, কিন্তু যে এসেছিল সেই সব ফাঁশ করে দিয়েছে। বুঝলে?

—সে কে? এক পা এগিয়ে মালতী বলল।

কুন্তলাদি মালতীর প্রায় কানের কাছে মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, চেন না? সে তোমার ইয়ে। সে শেখর।

অজ্ঞানিতেই জিভ কাটল মালতী। সে যে বাসায় ছিল না, এ কথা এখন সে বিশ্বাস করাবে কী করে?

রাত্রে মালতী ঘুমল না। চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পায়ের কাছের জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরে। বাবার কথা মনে হচ্ছে তার, মনে হচ্ছে কুন্তলার কথা, মনে হচ্ছে শেখরের কথা। হয়তো শেখর এসেছিল দুপুরে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না, এ কথা স্পষ্ট ক'রে সে বলল না কেন? দরজায় তালা ঝুলছিল—তাও কি দেখেনি লোকটা? সেই কথাটা বললেই তো মিটে যায়। মিটে যায়? হয়তো যায় না মিটে। তারও অন্য অর্থ করতে কতক্ষণ?

হেরম্বর ঘুম হয়তো পায় না। শুধু পড়া আর পড়া, টেবিলে মাথা রেখে ঝিমিয়ে নেওয়া। রক্ত-মাংস দিয়ে কি ভগবান একে গড়েন নি, একবার ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে করে না এদিকে?

ও-ঘরে দিদির নাক ডাকছে। মালতী পা টিপে টিপে উঠল, হেরম্বর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখল, বলল, প্রায় তিন বছর। তিন বছর ধরে তপস্যা ক'রে চলেছি, ধ্যান কি ভাঙবে না কিছুতে?

হেরম্ব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ। পাশের ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, দিদি।

কানের কাছে মুখ নিয়ে মালতী বলল, এত ভয় করে কেন? কি করবে ও?

হেরম্ব উঠে দাঁড়াল, বলল, আস্তে। তুমি কর না ভয়? সাংঘাতিক ও।

—কী করবে?

—খুন। খুন করতেও তো পারে। সুইসাইড নাকি নয়, অনেকে তো বলে, ও খুন করেছে।

—কাকে? আঁৎকে উঠল মালতী।

হেরম্ব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ।

নাক ডাকা থেমে যেতেই মালতী গিয়ে চৌকিতে বসল, চৌকি মড়মড় শব্দ ক'রে উঠতেই কুন্তলা ডাকলেন, হেরম্ব।

হেরম্ব সাড়া দিল, উঁ।

—দরজা খোল।

হেরম্ব দরজা খুলে দিল। কুন্তলা ঘরে ঢুকে বলল, জল নেব এক গেলাশ। কুঁজো সরিয়ে রাখলে কোথায়? বৌ বসে যে!

মালতীর ইচ্ছে হল খুন করে এই মেয়েমানুষটাকে। এমন মানুষ জীবনে সে দেখেও নি, কোনো গল্পেও পড়ে নি। একটা খোঁজ পর্যন্ত করলেন না বাবা, একটা মাথার সন্ধান পেয়ে সেইখানে তার মাথা বিক্রী ক'রে দিলেন এইভাবে।

আবার কিছুক্ষণ বাদে শুরু হল নাক ডাকা। মরিয়া সাহসে আবার মালতী উঠে গেল হেরম্বর কাছে। হারিকেনের আলোয় হেরম্বর মুখ আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে।

মালতী চাপা গলায় বলল, এত গম্ভীর তুমি কেন ? হাসবে না ? একদিন তুমি একটু হাসবে না ? ইচ্ছে করে না হাসতে ?

হেরম্ব মাথা নেড়ে জানাল, করে। তার পর হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল মালতীকে। বলল, দুঃসাহস।

বিরক্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল মালতী। চৌকি মড়মড় শব্দ ক'রে উঠল। তাতে বিব্রত বা বিচলিত না হয়ে সে টান হ'য়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে অভিসম্পাত দিতে লাগল নিজেকে। নিজের দিদির সম্বন্ধে কিছু জানতে যার এতটুকু বাকি নেই, সেই দিদিকে এ তো কেবল ভয় নয়, সেই দিদির উপর শ্রদ্ধাও আছে টানও যেন আছে। বইয়ের পোকা হয়ে পড়ে থাকলে কি জীবনের আর-সব কর্তব্যের কথা ভুলে থাকতে হয় এইভাবে ?

সকালে দাঁতন চিবতে চিবতে দিদি কলতলার দিকে গেলেন। তাঁর মুখোমুখী হবার ভরসা নেই মালতীর। রাত্রে নিজের ঘরে নিজের চৌকীতে বসে ছিল কেন, এই কৈফিয়ত হঠাৎ এখন তলবও করতে পারেন বই কি।

দাঁতন চিবচ্ছেন, থুতু ফেলছেন, আর বিড়বিড় করছেন—বিয়ে দেওয়া হল ইস্কুলমাস্টারের সঙ্গে, সে খেয়ালও নেই। টাকার আণ্ডিল নিয়ে বসে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। টানাটানির সংসার, কিছু সুরাহা হবে—এই আশা ছিল বলেই এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম নইলে কথ্‌খনো—

মুখ নীচু ক'রে নর্দমায় থুতু ফেলে বললেন, কথ্‌খনো মত দিতাম না।

মালতী ঘর থেকে কথাগুলো শুনল। দিদির আক্রোশের কিছুটা কারণ সে একটু-একটু যেন বুঝতে পারছে এখন। এত আশা করা কেন ? আশার শেষ কেবল এখানেই হয়তো নয়, আরও বৃহত্তর আশাও আছে হয়তো। বাবার বিষয়-আশয় টাকাকড়ি মালতীর মারফত হেরম্ব পাবে, হেরম্বর কাছ থেকে নিয়ে নেবে মায়া-মণি। মায়া-মণিদের সেই সোনার সম্ভাবনা ধুলোয় ধূসরিত না হয়, তারই জন্যে তাহলে কুন্তলার এত উদ্যোগ-আয়োজন কি না, কে বলবে।

কিন্তু কুন্তলা কে? কুন্তলাকে দিয়ে তার কি প্রয়োজন? মালতী মনে মনে ঠিক করল, বাবা যতই রূঢ় হোন, হেরম্বকে এখান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে সে বাবার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবে। প্রত্যাখ্যান নিশ্চয় করতে পারবেন না বাবা।

হেরম্বর সঙ্গে দিদির কি-একটা জটিল পরামর্শ হচ্ছিল। মালতী ঘরে ঢুকতেই চুপ করে গেলেন কুন্তলা। পায়ের শব্দ শুনে হেরম্ব ঘাড় কাৎ করে একবার মাত্র তাকাল মালতীর দিকে। মালতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দিদি দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরেচ্ছেন না ক'দিন ধ'রে। তাঁর হঠাৎ এমন ছুটি হয়ে গেল কী করে, বোঝা যাচ্ছে না। দেশের কাজ কি তা হলে ফুরিয়ে গেছে একেবারে। শেখর আসে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। বাড়ির আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে গেছে। বলা যায় না, কুন্তলাদিদের রাজনীতিতে কোনো জটিলতা দেখা দিয়েছে কি না।

জানলায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে লাফ দিয়ে উঠলেন কুন্তলাদি, দরজা ফাঁক ক'রে শেখরকে দেখেই বললেন, হাতে-হাতে ধরা পড়লে তো? ভেবেছিল বাড়ি ফাঁকা। জব্দ হলে তো?

শেখর প্রথমটা জবাব দিল না, একটু থেমে বলল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

—কা'র? নিজের কথা বলছ নিশ্চয়। একেই বলে পুরুষ মানুষ—কেবল ছলনা আর কেবল চাতুরি। এবার সমঝে চল শেখর, সব জানা-জানি হয়ে গেছে।

শেখর উঠে দাঁড়াল, বলল, চললেম। আর হয়তো আসব না।

কুন্তলাদিও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তা তো যাবেই। বড় হতাশ করলাম তোমাকে। মাপ ক'রো শেখর। এক কাপ মিষ্টি চা খেয়ে যাবে না?

এর কোনো উত্তর নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই। শেখর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে স্লিপার দিয়ে মেঝে ঘষল, বলল, নিজে বিশ্বাসী না হলে কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করা যায় না, কুন্তলা।

—সে কি কথা? কুন্তলা এগিয়ে এল, ভিতরের দিকে একবার তাকিয়ে শেখরের হাত চেপে ধরে বলল, আমি সহ্য করতে পারছি নে, শেখর।

হাত ছাড়িয়ে নিল শেখর, গলা কেঁপে গেল তার রাগে, বলল, নিজের বয়স সম্বন্ধেও হুঁশ নেই তোমার। ভণ্ড, প্রবঞ্চক।

বেরিয়ে গেল শেখর। টা-টা রোদ মাথায় করে হন্ হন্ ক'রে হাঁটা দিল। জলন্ত রোদের তাপে গলির ওই মোড়ে শেখর যেন উবে গেল ধোঁয়া হয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কুন্তলা। তার মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে চক্রান্ত। সব আক্রোশ গিয়ে পড়ছে মালতীর উপর। রাজার ঝিয়ারির দেমাক চুরমার ক'রে দিয়েছে সে, তাকে বাঁদি বানিয়েছে; এবার ওর বাপের টাকাগুলো হাতাতে পারলে তার সব সাধ পূর্ণ হয়।

ভর-দুপুরে বাঁশি বাজে কিসের? দরজা খুলল কুন্তলা। ভয়ংকর গোক্ষুর সাপ ভীষণ ফণা তুলে বাঁশির উপর ছোবল দিতে চেষ্টা করে কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে; এবার প্রচণ্ড বেগে ছোবল ছুঁড়তেই মুখটা মাটির উপর প'ড়ে বুঝি থেবড়ে গেল। তার ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে এখান থেকেও।

কবাট বন্ধ করে বেণী বাঁধলেন কুন্তলা। তাঁর মনের অভিযোগ আক্ষেপ আক্রোশ সব মিশে ভীষণ একটা ছোবল হয়ে উঠল।

হেরম্ব আজকাল মালতীর দিকে নিজে থেকেই তাকায়; কিন্তু সে চাউনিটা স্বাভাবিক বলে ঠেকে না। মালতীর মধ্যে কি-যেন সে খোঁজে, কী-একটা জিনিস আবিষ্কার করতে যেন চায়। মালতী কাছে এসে যদি বলে, কিছু বলছিলে? —অমনি মুখ ঘুরিয়ে নেয় হেরম্ব।

রুক্ষ এক-মাথা চুল চোখে-মুখে ঝুলতে থাকে, চুলের মধ্যে মোটা-মোটা আঙুল চালায় হেরম্ব, আর বইয়ের পাতায় চোখ বুলায়। এত চঞ্চল ছিল না ও। আজকাল একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারে না। মাঝে-মাঝে উঠে এসে উঠোনে পায়চারি করে, রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে তাকায়। মালতী লক্ষ্য করে, এর কারণও হয়তো অনুমান করতে পারে, কিন্তু কিছু কথা বলে না।

বলার সুযোগও অবশ্য নেই। কিছু জিজ্ঞাসা করার সুবিধেও পায় না সে। ভয় তার ছিলই, আতঙ্ক এখন আরো বেড়েছে। আবহাওয়া যখন বিষিয়ে উঠেছে, তখন সে বিষের ঝাঁঝ গায়ে না লেগে পারে না।

মায়া-মণিরাও মালতীর দিকে তাকায় আর মুচকে হাসে। মামার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেরম্ব। তার দু চোখ দু'টো টাটকা রক্তজবার মত দেখায়। হাত দিয়ে সে রুক্ষ চুল যেন ছিঁড়তে চেষ্টা করে। অকারণে পায়চারি করে ঘরের মধ্যে, কিন্তু পায়চারি সেটা নয়, অনেকটা ছুটোছুটি।

দু হাতের গর্তে মুখ ডুবিয়ে হরগোপালের ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসে আছেন নলিনাক্ষ। কিছু বলতেও আসেন নি, কিছু জানতেও আসেন নি। এখানে বসে সময় কাটাবার জন্যেই যেন আসা।

—মেয়ের সঙ্গে একদিন দেখা কর। ওষুধের শিশির গায়ে টোকা দিতে দিতে হরগোপাল বললেন, অনেকটা যেন নলিনাক্ষকেও টোকা দিয়ে তার মন পরীক্ষা করলেন।

জবাব না পেয়ে আবার বললেন, অগ্নিমান্দ্য হলে তার ওষুধ আছে আমাদের, বুদ্ধিমান্দ্যের তো কোনো দাওয়াই নেই। তোমার বুদ্ধিবিভ্রম হয়েছিল, নলিন। যেখানে মেয়ে দেবে সেখানে বরের খবরের আগে খবর নিতে হয় তার ঘরের। মেয়েকে স্বর্গে তুলে দিতে গিয়ে একেবারে জাহান্নমে পৌঁছে দিয়েছ।

নলিনাক্ষ চোখ বুজল। কি যেন ভাবছে। সোজা হয়ে বসে বলল, আজ যাব।

—কোথায় ?

—সেই জাহান্নমে।

হরগোপাল নলিনাক্ষের কাছে এসে বললেন, এটুকু খেয়ে নাও। তোমার নার্ভে খুব চাপ পড়েছে—বড় বেশি ভাবছ।

সেদিন সন্ধ্যায় নলিনাক্ষ একটা ছড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ট্রাম নিলেন না, বাস নিলেন না। তিনি ঝানু সৈনিক; জীবনে যুদ্ধ করেছেন অনেক। অনেক রণক্ষেত্র জয়ের গৌরব নিয়ে পার হয়ে এসেছেন। তাই তাঁর পরোয়া নেই কিছুতে। ফুটপাথের কিনার ঘেঁষে ঘাড় কাৎ করে কি ভাবতে ভাবতে সোজা হেঁটে চলেছেন নলিনাক্ষ। যেন সীমাহীন এক মরুভূমি পার হয়ে চলেছেন তিনি। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা, সেখান থেকে সরু গলিতে ঢুকলেন।

দু ঘরেই লোক। সুতরাং ঘরের পাশের অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন। রাবিশে ভরতি প্যাসেজ। ভাঙা মোড়া আর ক্যানেস্তার টিনে রাস্তা প্রায় বন্ধ। ডিঙিয়ে চলে এলেন ভিতরে। জানলা দিয়ে দেখলেন, হেরম্ব মাথা নীচু করে পড়ছে; দুটি ছেলে দুপাশে বসে। এক টুকরো উঠোনের প্রান্তে রান্নাঘর। নলিনাক্ষ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন।

বাঁশের চোঙা দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে মালতী। ধোঁয়া হচ্ছে আগুন হচ্ছে না কিছুতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। চমৎকার। তাঁর স্বপ্ন সফল করার জন্যে তাঁর মেয়ের কী প্রচণ্ড প্রয়াস চলেছে এখানে। ইচ্ছে হল, চীৎকার করে হেসে উঠবেন।

নলিনাক্ষ চাপা গলায় বললেন, সংগ্রাম। সংগ্রাম করছ?

চমকে উঠল মালতী, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক এই আবির্ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা, তুমি?

—সংগ্রাম দেখতে এলাম। তুমি তো ভুলে গেছ বাবাকে। একবারও তো ডাক না। একবারও তো বল না—

—কি বলব?

—তোমার যুদ্ধের সংবাদ। নলিনাক্ষের গলা যেন ধরে এল। বললেন, আমাকে ক্ষমা করতে বলি নে; আমাকে সংহার কর।

কে যেন ভেতরে ঢুকেছে। কুন্তলা চুপ করে মণিকে পাঠাল। নলিনাক্ষ মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। মণি চুপ করে দেখে গিয়ে খবর দিল। অন্ধকারে সে চিনতে পারল না কাউকে।

কুন্তলা বেগে বেরিয়ে এল, ঘর থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগল, কে, শেখর? দুপুরে সুবিধে হয় না বলে বুঝি রাত্রে হাজিরা দিতে এসেছ।

মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন নলিনাক্ষ, বললেন, কি বলছ?

উদ্যত ছোবলটা মাটিতে পড়ে মুখটা যেন থেবড়ে গেল কুন্তলার।

হেরম্বও বই-খাতা ফেলে ছুটে এল; শুধু শেখরকে নয়, মালতীকেও সে আজ দেখে নেবে। আজ হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলবে সে। হয় এস্পার, নয় ওস্পার। এসেই বলল, শোনো, শেখর।

নলিনাক্ষ ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেলেন। কারো দিকে ফিরেও তাকালেন না।

নলিনাক্ষ চলে যাবার কিছুক্ষণ পর হেরম্ব ভীষণ চীৎকার করে হেসে উঠল। জীবনে এই তার প্রথম হাসি। সে হাসির তোড় আর থামে না কিছুতে। হাসতে হাসতে দম প্রায় আটকে যায়, হেঁচকি ওঠে। আবার নতুন উদ্যমে হাসি শুরু হয়।

মণি পাখা নিয়ে এল, মালতী নিয়ে এল জল। আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করল। বালতি বালতি জল ঢেলেও হাসি থামানো গেল না তার। মাঝে দু-এক মিনিট হয়তো থামে, তখন বিড়বিড় করে হেরম্ব কি-যেন বকে, আবার নতুন উদ্যমে হাসি আরম্ভ করে দেয়।

আর কোনো সংকোচ নেই, কোনো জড়তা নেই, মালতী কোলের উপর হেরম্বর মাথা তুলে নিয়ে জল ঢালতে লাগল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, থাম, থাম। অত হাসে না। এত হাসতে তোমাকে আমি তো বলি নি।

দু-তিন দিন ধরে নিজেদের চেষ্টাতে যখন হাসি থামানো গেল না, তখন ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তারকে দেখেই হেরম্ব ভীষণভাবে আবার হাসি শুরু

করল। সারা শরীর ঝাঁকি দিয়ে প্রাণ খুলে সে হাসছে, চোখের মণি দুটো :ার দেখা যায় না। ডাক্তার পরীক্ষা করার কোনো সুবিধে না পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। মালতী বলল, কি হয়েছে ?

—মাথায় চোট লেগেছে মনে হচ্ছে। সারাদিন ধরে লেখা-পড়া করেন নাকি, তাতে মাথা উইক হয়েই ছিল, তার উপর হয়তো কোনো শক পেয়ে থাকবেন।

মালতী বলল, মাথাটা তবে কি খারাপ—

—একটু হয়েছে মনে হচ্ছে।

—যাকে বলে পাগোল—

—বলতে পারেন।

ডাক্তার চলে যাবার একটু পরেই মালতী চটি-পায়ে, ছাতা-হাতে বেরিয়ে পড়ল। কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে নিল ভালো করে। তারা রোড ধরে সে এগিয়ে চলেছে, কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। কে যেন ডাকল তার নাম ধরে।

হরগোপালবাবু। মালতী তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারীতে ঢুকল, বলল, ডাকছিলেন ?

—কোথায় চলেছ ?

—বাবার কাছে।

—খবর পেয়েছ তাহলে ? হরগোপালবাবু উঠে এলেন, বললেন, চল, সঙ্গে যাচ্ছি। এ অবস্থায় একা যাওয়া ঠিক না।

মালতী তাঁর হাত চেপে ধরে বলল, কি অবস্থা কাকাবাবু ? কি হয়েছে বাবার ? শিগগির বলুন।

—অমন হাসিখুশি মানুষ, গম্ভীর হয়ে গেছেন। উন্মাদ হয়ে গেছেন। একেবারে নিজের দোষে, নিজের খামখেয়ালীতে। চল।

হরগোপালের হাত ধরে মালতী অন্ধের মত চলতে লাগল। এই দিনের আলোতেও চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেবল কতগুলো জোনাকি যেন চোখের সামনে জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে।

খাটাল

শেষরাত্রে অ্যালার্ম-ঘড়ির ঘণ্টা ঘটা ক'রে বেজে ওঠে। নিস্তব্ধ কাঁকুলিয়া রোডের ঘুমন্ত পল্লী সেই উৎকট শব্দে চম্‌কে ওঠে হয়তো।

শান-বাঁধানো মেঝের উপর মোষেদের খুর খটখট আওয়াজ করে, লেজের ঝাপট দিয়ে মশা তাড়াবার আওয়াজও শোনা যায় সেই সঙ্গে।

কাঁকুলিয়া পল্লীর ঘুম ভেঙে যায় কি না, বলা শক্ত। কিন্তু এই শব্দে শোভনার ঘুম প্রত্যহই ভাঙে। ওদিকের খাটালের অ্যালার্ম-ঘড়ি স্তব্ধ হয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই তার মাথার কাছের ঘড়িটাও তেমনিভাবে আওয়াজ করে ওঠে। মাথার কাছের ঘড়ির শব্দে ঘুম তার ভাঙত আগে। আজকাল কয়েক মিনিট আগেই তার ঘুম ভেঙে যায়। জেগে সে একটা আতঙ্ক নিয়ে শুয়ে থাকে, প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি বেজে ওঠে এই ঘড়িটা। হাত বাড়িয়ে কাঁটা সে ঘুরিয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহলে কি আর রক্ষে আছে! একদিন ঘড়ি যদি না বাজে তাহলে তিনকড়ি হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাবে। প্রাণ গেলেও নিজের ব্যবসা মাটি করতে রাজি নয় তিনকড়ি।

তেতলার দক্ষিণদিকের কোণের ঘরটা তাদের শোবার ঘর। রাস্তার ওপারে তার খাটাল। ন'টা মোষ তার তিনটে গরু।—শেষরাত্রে সে উঠে গিয়ে দুধ দোওয়ার তদারক করে। তাই অ্যালার্ম-ঘড়ি মাথার কাছে থাকা দরকার। খাটালের জন্যে আলাদা একটা ঘড়ি কিনেছে তিনকড়ি। হরবিলাস রাজারাম ও নাকুর ঘুম ভাঙাবার জন্যে। এরা তার খাটালের নোকর। বড় বিশ্বাসী এরা। দুধে জল আর ভেজাল মেশাবার কথা এরা কাউকে বলে না। কিন্তু অ্যালার্ম-ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে সারা পাড়াকে হুঁশিয়ার করে এরা দুধ থেকে মাঠা তোলে, তরল দুধে অঢেল জল ঢালে,

কি-সব পাউডার গুলে দেয়—তার পর মহুয়ায় তেল মিশিয়ে নেয়। এই নতুন দুধ দেখলে কে বলবে—এ দুধ খাঁটি দুধ নয়। উপরে মহুয়াতেল ভাসতে দেখে মনে হয় বুঝি মাখন ভাসছে।

শোভনা অনেকবার বলেছে, দুধের ব্যবসা ছেড়ে দাও।

—কি ব্যবসা করবো তবে ?

—কত ব্যবসা আছে, পোলট্রি খোলো। হাঁসমুরগীর চাষ কর, ডিমে অনেক লাভ।

তিনকড়ি চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা থেকে ওঠে, বলে, ছোঃ, যে-ব্যবসায় ভেজাল চলে না, সে-ব্যবসা করে ভদ্দরলোক।

সারা গা শিরশির করে ওঠে শোভনার। গা শিরশির করছে আজ থেকে নয়। দু বছর পার হয়ে গেছে। তিনকড়ির সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকেই।

যুদ্ধে গিয়েছিল তিনকড়ি—এরোপ্লেনের কাজ নিয়ে নাকি যুদ্ধে যায়। অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীকে কেমন আশ্চর্য আর অদ্ভুত দেখায় তার এন্তার গল্প বলেছে শোভনার কাছে। কিন্তু সে গল্প শুনে কিছু বুঝতে পারেনি শোভনা। আকাশের গল্প ব'লে ব'লে তার মনে আকাশস্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়ে তিনকড়ি অ্যালার্ম-ঘড়ির ঘণ্টা শোনার প্রতীক্ষায় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে থাকে প্রত্যহ। দক্ষিণের জানালা দিয়ে শেষরাত্রির তারার আলো ঘরে ঢোকে। সেই আলোতে শোভনা আড়চোখে তাকায় তিনকড়ির দিকে। তিনকড়ির বুক কঠিন মাংসপেশীতে উদ্ধত হয়ে আছে। বলিষ্ঠ নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। প্রত্যহের শেষরাত্রিটা ধূলিসাৎ করে এক্ষুনি উঠে যাবে তিনকড়ি। এক্ষুনি সে গিয়ে ঢুকবে খাটালে। ওই মাংসপেশী আর ওই বলিষ্ঠ নিশ্বাস প্রত্যহ শেষরাত্রির এই অভিসার দিয়ে পণ্ড করে দিচ্ছে তিনকড়ি। কিন্তু তিনকড়ি তা জানে না। —দিনের বেশির ভাগ সময় সে কাটিয়ে আসে খাটালে, আর রাত্রির পরম রমণীয়তা সে তুচ্ছ করে

দেয় ওই খাটালেরই মায়ায়। এ ব্যবসার দরকার কী? বিমানবহরে কাজ করেছে যে নওজোয়ান, যার ধন আর ঐশ্বর্যের অভাব নেই—তার জীবন তো গড়ে উঠবে নতুন মহিমা নিয়ে। প্রাণের আবেগে সে নতুন দিক আবিষ্কার করবে।

শোভনার জীবনে এটা একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা। ছেলেবেলা থেকে একটা ভয়ংকর স্বপ্নকে লালন করতে করতে সে এত বড় হয়ে উঠেছে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবে সে, পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে সে বাঁধবে পরম আত্মীয়তা দিয়ে—এই ছিল তার স্বপ্ন। সে যেন জানত, তার এ স্বপ্ন একদিন বাস্তব রূপ নেবে। একদিন সত্যিই সে তার স্বপ্নের রাজ্যকে পেয়ে যাবে তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু একার চেষ্টায় সব সাধ নাকি মেটে না। একটা পাখা নিয়ে কবে কোন্ পাখী উড়তে পেরেছে?

দেশদেশান্তর দূরদূরান্তর সম্বন্ধে তার যা কিছু ধারণা, তার সবই পুঁথিগত। চাক্ষুষ পরিচয় একদিন যে তা ঘটবে— এ বিষয় স্থিরবিশ্বাস তার ছিল। তাই তিনটি পাত্রকে পরিহার করে সে তিনকড়িকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। ধন আর ঐশ্বর্য এর আছে, স্বাস্থ্য আছে, চেহারা আছে। তার উপর জীবনে অভিজ্ঞতাও আছে এর। বিমানবহরে কাজ করেছে। শোভনার যেন মনে হল, তার চোখে যে-আকাশস্বপ্ন লেগে আছে, সেই আকাশ প্রত্যক্ষ করে এসেছে তিনকড়ি, সেই আকাশ সে মন্থন করে এসেছে বৃহদাকার দুটি পাখায় ভর করে। তিন-তিনটে বড় ঢেউ ডিঙিয়ে শোভনা যেন একটা নিরাপদ আশ্রয়বন্দর পেয়ে গেল। প্রথম পাত্রের নাম আজও মনে আছে শোভনার, নিখিলেশ—মাদ্রাজের কি একটা কলেজের অধ্যাপক; দ্বিতীয়জন নাট্যকার মিহির মুন্সী; তৃতীয়জন জি আই পি রেলের ইঞ্জিনীয়ার—হরিধন, না কি যেন নাম। এদের কাউকেই চাক্ষুষ দেখেনি শোভনা। কিন্তু এদের নাম আজও তার মনে ঝংকার দিয়ে ফেরে কেন-যেন।

শেষরাত্রে অ্যালার্ম ঘণ্টা নিয়মিত বেজে চলেছে। শান-বাঁধানো মেঝেতে মোষেদের খুরের শব্দও নিয়মিত বাজছে। কিন্তু সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কার বুকের মধ্যে ব্যর্থতার ঘণ্টাধ্বনি নিয়ত আর্তনাদ করে বেজে উঠছে—এ খবর কেউ রাখে না; রাখার অবকাশও নেই কারও। যা-কিছু চাওয়া যায় তার সবই পেতে হবে—এমন কিছু নিয়ম নেই। কিন্তু কিছু বলতে কিছু না পেলে মন বিদ্রোহী নাকি হয়ে ওঠে। তিনকড়ির রূঢ়তাকে উপেক্ষা সে করতে পারে, কিন্তু রূঢ়তা আছে বলেই রুচি তার থাকবে না কেন? গরু আর মোষ নিয়ে জীবন কাটাবার যার সাধ, সে কেন তার জীবনের সঙ্গে শোভনাকেও জড়িয়ে নিতে চায়—শোভনার এই হচ্ছে আক্ষেপ।

রাত্রির পর রাত্রি অতীত হয়ে যাচ্ছে, দিনের পর দিন। তিনকড়ি যেন ক্রমশ তার খাটালের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

—ডুবে যাব না? কী দারুণ লাভ হচ্ছে জানো? নতুন মোষটার দাম তুলে নিয়েছি এরি মধ্যে—এই দেড় মাসে। এবার আরও কয়েকটা কিনব। খাটালটার এক্স্‌টেনশন দরকার।

শোভনা বিরক্ত হয়ে বলল, ও খবরে আমার কি লাভ?

—নতুন নেকলেস্ হবে তোমার এবার পূজোয়। কথাটা বলে দিগ্বিজয়ের গৌরব নিয়ে তিনকড়ি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

রুষ্টচোখে শোভনা একবার তাকাল তিনকড়ির দিকে। লোকটা কেমন যেন হয়ে গেছে দেখতে, চোখমুখের ভাবই গেছে বদলে। হরবিলাস রাজারাম আর নাকুর সঙ্গে যেন কোনো তফাত নেই আর।

যে তিনটে ঢেউ ডিঙিয়ে এই আশ্রয়-বন্দরটা পেয়েছে শোভনা সেই তিনটে ঢেউ যেন তাকে ডাকতে লাগল অদৃশ্য ইশারায়। সারা শরীর শিরশির করে উঠতে লাগল শোভনার। তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, হোক; কিন্তু রেহাই তাকে পেতে হবে। এই খাটালের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে তাকে।

লেজের ঝাপট দিয়ে মোষেরা মশা তাড়ায়। অন্ধকার খাটালের এক কোণে দাঁড়িয়ে মোষের পিঠ চুলকে দিতে থাকে তিনকড়ি; গর্দানে হাত বুলিয়ে আদর করে। আর উপরের ঘরে তারার আলোর মধ্যে শুয়ে শুয়ে শোভনা দক্ষিণের বাতাস উপভোগ করে একা।

খাটালের অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ি লাফ দিয়া উঠে চলে গেল। শোভনাও উঠে বসল। মাথার কাছের ঘড়িটার চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে তার সংকেতধ্বনির সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিল শোভনা। যেন তার নিজের ব্যর্থতার চরম প্রতিশোধ নিলে সে।

অন্ধকার তখনো কাটেনি। কাঁকুলিয়া পল্লী ঘুমে অচেতন। ভোর হতে এখনও কম করে এক ঘণ্টা বাকী। এক ঘণ্টায় অনেকটা পথ হেঁটে পার হওয়া যায়। মোষেদের খুরের উৎকট শব্দ, শিংঘর্ষণের আওয়াজ, মাছি তাড়াবার জন্যে লেজের ঝাপট পিছনে ফেলে শোভনা যাত্রা করল। কোথায় চলেছে, তা সে নিজেই বুঝি জানে না।

সাপের গতির মত কিলবিলে আঁকাবাঁকা রাস্তা এই কাঁকুলিয়া। আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে সদর রাস্তায় এসে পড়ল সে। এত রাত্রে রিক্‌শা? টুংটুং শব্দ করে একটা রিক্‌শাই আসছিল এদিকে। শোভনা কর্নফিল্‌ড রোডে ঢুকে পড়ল। রাস্তার গ্যাসের আলো তার পিছু পিছু তাড়া করে যেন চলেছে। একটা আলোর এলাকা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটার কবলে পড়তে হচ্ছে তাকে। ধীরে ধীরে সে সরু রাস্তায় শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছল, সেখান থেকে ডিহি শ্রীরামপুরের দিকে মোড় ফিরল। তার পর তাকে আর দেখা গেল না।

আশ্চর্য, কোথায় গেল সে? তিনকড়ি কিছুই ভেবে পেল না। না বলে-কয়ে যাওয়ার মেয়ে তো সে নয়। বেলা যতই বাড়তে লাগল তিনকড়ির ভাবনাও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। এই খাটাল ফেলে রেখে সে খুঁজতেই-বা যাবে কোন দিকে? সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই

ঠিক করল তিনকড়ি। এর মধ্যে যদি না ফেরে তবে থানায় খবর দেবে।

নন্দবাবু প্রবীণ লোক। বললেন, বিদুষী ভার্যা ঘরে আনবার আগে সামাল হলে না ভায়া ?

—কাকাবাবু, ও মেয়েটার টাইপই তেমন নয়; কোনো দেমাক নেই, কোনো জাঁক নেই। একেবারে চুপচাপ। পেটে অত বিদ্যে, বোঝবার উপায় নেই।

নন্দবাবু বললেন, পেটে পেটে বিদ্যে, সেই বিদ্যে এবার জাহির করে গেল। বোঝো !

তিনকড়ি বলল, কি করা যায়, কাকাবাবু ?

—কী আর করবে, তুই হাত দিয়ে বুক চাপড়াও।

মাথা নীচু করে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তিনকড়ি। বুদ্ধি চেয়েও সে বুদ্ধি পাচ্ছে না, এই তার আক্ষেপ।

সন্ধ্যের দিকে বীরেন আইচ এসে বলল, খবর পেলে ?

—না, এবার থানায় খবর দেব ভাবছি। তিনকড়ি যেন তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আইচ বলল, থামো। বউ কেউ চুরি করেনি তোমার। কার নামে এজাহার দেবে ? আপনিই সে চলে গেছে, তবে থানা-পুলিশ করে লাভ কি ? এতে তোমার কদর বাড়বে ?

তিনকড়ি বলল, ঠিক। চুপ করে বসে থাকি তাহলে। আসে আসবে না-আসে না আসবে।

আইচ অনেকক্ষণ ধরে কী-যেন ভাবল, বলল, লেখাপড়া-জানা বউ আনলে, কিন্তু তার মনের মত হয়তো হতে পারলে না তুমি তিনকড়ি।

—তার মানে ?

আইচ বলল, কিছু না। আচ্ছা, চাল ভাই।

তিনকড়ি নিজেকে যেন বিচার ও বিশ্লেষণ করতে বসল। শোভনার পুরনো কথাগুলির প্রতিধ্বনি বাজিয়ে তুলল সে তার মনে। মেয়েটার অনেক বাসনা আর কামনা ছিল বলেই যেন মনে হচ্ছে তার। হাজার হাজার দেশের গল্প বলার অভ্যেস ছিল তার বেজায়—তার কথা শুনে বিরক্তই হত তিনকড়ি। অনেক দেশ দেখেছে তিনকড়ি, কিন্তু দেশ দেখে লাভ! এত দেখে সে শিখেছেই বা কী, জেনেছেই বা কী? যুদ্ধের মধ্যে উড়োজাহাজ তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে কত জায়গায়। কিন্তু তাতে তার উপকারটা হল কি? তার টাকা হয়েছে মেলা, না, পা গজিয়েছে চারটে? তিনকড়ি তেতালার বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকল, এই নাকু, হরবিলাস, মোষটা ঘোঁৎঘোঁৎ করছে কেন। ছাখ্, কিছু দেখে ভয় পেয়েছে কিনা।

হারিকেন নিয়ে হরবিলাসরা মোষের ভয় ভাঙাতে ছুটল।

সেদিন শেষরাত্রেও যথারীতি খাটালের অ্যালার্ম বেজে উঠল। হন্তদন্ত হয়ে তিনকড়িও যথারীতি সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল নীচে। ঠিক সেই সময় শাণিত হুইসলের শব্দে শোভনার ঘুম ভেঙে গেল। এ সময় হুইসল না বাজলেও তার ঘুম ভেঙেই যেত হয়তো। এই অসময়ে ঘুম ভাঙা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

জানলার কাছে বসল শোভনা। তারাখচা একটা প্রকাণ্ড আকাশ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সে। এই জানালা দিয়ে আকাশের যে ভগ্নাংশটা সে দেখছে, তেতলার জানালায় বসে বসে তিনকড়িও হয়তো এখনো আকাশের সেই খণ্ডটার দিকেই চেয়ে আছে। কোনোদিন যাকে সে আকাশের দিকে চাওয়াতে পারেনি, আজ হয়তো সে অন্যমনস্ক হয়ে সেই আকাশের দিকেই চেয়ে চেয়ে এক মনে ভাবছে। শোভনারই ভুল হয়েছিল, হিসেব করে আর হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলার জন্যে সে তৈরি হয়েছিল। এবার আর সমঝে চলা নয়, এবার সে বেহিসেবী ও বেপরোয়া।

বাসি খবরের কাগজটাই খুলল শোভনা। খবরের কাগজ পড়ার সময় এটা নয়, ট্রেনের আলোও খবরের কাগজ পড়ার মত পর্যাপ্ত নয়। তবু শোভনা

সময় কাটাবার জন্যে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। একটা চাকরির সংবাদও খুঁজে পেল না। বন্ধ করে রেখে দিল কাগজ।

পুণায় গেলে কেমন হয়? মল্লিকা তো এখন পুণাতে। মাস্টারি করছে। ওর নামে অনেক বদনাম আছে। থাক গে। এখন তো আর খুকি নয় শোভনা। তার বাবা যে বদনাম দেখে ভয় পেতেন, সে বদনামে তার নিজের ভয় কি? এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার। এখন বদনামেরও ভয় নেই তার, বাবাকেও আর ভয় নেই। বাবা তো আর পরলোক থেকে শাসন পাঠিয়ে দিতে পারবেন না।

মল্লিকা বলল, সে কি রে? একা একা। শুনলাম, বিয়ে-সাদি করে ঘর-সংসার করছিস। হঠাৎ খবর-টবর না দিয়ে?

শোভনা বলল, সব বলব।

—বনল না বুঝি?

শোভনা বলল, বনবে না কেন? একা আসতে নেই বুঝি?

মল্লিকা হাসতে হাসতে বলল, খোকাখুকু কিছু হয় নি।

—হলে তো দেখতেই পেতে। চলো, ঘরে চলো।

দুজনে ঘরে গিয়ে বসল। মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি।

মল্লিকা বলল, তুই বিয়ে করবি, স্বপ্নেও ভাবিনি। তোর মত মেয়ে—

শোভনা বলল, বাবার পাগলামি। তবু তো তিনটে নাকচ করেছিলাম।

মল্লিকা হেসে বলল, এই চতুর্থ পুরুষটি লোক কেমন?

শোভনাও তেমনি হেসে বলল, গ্র্যাণ্ড। তুমি বিয়ে-টিয়ে করবে নাকি?

আঁৎকে ওঠার মত করে মল্লিকা বলল, রক্ষে কর। ওদের সঙ্গে মিলবে মিশবে হাসবে খেলবে, ভালোবাসবে না আর ধরা দেবে না।

শোভনা যেন কিছু জানে না, এমনিভাবে বলল, হেতু?

—হেতু? তুমি যা চাইবে, ওরা তা দেবে না; যা চাইবে না, তাই চাপাতে থাকবে।

শোভনা বলল, ওতে বদনামের ভাগী হতে হয়।

—বয়ে গেছে। আমার মত বদনাম আছে ক'জনের? তাতে আমার গেল-এল কী? কে পরোয়া করছে?

শোভনা চুপচাপ শুনল। কোনো জবাব দিল না। মল্লিকার এই অভিজ্ঞতার সূত্রটা জানার আগ্রহ তার একটু হল বটে। কিন্তু সে কথা না তুলে সে মনের আবেগে তার আত্মকথা বলে গেল অকপটে।

সব শুনে মল্লিকা বলল, স্যাড্। দুঃখের সংবাদ দিলে ভাই। তবে এখন তোমার প্ল্যান কি? প্রোগ্রাম?

—কিছু ঠিক করি নি। যদি মাস্টারি পাই একটা!

মল্লিকা আবার যেন আঁৎকে উঠল, বলল, বলিস কি? বিয়ের চেয়েও এটা খারাপ চাকরি।

শোভনা বলল, একটা কিছু তো করতে হবে।

—ভেবে দেখা যাবে এখন।

আট-দশ দিন কেটে গেল। মল্লিকা কী যে ভাবল আর কী যে ভেবে দেখল, তা কিছুই বোঝা গেল না। কোনোদিন ইস্কুল থেকে সোজা বাসায় ফেরে, কোনোদিন ফিরতে রাত বেজে যায় অনেক।

—এত দেরি হল আজ?

মল্লিকা বলে, কাৰ্কি গিয়েছিলাম। তোমার একটা ব্যবস্থা হবে মনে হচ্ছে।

সাগ্রহে শোভনা বলল, কি?

—বলব বলব, ব্যস্ত কেন? আগে ঠিক করে নাও নিজে তৈরি কি না! তুমি শিল্পী, তাই বলছি, বি অ্যান্ আর্টিস্ট।

মানে বুঝতে পারল না শোভনা। হঠাৎ তাকে শিল্পী বলে আখ্যাত করার হেতু ঠাহর করতেও পারল না সে।

কাপড়চোপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে এসে মল্লিকা বলল, শিল্পী ছাড়া কী। তুলি দিয়ে আঁকো না বলেই কি তুমি শিল্পী নও? তোমার প্রাণ-মন-অন্তরাত্মা

আগাগোড়া শিল্পী। বলো, ঠিক কি না। তিনকড়িকে তা না হলে সইতে পারলে না কেন? তুলি দিয়ে ছবি আঁকো না, কিন্তু মনে মনে হাজার ছবির নক্‌শা তুমি এঁকেছ। তোমাকে তো আজ নতুন দেখছি নে।

শোভনা অবাক হয়ে চেয়ে রইল মল্লিকার দিকে। মল্লিকা কী করে তার মনের কথা টের পেল, এই যেন তার বিস্ময়।

—মারাঠী মেয়েদের আমার ভারী পছন্দ। তারা ভারি ফরোয়ার্ড। তোমাকেও তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব। কী, রাজি?

শোভনা বলল, সবটা শুনে নি আগে!

—অভিনয় করতে হবে।

—অভিনয়? বল কি মল্লিকা, অভিনয় আমার আসবে?

—যার মন আছে, মেজাজ আছে, সেন্টিমেণ্ট আছে, রুচি আছে—

বাধা দিয়ে শোভনা বলল, এসব আমার আছে তোমায় বলল কে?

—তিনকড়ি।

মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল শোভনার, বলল, তার মানে? তাকে পেলে কোথায়?

—তোমার মধ্যে, তোমরা মুখে। মল্লিকা মাথার কাঁটা দিয়ে সিঁথি চুলকাতে চুলকাতে বলল।

বম্বেতে একটা ছবি তোলা হবে—ছায়াছবি। জিন্দগী। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের দিয়ে প্লে করানো ঠিক হয়েছে। ডিরেক্টর নাকি কার্কিতে এসেছিলেন মেয়ে রিক্রুট করতে। মারাঠী পাঞ্জাবী ও রাজপুত মেয়ে জোগাড় হয়েছে জনকয়েক—মেয়েরা সবাই সম্ভ্রান্তও বটে সদ্বংশেরও বটে। স্বতরাং দ্বিধা আর সংকোচের কোনো কারণ নেই। এই রকম অর্গানিজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে শোভনা যা চায়, তা পাবে বলে মল্লিকার বিশ্বাস। ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ থাকা শোভনার ধাতে সয় না, শোভনা চায় রুচি ও শোভা, শোভনা চায় কালচার ও কৃষ্টির

সঙ্গে পরিচিত হতে, শোভনা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে চায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, দেশের ভূগোলের সঙ্গে চায় অন্তরঙ্গতা। সুতরাং এ-পথ তারই পথ।

অনেক্ষণ ধরে শোভনা কি যেন ভাবল। বলল, ঠিক। আমি রাজি। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও আমার।

মল্লিকা পায়ের উপর থেকে পা নামিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে আড়ালে বলার মত করে বলল, পথ কিন্তু একটু পিছল। একটু, কি যেন বলে, অঙ্গুলি চাপি চলতে হবে।

আবার অনেকক্ষণ ধরে ভাবল শোভনা। তার যেন মনে হতে লাগল, সে মুক্ত হয়ে গেছে। জীবনের যে পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে তিনকড়িকে সে নির্বাচন করেছিল, সেই পরম পিপাসার চরম চরিতার্থতা এবার হয়তো হাতের মুঠোয় এসে যাবে তার। হাজারো অভিজ্ঞতা লাভ করবে সে, তার আবাল্যের স্বপ্ন আজের এই পরিপূর্ণ যৌবনে এসে সার্থক হয়ে উঠবে নির্ঘাৎ। গ্রন্থকীট নরহরিবাবুর যোগ্য দুহিতা সে, বাবার চোখের স্বপ্ন সে তার নিজের চোখে টেনে নিয়েছে। কাজলের মত দু চোখে সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা আছে সেই স্বপ্ন। নরহরিবাবু বলতেন, আজ যা আমার কাছে গল্পে শুনছ, বড় হয়ে তা নিজের চোখে দেখো।

বাবার আশীর্বাদ আর বাবার দেওয়া মন্ত্রই তার পাথেয় হয়ে আছে। তাই সম্বল করে এবার যাত্রা শুরু করবে শোভনা। মন্দিরে মন্দিরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে প্রাচীনকালের শিল্পাক্ষর, ঐতিহাসিক মিনারে আর ইমারতে দেশ আছে আচ্ছন্ন হয়ে, মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে জমে আছে স্নেহ প্রীতি ও প্রণয়। মধুমক্ষিকার মত ঐসব শিলার কুসুম থেকে জ্ঞানের মধু আহরণ করতে হবে তাকে। এইজন্যেই তো তিনকড়িকে সে দ্বিতীয় পাখনারূপে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে ডানা মেকি ডানা। তার ওড়বার সাধ্য নেই। এবার শোভনা নতুন পথে হাওয়া হয়ে যাবে।

অগাধ আশা নিয়ে শোভনা ঝাঁপ দিল। মল্লিকা বিদায় দিয়ে বলল, ভেজাল থেকে দূরে থেকো, অভিনয় যেন জলো হয়ে না যায়। শুনলাম, তুমি হবে ঝাঁসির রাণী। গুডবাই লক্ষ্মীবাঈ।

ট্রেন ছেড়ে দিল। পুণা থেকে বোম্বাই। পশ্চিমঘাটের কিনার বেয়ে মসৃণ দ্রুততায় শব্দহীন গতিতে ইলেকট্রিক ট্রেন ছুটে চলল।

অহল্যা মেয়েটা খুব চটপটে, আর খুব হাসিখুশি। মেনকা তারা শান্তা স্নেহপ্রভা আর কৌশল্যা একটু যেন গম্ভীর প্রকৃতির।

তারা শোভনার পাশে বসে ছিল। অহল্যা গান ধরল। শান্তা মুখ বুজে তাল দিতে লাগল পা দিয়ে। কৌশল্যা ও স্নেহপ্রভা ওপাশে বসে একমনে গল্প করতে করতে চলল।

যাত্রা শুভই মনে হল শোভনার। তারার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, গলা তো বেশ ভালো।

তারা সায় দিল বটে, কিন্তু একটু বাদে সেও গুনগুনিয়ে উঠল। বলল, বম্বে মিউজিক কনফারেন্সে অহল্যা থার্ড হয়েছিল, আমি ফার্স্ট হই সেবার।

শোভনা তারার দিকে ফিরে তাকিয়ে তার মুখটা যেন ভালো করে দেখল। তারার কাঁধের পাশ দিয়ে ট্রেনের জানালার ওপারে পশ্চিমঘাটের পর্বতমালা একে একে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

একটা লম্বা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ট্রেন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কৌশল্যা তারা শান্তা আর অহল্যারা।

কল্যাণ স্টেশনে গাড়ী পৌছলে পৃথ্বিরাজ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া চেহারা ডিরেক্টারের। সিপাহী-বিদ্রোহের ছবি তুলবেন ইনি। চোখেমুখে তাই হয়তো বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন! ওই চেহারার সঙ্গে মুখের ওই তেজটা যেন খাপ খেয়ে গেছে। পরনে খাকির ট্রাউজার, গায়ে বুশ শার্ট, পায়ে মোটা ক্রেপসোলের ভারি

জুতো, চোখে কালো কাঁচের চশমা, মাথায় ফেল্‌ট টুপী। দেখেই বোঝা যায় লোকটা কাজের।

দাদরে মস্ত একটা বাঁড়ি নেওয়া হয়েছে আর্টিস্টদের থাকবার জন্যে; যেসব আর্টিস্ট বাইরে থেকে রিক্রুট করা হয়েছে তাদের জন্যে। এখানে এসে শোভনারা আস্তানা নিল। বাড়িটা দেখে শোভনার মনে হল, এই তার স্বপ্নের রাজপুরী। এটা যেন বাড়ি নয়, প্রাসাদ। চারদিকে চারটি সিংহদ্বার, কুচো পাথরে ঢালাই করা রাস্তা বাড়িটাকে ঘেরাও করে আছে। উত্তরে একটি ঝরনা; তারই অদূরে নগ্ন নারীমূর্তি, কোন্ পাথুরে যাদুকরের যেন হাত-সাফাই। মূর্তিটা ব্রীড়াময়ী, পাথর উপচে যেন ত্রৈলোক্য লাবণ্য সারা গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ভারি ভালো লাগল শোভনার। পালঙ্কগুলো অবশ্য সোনার নয়, স্প্রিংএর। সেই পালঙ্কে শুয়ে সে গভীর রাত্রে তিনকড়ির কথা হয়তে ভাবে। ওদিকের পালঙ্কে কৌশল্যা তার বিপুল শরীর নিয়ে যখন পাশ ফিরে শোয়, পালঙ্কের স্প্রিং তখন মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে। ওই শব্দটায় তার কানে লেজ ঝাপটানি আওয়াজ বাজে। কিন্তু সেসব তো ছেঁড়া কাঁথার মত ফেলে এসেছে শোভনা। হাজারো রকমের বই মলাট থেকে মলাট পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করেছে সে; সেইসব গ্রন্থে যে বিচিত্র ছবির সাক্ষাৎ সে পেয়েছে, তার এই নতুন জীবনের সঙ্গে তা যেন, পুরোপুরি না হলেও, অনেকাংশে মিলে যাচ্ছে।

সত্যম্ আর শিবম্ সে চায় কি না, তা অবশ্য সে জানে না। কিন্তু সুন্দরম্ তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস। সুন্দরের আহ্বান নিয়ত তার কানে বেজেছে বলেই আজ সে দক্ষিণখোলা সেই ত্রিতলের মায়া ত্যাগ করে চলে এসেছে।

গুডবাই লক্ষ্মীবাঈ—মল্লিকার বিদায়ের বাণীটা তার কানে ঝংকার দেয়। ঝাঁসীর রাণী হতে হবে তাকে। তাই ক'দিন ধরে সে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে; সেই বীরাঙ্গনার জীবনী পড়ছে বসে বসে। নিজেকে তার সঙ্গে একাত্ম করে তুলবার জন্যে সাধনা করছে যেন শোভনা। কঠিন দায়িত্ব যখন

এসে পড়েছে তার উপর, তখন সেই দায়িত্বের অনুপাতে কঠোর ব্রতপালন করতেই হবে তাকে। নিজেকে সে প্রাণে-মনে আচারে-আচরণে অকৃত্রিম লক্ষ্মীবাঈ ক'রে তোলার চেষ্টায় রত হল। জীবনে অভিনয় সে করে নি, অভিনয় করতে সে পারবে না। লক্ষ্মীবাঈ সে সাজবে না, সে লক্ষ্মীবাঈ হবে।

কৌশল্যারা হেসে মরে আর-কি। মেয়েটার মাথা খারাপ হল নাকি।

পৃথ্বিরাজ শুনে বলল, ওটা নারভাস্‌নেস্‌। অত সিরিয়াস হলে কাজ হবে কি! আমরা চাই চেহারা—বাস্‌। ঝাঁসীর রাণীর মত চেহারাটা যখন আছে, তখন আর পরোয়া কি।

শুনে কেমন খটকা লাগল শোভনার। এই চেহারা নিয়ে দাঁড়ালেই লক্ষ্মীবাঈ হয়ে যাবে সে?

কুমার সিং, নানাসাহেব আর তাঁতিয়া তোপীরা ওপাশে বসে সিগারেট টানছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল। ওদের মুখে কোনো জেল্লা নেই, সাহসের ঝিলিক নেই, বিদ্রোহের দীপ্তি নেই। এপাশে লম্বা সোফায় কৌশল্যারা বসে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। কানপুর আর ব্যারাকপুরের সিপাহীর দল স্টুডিয়োর বাইরে বাগানের বেঞ্চে বসে হল্লা করছে। শুধু একজন চুপচাপ বসে থাকে, কারো সঙ্গে মেলে মেশে না—তার নাম শ্যামল। শ্যামল ছবির সংলাপ আর গান লিখছে নাকি—ও নাকি কবি।

পৃথ্বিরাজ বলে, উৎরে যাবে। যে টিম জোগাড় হয়েছে, এতে সাক্‌সেস না হয়েই যায় না।

শোভনার স্বপ্নের প্রাসাদের কার্নিশ যেন খসে পড়ছে। দূর থেকে দ্বীপের অরণ্য নিবিড় বলেই ঠেকে অবশ্য, উত্তাল তরঙ্গ মন্থন ক'রে সে দ্বীপে পদার্পণ করা মাত্র গাছেরা হয়ে দাঁড়ায় আগাছা, বন হয়ে যায় বিরল।

বিদ্রোহ তখনও বেধে ওঠেনি, সবে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এইসবের কাটাকাটা কয়েকটি ছবি নেবার পর হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে গেল। পৃথ্বিরাজের সঙ্গে গত রাত্রে ফাইনান্‌শিয়ারের নাকি হাতাহাতি হয়ে গেছে। ওরা তো সব

অকথ্য কথা বলছে। তারাকে নিয়েই নাকি গণ্ডগোল, দু'জনের মধ্যে রেষারেষি।

শোভনার শরীর শিরশির করে উঠল। মল্লিকা জেনেশুনে, না, না-জেনে তাকে এদিকে ঠেলে দিয়েছে—তা অবশ্য সে জানে না। কিন্তু তার রাগের প্রথম চোট গিয়ে পড়ল মল্লিকারই উপর। খসখস করে লম্বা একটা চিঠি লিখে বসল মল্লিকাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সেটা ছিঁড়ে ফেলল। গ্রন্থের অরণ্যে সে মানুষ, তার মাথার শিরায় শিরায় হাজার বইএর অগণিত ছত্র লাইন বেঁধে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণকায় সেই অক্ষরের আড়ালে কী লুকানো আছে তাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল সে। যে গাঢ় কাজল তার চোখে পরানো আছে, তা যেন ধুয়ে মুছে না যায়—এই তার উৎকণ্ঠা।

কয়েকদিন বাদে খবর পেল, ছবি নাকি উঠবে। ওদের মধ্যে রফা নাকি হয়ে গেছে। কিন্তু চট্‌ ক'রে সেটে না নেবে আরো কিছুদিন মহড়া দিতে হবে তাদের—নইলে ছবি নাকি মার খেয়ে যাবে। এ-প্রস্তাব খারাপ লাগল না শোভনার। ওদের হুঁশ যে হয়েছে—এতে সে বরঞ্চ আরামই পেল। কিন্তু তার নিজের উপর বিশ্বাস যেন আর নেই। মনেপ্রাণে তেজে-দীপ্তিতে সাহসে আর পরাক্রমে নিজেকে সে লক্ষীবাঈ ক'রে তৈরি করে তুলেছিল প্রায়, এমন সময় আচমকা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল—এতে তার মেজাজ যেন মাটি হয়ে গেছে। সে মেজাজ ফিরিয়ে আনা তার দুরূহ ব'লে মনে হতে লাগল।

তারার চেহারাই বদলে গেছে। তাকে দেখলে এখন অগ্নিশিখা বলে বোধ হয়। পুণার ট্রেনে সে ছিল প্রদীপের আলোর মত ঠাণ্ডা, এখন সে আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যেন। অহল্যা মেনকা আর কৌশল্যার বদলও চোখে পড়ে বটে, কিন্তু এ-বদল তেমন মারাত্মক ব'লে ঠেকে না।

পৃথ্বিরাজ আর শ্যামল আসছিল। শোভনা ওদের সিঁড়ির উপর দেখেই ঘরে চলে গেল।

হল-ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে কীসব কথাবার্তা হল, শোভনা সব শুনতে গেল না। তার পর পৃথ্বিরাজরা হয়তো চলে গেল।

মেনকা ছুটে এসে শোভনার থুৎনি ধ'রে নাড়া দিয়ে বলল, নয়া সমাচার। শুনা নেই?

শোনে নি শোভনা। মেনকা বলল, আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি।

আমরা মানে? জিজ্ঞাসার দৃষ্টি দিয়ে শোভনা তার দিকে তাকাল।

মেনকা বলল, আমাদের পার্টি—আমরা সবাই। নতুন কনট্রাক্ট পাওয়া গেছে। কাশ্মীরে লড়াই করছে যেসব সেপাইভাইরা, তাদের আনন্দ-পরিবেশন করতে হবে আমাদের। পরশু যাচ্ছি আমরা, তরশু সেখানে নাচনা-গানা হবে।

—এত জল্‌দি যাওয়া হবে কী ক'রে?

—এরোপ্লেনে কত সময় আর লাগে? পরশু ভোরে সান্তাক্রুজ থেকে হাওয়া হব, দুপুরে পৌছব দিল্লী, বিকালে শ্রীনগর।

শিহরিত হয়ে উঠল শোভনা। ভয়ে নয়, পুলকে। উড়োজাহাজে উঠে ভূস্বর্গে গিয়ে পৌছবে তারা! একসঙ্গে যেন দু'টো স্বর্গ হাতে পেয়ে গেল শোভনা। তিনকড়ির কথা এক পলকের জন্যে হঠাৎ কেন যেন মনে হল তার। স্ফুলিঙ্গের দ্যুতি মাত্র সেটা, জ্বলে উঠেই দপ্‌ ক'রে নিভে গেল নিমিষে।

বহু উর্ধ্ব থেকে ওই দেখা যায় কাশ্মীর, তুষারশুভ্র ওই পর্বতমালা। পশ্চিম-আকাশে সূর্য অস্তমিত হবার সময় আগতপ্রায়। অস্তমান সূর্যের মুমূর্ষু দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তুষার। পলকে পলকে রং-বদলাচ্ছে ওই নারায়ণশিলার আর গোবর্ধনগিরির। বাইরে এই বিচিত্র রং-বদলের মিছিল দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে শোভনা। নিশ্চল দু'টো পাথুরে চোখ দিয়ে সে অপলক চেয়ে চেয়ে দেখছে যেন নিসর্গের ম্যাজিক। তাদের উড়োজাহাজের ভিতরেও যে সব সাদা রং পাল্‌টে ঘন সবুজ হয়ে গেছে, তা শোভনা দেখার অবকাশ

পায়নি। যখন ভিতরের দিকে চোখ ফেরাল তখন নতুন বিস্ময়ে সে পাথর হয়ে গেল। সব আব্রু খসে গেছে, সব আবরণ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে যেন। ভয়ংকর দিবাস্বপ্নের মত বীভৎস বলে মনে হত লাগল তার। বাইরের ওই স্বর্গীয় সুষমাও তার চোখে এখন কুৎসিত হয়ে এল। সবাই উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তি নিশ্চল হয়ে বসে আছে, সে শ্যামল।

মরুভূমিতে মরীচিকাও আছে, মরূদ্যানও আছে। এই ধূসর গোধূলির আকাশে হঠাৎ শ্যামলের দিকে চেয়ে তাই মনে হল শোভনার। সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে, একেবারেই দলছাড়া হয়ে পড়েছে সে। হঠাৎ শ্যামলের চোখে চোখ পড়তেই শ্যামল চোখ নামিয়ে নিল।

তারা নামছে। তাদের বিমান পাক খাচ্ছে অনেকটা জায়গা নিয়ে—নীচে ওই কাশ্মীর-ভ্যালী, সবুজের শোভাযাত্রা। স্বর্গ, সত্যই স্বর্গ এটা। তার পুঁথির বিদ্যা মিথ্যা—চোখে সে যা দেখছে, কোনো বই তার বর্ণনা দিতে পারেনি। এই সৌন্দর্য ভাষায় ধরতে না পেরে একে ভূস্বর্গ বলেই দায়-খালাস হয়ে গেছে তারা।

উরি বারমুল্লা লাডাখ—সব রণাঙ্গন থেকে সৈনিকরা এসে মিলিত হয়েছে শ্রীনগরে। এদের চোখেমুখে বীরত্বের আর শৌর্যের প্রতিচ্ছায়া সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শোভনা। শোভনার মনে হল তাদের ছবির জন্যে এদেরকেই বুঝি দরকার। এদের পেলে পৃথ্বিরাজের প্রতিশ্রুত সাকসেস্ সত্যি হয়তো অনিবার্য হবে। কিন্তু এদের পাবে কী ক'রে তারা? যারা সত্যিকারের কাজ করে, তারা অভিনয় করবে কেন?

তারার চেহারা আরো বদ্‌লে গেছে। অহল্যার সঙ্গে তার ভারি রেষারেষি। এরা দু'জন গাইবে—কৌশল্যা মেনকা আর শান্তা নাকি নাচবে। এরা ছাড়া নাচের মেয়ে আরো জনকতক আনা হয়েছে অবশ্য সঙ্গে। শোভনা এ-দলে একেবারেই ফালতু।

দিন তিনেক তারা ছিল কাশ্মীরে। এই তিন দিন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে শোভনার জীবনে। সে নিজের জীবনকে সার্থকও জ্ঞান করেছে যেমন, নিরর্থকও ভেবেছে তেমনি। সব ভেস্তে গেল, সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল তার। ভোর রাত্রের অ্যালার্ম-ঘণ্টাধ্বনি শুনলে তার বুকের ভিতরটা যেমন কেঁপে উঠত তেমনি একটানা কাঁপনে কেঁপে চলেছে তার বুক। সিপাই-ভাইদের আনন্দ-পরিবেষণ তবে কি শুধুমাত্র অছিলা? এর পিছনে তবে কি সত্যিই এমনি একটা উচ্ছৃঙ্খল প্ল্যান ছকা ছিল। আসার সময় প্লেনের মধ্যে যে বীভৎসতা সে দেখেছে সেটা মহড়া মাত্র। এই ভূ-স্বর্গের মাটিতে নেমে তার আসল অভিনয় করে গেল এরা। একটা নরক রচনা করে গেল কি না, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না শোভনা। বাহির জগতের যে প্রবল আকর্ষণে সে ঘরছাড়া হয়েছে, সে-জগৎ তবে কি এতই অদ্ভুত? বিশ্বাস হয় না শোভনার। সোনার শরীরের নীচে কুৎসিত কঙ্কাল অবশ্য আছে, কিন্তু পৃথিবীটা কঙ্কালেই ভরা কি না, এটা ভাববার কথা। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল শোভনা। বাবার কথা মনে হ'ল তার। তিনি হয়তো তাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বড় বিব্রত ঠেকতে লাগল তার নিজেকে। যত দূরে সে এসে পড়েছে, এখান থেকে হয়তো আর ফেরা চলে না। জীবন সে শেষ ক'রে ফেলতেও যেন রাজি। না হয় ঝাঁপ দেবে উড়োজাহাজ থেকে।

তারা কারো কাছে ঘেঁষছে না। ওর অহংকার যেন বেড়ে গেছে। ওর মূল্যও যেন বেড়েছে অনেক।

মেনকা এসে বলল, বড় গম্ভীর যে, ব্যাপার কি? ক'দিন বা বাঁচবে, একটু আনন্দ করে নিলে ক্ষতি কি ছিল?

ক্ষতি আর কি, কিছু না। মেনকার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে উঠে গেল। উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াতেই দেখল শ্যামল সামনের বাগিচায় ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। লোকটাকে বড় অসহায় বলে

মনে হল শোভনার। ওর জীবনে কোনো দুর্ঘটনা আছে কি না, শোভনা জানে না। কিন্তু তার নিজের জীবন যে দুর্ঘটনার একটা লম্বা মিছিল, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

শ্রীনগর থেকে যখন তারা আকাশপথে উড্ডীন হল, তখন দুপুর বেজে গেছে। দিল্লি হয়ে তারা বোম্বাই ফিরে যাবে। সিপাহীদের তারা দেখে ও দেখিয়ে গেল, এবার বোম্বাই গিয়ে তাদের বিদ্রোহ শুরু হবে।

নীচে পড়ে রইল কাশ্মীর। তারা ভূস্বর্গ ছেড়ে আকাশে উঠে এসেছে। আসার সময় যাকে স্বর্গ বলে বোধ হয়েছিল, ফেরার পথে তা যেন অন্যরকমের মনে হচ্ছে। নীচে একটা নরককুণ্ড যেন পড়ে। ওখানে নারকীয় উল্লাসের একটা তীর্থ রচনা করে এসেছে তাদের পার্টি।

আকাশ মেঘে ভরে উঠছে, মৌশুমী হাওয়া পশ্চিমঘাট ডিঙিয়ে উত্তর ভূখণ্ডে দৌড়ে এসেছে। এ তারি সংকেত। মেঘে পরোয়া কি তাদের? মেঘপাহাড়ের শিখরের অনেক উঁচু দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে যাবে তারা। ঠিক তাই। গোঁও শব্দ করে তাদের প্লেন অনেক উঁচুতে উঠে গেল। তাদের পায়ের নীচে পড়ে রইল মেঘের দলেরা। এই উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়লে পৃথিবীতে পৌছবার আগেই শূন্যে মিলিয়ে যেতে হবে শোভনাকে। পৃথিবীর অগণিত জনতা থেকে তারা এখন বিচ্ছিন্ন—শূন্যের মহাসাগরে তারা যেন দাঁড় টেনে চলেছে নির্বিবাদে।

দিল্লি সন্নিকট। তাদের প্লেন নামার জন্য তৈরি হল। ঘন মেঘের স্তরে নেমে আসতে হল তাদের। উপর থেকে যা মনে হচ্ছিল জমাট পাথরের মত নিরেট, এখন তার মধ্যে ঢুকে সে মেঘ হয়ে গেল কুয়াশার মত পাৎলা। দিল্লি আর বেশি নীচে নয়। কিন্তু অনেকটা নেমে আসা সত্ত্বেও নীচের মাটির জগৎ তারা দেখতে পেল না। মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। ঝাপসা হয়ে গেল সারা পৃথিবীটা। বেতারে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ নাকি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে নামা নাকি দুরূহ। বেশ নীচে নামতেও ভরসা পাওয়া যাচ্ছে

না, অন্ধ চামচিকার মত মেঘ ভ্রমে কোন্ পাহাড়ে গিয়ে আঘাত করতে হবে তাহলে কে জানে।

সুতরাং নামবার একটা ঘাঁটির সন্ধানে আম্বালা অভিমুখে ধাওয়া করলো তাদের প্লেন—উল্কার মতো বেগে। বিপদে তারা যে পড়েছে, তা সবার মুখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কাশ্মীরের সমস্ত আনন্দ আর উল্লাস যে কোনো মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্কেও তেল নাকি পর্যাপ্ত নেই। যে-কোনো জায়গায় তাদের অবিলম্বে নেমে পড়া নাকি দরকার। বিপদের সংকেত নাকি ছাড়া হয়ে গেছে দিকে দিকে। মাটির দেশ থেকে শূন্যের এই মহাসমুদ্রে সে সংকেতের সাড়া নাকি এসেছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প ভুলে গেল শোভনা। মাটির দেশ থেকে সাড়া যদি এসেই থাকে, তাহলেই বা তাতে লাভ কী? এই শূন্যে এসে তাদের লুফে নেবে কে?

আশা ছিল আম্বালায় নামা যাবে। কিন্তু এখানের আকাশও দিল্লির আকাশের মতই মেঘে ছাওয়া। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের নিঃশব্দ আর্তনাদ বেজে উঠল। তারার মুখ বিবর্ণ, কৌশল্যা ছটফট করছে, মেনকা আর শান্তা শক্ত করে দু'জন দু'জনকে ধরে বসে আছে, নাচের মেয়েরা প্লেনের দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যেন প্রস্তুত। পৃথ্বিরাজ অর্থহীন অভয় দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। একা শ্যামল স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, তার মুখে আতঙ্ক ভয় ভাবনা কিছুরই ছায়া নেই।

তেল শুকিয়ে এসেছে। তারা ছুটল লুধিয়ানার দিকে। এখানে আকাশ নিশ্চয় পরিষ্কার পাওয়া যাবে, অবশ্য ততক্ষণ যদি তেলে কুলোয়। বিকট শব্দ করে ঈগলের মত ডানা বিস্তার করে মেঘের মহাসমুদ্র মন্থন করতে করতে তারা চলল। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হল তাদের। এ আকাশও মেঘের কজ্জলে মাখা।

এবার শেষ চেষ্টা, মরীয়া বিক্রমে তারা এবার কোন দিকে চলল তারা জানে না। খানিকটা যেতেই মেঘের শেষ পেল তারা। নীচে জেগে উঠল

একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। সবাই আঁট হয়ে বসল। এখানে বেপরোয়া হয়ে নেমে পড়তে হবে। ঝাঁকি খেয়ে আগুন জ্বলে ওঠার মত পেট্রল হয়তো নেই—এইটুকু বাঁচোয়া। অনেকটা নেমে এল তারা। সারা প্রান্তরে বিন্দু বিন্দু কিসের যেন দাগ দেখা যাচ্ছে। এটা একটা পরিত্যক্ত বিমানঘাটিই বটে—যুদ্ধের সময় হয়তো ব্যবহৃত হয়েছিল। আরো একটু নেমে আসতেই দেখা গেল সারা মাঠে ছড়িয়ে আছে অজস্র গোরু আর মহিষ। এটা চারণভূমি হয়েছে তাহলে। এদের পিঠের উপর নেমে পড়া তো যায় না। পাংশু হয়ে গেল সবার মুখে। হাহাকার করে উঠল শোভনার বুকের ভেতরটা। এই চারণভূমিটা দেখে তার নিজের ঘরের কথা মনে পড়ে গেল। কানের মধ্যে বেজে উঠল অ্যালার্ম-ঘণ্টা।

জলন্ধরের দিকে এবার তারা চলল। মাঝপথে যদি ছিন্ন-ডানা পাখির মত ধুপ করে খসে পড়তে হয়, তবে তাই পড়তে হবে। কান্নার রোল উঠল প্লেন ভরে। শূন্যে পরীরা কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছে বুঝি। কিন্তু কারো কান্নাই পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌছচ্ছে না।

একটি আশ্রয়, একটা বন্দর—কোথায় তা পাওয়া যাবে এখন। শোভনা এতক্ষণে নড়ে বসল। উঠে গিয়ে শ্যামলের ত্বটো হাত চেপে ধরলো সে —যেন একটা আশ্রয় আর একটু ভরসার ভিখারী সে।

চমকে উঠল শ্যামল। তার মুখ থেকে মৃত্যু যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল, নতুন জীবন নেমে এল তার সর্বাঙ্গে। মাটির পৃথিবীতে এ ঘটনা ঘটলে শ্যামল কি জবাব দিত, বলা শক্ত। কিন্তু কিছু একটা জবাব হয়তো দিত। কিন্তু এখন সে নিষ্প্রাণ চোখে একবার মাত্র তাকাল তার দিকে। তার মনে হল, সে ধন্য হয়ে গেল। জীবনের শেষ মুহূর্তটি চরিতার্থ হয়ে গেল তার।

তারা নাকি মাটি পেয়ে গেছে। নেমে পড়েছে নাকি তারা। এই মাত্র যে ঝাঁকিটা তাদের কাঁপিয়ে দিল, সেটা নাকি মাটিরই স্পর্শ। জলন্ধর।

সব অভিজ্ঞতা হয়ে গেল শোভনার। আকাশ সে দেখেছে, বাতাস সে মেখেছে সর্বাঙ্গে, মৃত্যুকেও চেখে দেখা গেল।

শ্যামল আহ্লাদে গদগদ হয়ে পাশে এসে দাঁড়াল শোভনার। শোভনা আড়চোখে তাকে দেখল।

চাউনিটা তো ভালো না। শ্যামল বলল, তখন কিছু বলতে পারিনি। এখন একটা কথা বলতে চাই।

—আর কোনো কথার দরকার নেই।

চমকে উঠে শ্যামল বলল, তার মানে? প্লেনের কথা ভুলে গেলে?

—ভুলি নি।

—তবে?

—ওটা অ্যাকসিডেণ্ট। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছি।

শ্যামল কিছুই ধরতে পারল না। হৃদয়হীন মরুভূমির মাঝে যাকে সে মরূদ্যান বলে মনে করেছিল, নিমেষে সে মরীচিকা হয়ে দাঁড়াল কেন এই যেন তার জিজ্ঞাসা।

পাশাপাশি দুটো মোষের পেটের নীচে দুটো মাথা। নীচের বালতিতে সাদা সাদা টানা রেখায় চোঁ-চোঁ শব্দে দুধ পড়ছে। তিনকড়ি কড়া চোখে নজর রাখছে। নাকু আর হরবিলাস বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত নিয়মিত কাজ করে চলেছে। পরিমাপ মত জল আর ভেজাল দিতে কসুর নেই তাদের। এমন সময় একটা নতুন শব্দ শুনতে পেল তিনকড়ি—এটা তো অ্যালার্ম-ঘড়ির শব্দ নয়। তার দরজায় মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল কেন এই অসময়ে।

তিনকড়ি বাথান থেকে বেরিয়ে এল। গাড়ি থেকে নামল কে? গ্যাসের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল—শোভনা।

শোভনা বলল, মার্জনা চাইব না। ক্ষমা ক'রো না।

রুখে উঠল তিনকড়ি, তবে ফিরে আসার মানে?

—তোমার কাজে যদি লাগতে পারি, এই আশা।

ফানুস

ঘরের আলো প্রসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বারান্দার পেরেকে তাই আয়নাটা লটকে নিলো বন্দনা।

আজ তার জীবনে নতুন অভিযান। উল্লাসে রোমাঞ্চ হচ্ছে, আবার আতঙ্কে শরীর হিম হয়েও আসছে। এই নতুন জগতের আদব-কায়দাও তার জানা নেই, না থাক।

মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিলো। শাড়ির ছেঁড়া দিকটা গুটিয়ে নিয়েছে কুঁচির মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে ভালো ক'রে দেখতে লাগল বন্দনা। ওই আয়নায় যার ছায়া সে আজ এখন দেখছে, সে যেন নতুন মানুষ, তার মুখে যেন নতুন মায়া।

'এত সকালে যাচ্ছিস কোথায়?' ঘরের ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন। অনেকক্ষণ থেকে বলি-বলি করে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করতে পারলেন তিনি।

জবাব দিল না বন্দনা। তার কানে যেন কথাটা পৌছয়ই নি। না পৌছবারই কথা। তার কানের মধ্যে ভন্‌-ভন্‌ আওয়াজ বেজে চলেছে একটানা। সেই বিকট আর ভয়ংকর শব্দ ভেদ করে কারও গলার স্বর কানে পৌছন সম্ভব নয়।

রাণা এখনো ঘুমচ্ছে, এইটুকু বাঁচোয়া। তা না হলে সে হাজার রকমের প্রশ্ন শুরু করে দিত এতক্ষণ। মায়ের কথায় জবাব না দিলেও চলে, কিন্তু রাণার কথার জবাব না দিলে নিস্তার নেই। আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বন্দনা ঘরের ভেতরে তাকাল। বাবা চৌকির উপর উঠে বসেছেন। মায়ের গলার আওয়াজ পেয়েই হয়তো তাঁর ঘুম

ভেঙে গেছে। বন্দনা তাড়াতাড়ি সাজগোছ শেষ করতে লাগল। বাবা কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে বসলে একটা-না-একটা জবাব দিতেই হবে।

'কে, যাচ্ছে কে?' বাবা প্রশ্ন করলেন মাকে : 'রাণা, না, রাণু?'

মা জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। রাণু যাচ্ছে কোথায় তা নিয়ে তাঁদের এত মাথা ঘামানো কেন? সে কোথায় না যায়! সব সময়ই সে যাচ্ছে-আসছে। আজ অপরাধের মধ্যে এই যে, সে একটু ভোরে বেরুচ্ছে। কাজ যদি ভোরেই থাকে, তা হলেও কি দুপুরে বেরুতে হবে তাকে।

সাড়া না পেয়ে বিছানা হাতড়ে দেখতে লাগলেন বাবা। না, এই তো রাণা শুয়ে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চোখ দুটো যাওয়া ইস্তক সংসারটাও উচ্ছন্নের দিকে বয়ে চলেছে, মেয়েটাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। শাসনেরও দাম কমে গেছে এখন। তার ভারও নেই, তার ধারও নেই। জীবন যে এমনভাবে ভোঁতা হয়ে যাবে, জীবনে যে এমন বেকুব সেজে বসে থাকতে হবে—পাঁচ বছর আগেও ভাবেন নি মহেন্দ্রপ্রতাপ।

ঘড়িও নেই একটা, সময় কত হল তাও জানা যাচ্ছে না। রাণু জামার বুকে সেপটিপিন আঁটলো। পায়ের কাছে সায়ার কিনার দিয়ে সুতোর আঁশ ঝুলছে—সেগুলো টেনে টেনে ছিড়ে ফেললো। কাঁধের কাছে বডিসের স্ট্র্যাপ বেরিয়ে পড়েছে—আঙুল দিয়ে সেটা জামার নীচে ঠেলে দিলো। এবার সে তৈরি—একেবারে ধোপদুরস্ত, একেবারে ফিটফাট। তার এই বাহ্যিক মুর্তিটার নীচে সে তার সব দীনতাকে ঢেকে রাখতে পেরেছে বলে তার ধারণা। কিন্তু না, চোখের নীচে চামড়া কেমন কুঁকড়ে আছে, মুখের উপর কেমন-যেন হলদে আভা।

'মা, আসি। বাবা, চললেম।' বন্দনা দু'জনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। দরজার পাশ থেকে ছোট সুটকেসটা নিয়ে নিল।

'কোথায় চললি রাণু?'

'চাকরি।' রাণু রাণার মাথায় হাত বুলিয়েই চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলল, 'দিন তিনেক পরে ফিরব।'

বাইরে মোটরের হর্ন বাজলো। তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল বন্দনা।

নীচতলায় হরিপদ গালে-মুখে সাবানের ফেনা মেখে বসে আছে। স্ত্রীকে বলল, 'ব্যাপার কি?'

বিমলা মুখ বিকৃত করে জানাল, সে জানে না। বন্দনাকে সামনে পেয়ে বলল, 'এত সকালে? চললে কোথায়?'

বন্দনা সহজ গলায় বলল, 'উড়তে।'

বাইরে ঝক্‌ঝকে লম্বা একটা বাস্‌ দাঁড়িয়ে—দরজা-জানালা কাচময়। ভোরের আলোয় জৌলুষ যেন আরো বেড়েছে। বিমলা উঁকি দিয়ে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। হরিপদ একগালে ক্ষুর ঘসে থ হয়ে বসে ছিল। বিমলা ফিরে এলে বললো, 'কি, জবাব দিল কি তোমার কথার।'

'বললো—উড়তে যাচ্ছে।'

'হুঁ।' হরিপদ দ্বিতীয় গালে ক্ষুর চালাতে লাগলো।

দাড়ি কামাতে কামাতে হরিপদ বলল, 'ও মেয়ে গেছে, গোল্লায় গেছে। উড়তে আরম্ভ করেছে কি আজ? অন্ধ বাপ, গোবেচারী মা, নাবালক ভাই। মাথার উপর কেউ বলতে কেউ নেই—ওকে রুখবে কে?'

বিমলা সায় দিয়ে বলল, 'বাইরে 'বেরুবার নাম শুনলে আমাদের বুক কাঁপে, ও কেমন বেপরোয়া। মেয়েমানুষের মতনই না। চেহারাটা আছে তাই তরে যাচ্ছে।'

হরিপদ কদর্য ইঙ্গিত করে বলল, 'আসল জিনিসই তো তবে আছে।'

বিমলা চুপ করে গেল। হরিপদ মুখ বিকট ফাঁক করে হাঁয়ের দু'পাশে ক্ষুর টানছিল, বিমলা বলল, 'তোমার চোখ বটে, ঘর ছেড়ে বাইরে দৃষ্টি।'

এদিকে ঈর্ষার তুষ জ্বলতে লাগল। উপরে তখন স্তব্ধতা। বন্দনার মা ও বাবা চুপচাপ বসে ভাবছেন তাঁদের ভবিষ্যতের কথা আর তাঁদের মেয়ের বর্তমানের কথা। রাণা অকাতরে ঘুমুচ্ছে।—তার দিদি মস্ত একটা গাড়িতে চেপে কোথায় যে চলে গেল তা সে জানে না।

আজ পাঁচ বছর, মহেন্দ্রপ্রতাপের অন্ধকার জীবনের আজ পাঁচ বছর। তের বছরের বন্দনাকে শেষ দেখা দেখেছেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। সে আজ পাঁচ বছরে কত বড় আর কত সুন্দর হয়েছে—তা তিনি জানেন না। জানতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু জানা হয়ে ওঠে না। মেয়েকে হাতের কাছে পান না তিনি। কী ক'রে বেড়াচ্ছে তাঁর মেয়ে, তা জিজ্ঞাসাই-বা করেন কী করে। বছর তিন হল সংসার চালাচ্ছে এই মেয়েই। কিছু-না-কিছু সে করে। তাঁর মেয়ে অন্যায় যে কিছু করে না, এ বিশ্বাস কেন-যেন তাঁর আছে।

রাস্তা থেকে তাঁদের দোতালার এই ঘর পনর ফুট উঁচু হবে। এই উঁচুটাই অনেক উঁচু বলে তাদের মনে হয়, অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙতে হয় এই উঁচুতে উঠতে। কিন্তু বন্দনা এখন দোতালা থেকে নেমে কোথায় গেল, এ প্রশ্ন মনে একটু খোঁচা যেন দেয়।

বিমলা উপরে উঠে এসেছে, 'মেয়ে কোথায় গেল দিদি?'

'কাজে।'

'নতুন চাকরি বুঝি!'

বন্দনার মা বললেন, 'হবে।'

'মাইনেও বুঝি মোটা?'—এ প্রশ্নের মধ্যে একটু-যেন চিমটি আছে।

'মোটা মাইনের চাকরি আমার মেয়ে পাবে কোথায়?'

বিমলা বলল, 'না, চটপটে মেয়ে, চালাক-চতুর।'

মহেন্দ্রপ্রতাপ চোখ বুজে বসে ছিলেন, বললেন, 'কে, কথা বলে কে?'

'নীচের ভাড়াটে।'

বিমলা নামতে নামতে বলল, 'গাড়িটা খাসা, মাইনে ভালোই হবে মনে হয়। যাক, দিন ফিরলেই হল।'

বিমলা ধীরে ধীরে নামছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দনারা হাউই-এর মত বেগে মেঘ ফুঁড়ে উঠে যাচ্ছে উপরে। পাঁচ হাজার, ছয় হাজার, এবার সাত হাজার ফুট। এখান থেকে পৃথিবী দেখা যায় না। পায়ের নীচে ঘন মেঘের স্তর।

নতুন জীবন, নতুন রোমাঞ্চ, নতুন অভিজ্ঞতা। বন্দনার সারা শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জারদের কারো কোনো রকম অসুবিধে হচ্ছে কি না, কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে তাকে। পৃথিবীতে এখন যে তাপ তার চেয়ে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কম তাপ এখানে। তাই শীত লাগছে তারও। কিন্তু নিজের শীতের দিকে মন দেবার অবকাশ তার নেই। যাদের শীত লাগছে, তাদের সে র‍্যাগ টেনে নিতে বলছে। মস্ত এরোপ্লেন—অনেকটা লম্বা। হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছে বন্দনা। হাঁটছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকবার সে পা ফেলছে সন্তর্পণে। তার মনে হচ্ছে—তার পায়ের নীচটা বুঝি ফাঁকা, বিরাট একটা শূন্য বুঝি তার পায়েরই নীচে। সাত হাজার ফুট। জলভরা একটা মেঘের মহাসমুদ্র অতিক্রম করে চলেছে তারা। তাদের নীচের ওই মেঘ চুয়ে পৃথিবীতে নাকি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এখন। ওই বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই নাকি তাদের উড়োজাহাজ এতটা ফাঁকায় উঠে এসেছে। বিকট আওয়াজ করতে করতে সারা আকাশকে উচ্চকিত করে চলেছে যেন একটা ভয়ংকর ঈগল। বন্দনার শীত করছিল। পাৎলা জামা আর কাপড় ভেদ করে হিম তার হাড়ে গিয়ে ঘা দিচ্ছে। তবুও মুখে প্রসন্ন হাসি টেনে এনে সে প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না।

মেঘের এই মহাসমুদ্রটা পাড়ি দিতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত। তার পর তাদের জাহাজ নিশ্চয় দুই-এক হাজার ফুট নীচে নামবে।

সামনের সীট্এ বলিষ্ঠ একজন প্যাসেঞ্জার একটু-যেন অস্বস্তি বোধ করছে। ওভারকোটে কান পর্যন্ত ঢেকে মুখের উপর টুপি চাপা দিয়ে মাথা চিৎ ক'রে বসে আছে। মাঝে মাঝে টুপির পাশ দিয়ে এক চোখে তাকাচ্ছে বন্দনার দিকে। বন্দনা তার কাছে গিয়ে মুখস্ত বুলি আউড়ে এলো, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? নাগপুরে পৌছতে আর দেড় ঘণ্টা বাকি। এখন আমরা ছ হাজারের সামান্য বেশি উপরে আছি।'

লোকটা হাসলো। বন্দনার অপ্রতিভ হবার কথা। কিন্তু হাসির জবাবে সে হেসে বলল, 'আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা পাঁচ হাজারে পৌছব।'

লোকটা ইংরেজীতে বলল, 'তোমার শীতবোধ হচ্ছে না?'

'সামান্য।' হেসে জবাব দিল বন্দনা।

লোকটা হাতের কাছের জানালা সামান্য ফাঁক করতেই ফুরফুর ক'রে বাতাস ঢুকলো প্লেনে। বন্দনা কাচের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিল, মেঘ কেটে গেছে।

পায়ের নীচের পৃথিবীটা বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে নিশ্চয়ই। ওই পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে যদি চলে যায় এই এরোপ্লেন, ওই পৃথিবীর মায়ার অতীত হয়ে যেতে পারে যদি তারা, তাহলে পৃথিবীর বাবা ও মা, পৃথিবীর ভাই আর বোন, পৃথিবীর রাণা—সবার কাছ থেকে একদম মুক্ত হয়ে যেতে পারে হয়তো এক নিমেষে।

লোকটা ইশারায় বন্দনাকে কাছে ডাকল। বন্দনা ত্রস্ত হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটা বলল, 'তোমার নাম?'

বন্দনা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে মুখস্ত বুলি আওড়াল, ইংরেজীতে বলল, 'কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'ওন্‌লি টেল মি ইয়োর নেম্।'

'এয়ার হোস্টেস্।'

লোকটা বন্দনার শ্লেষ হজম করে বলল, 'ওটা তো নাম নয়, ওটা অকুপেশন। আমি নাম বাংলাতে বলছি।'

বন্দনা সরে এল।

মুখের উপর থেকে টুপিটা কোলে নিয়ে লোকটা সোজা হয়ে বসে বলল, 'কত ফুটে আছি?'

পাইলটের কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এসে বন্দনা দূর থেকেই বলল, 'তিন হাজার।'

মেশিনের প্রচণ্ড শব্দে হয়তো শোনা গেল না। লোকটা হাত দিয়ে কান আড়াল করে, চোখের ইশারায় বলল, 'কত?'

বন্দনা তিনটি আঙুল দেখাল।

বন্দনাকে কি খুব বেয়াড়া আর বীভৎস দেখাচ্ছে? উড়োজাহাজের এই চাকচিক্যের মধ্যে তাকে কি সত্যিই বেমানান দেখাচ্ছে? ওরা প্রায় সবাই তার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে কেন, ভেবে পাচ্ছে না বন্দনা। বিশেষ করে ওই লোকটা বড় বেশি করে তাকাচ্ছে তার দিকে।

একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল প্লেন, বন্দনা টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা এবার নামছি। বেল্ট ক'ষে নিন্ আপনারা। ভীষণ বৃষ্টি গেছে, গ্রাউণ্ডটা বিশেষ ভালো পাব না আমরা। ল্যাণ্ড করার সময় একটু-আধটু অসুবিধে হতে পারে।'

বন্দনার কথা শুনে প্যাসঞ্জারদের মধ্যে অনেকেরই মুখ কেমন পাংশু হয়ে উঠল। একজন বৃদ্ধ যাত্রী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বলল, 'এনি ডেন্‌জার?'

বন্দনা হেসে উঠল, সাহস দিয়ে বলল, 'না, ভয়ের কিছু নেই, বিপদের সম্ভাবনাও নেই। গ্রাউণ্ড একটু স্লিপারি আছে কিনা।' —বন্দনা তাঁর কোমরের বেল্ট এঁটে দিতে লাগল।

সেই লোকটা বন্দনাকে ইশারায় ডাকল। বন্দনা যেতেই বলল, সে নাকি বেল্ট কষতে পারছে না। তাতে কি, সে এয়ার হোস্টেস—

এটুকু সাহায্য সে নিশ্চয়ই করবে। বন্দনা ঝুঁকে পড়ে তার কোমরে বেল্ট আঁটতে লাগল। রাক্ষুসে দুটো চোখ দিয়ে লোকটা বন্দনার মাংসল শরীরটা যেন গিলতে চায়। ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগল লোকটা, এঞ্জিনের শব্দে শোনা গেল না। কিন্তু বন্দনা তার কর্তব্য কি তা যেন অনুমান করতে পেরেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাই বলল, 'দেখা যাক্।'

নীচে ওই মাঠ। নিবিড় অরণ্যের মাঝখানে একটু বড় একটা হ্রদের মত দেখাচ্ছে ওই বিমান-ঘাটিটা। পৃথিবী এমন বনে বনময় গাছপালায় ছাওয়া আজ যেন নতুন জানল বন্দনা। তার এই আকাশপর্যটন তার কাছে সার্থক মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই পরিতৃপ্তির মাঝখানে কোন্‌খানে যেন একটা নোংরা গ্লানি দেখতে পাচ্ছে সে। ওই লোকটার রাক্ষুসে চোখ দুটো এখনো তার দিকে বিকটভাবে চেয়ে আছে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বন্দনা। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে সে বৃদ্ধ লোকটির গায়ের উপর ছিটকে পড়ল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাড়াল সে। কাঁধের কাপড়টা পড়ে গিয়েছিল, চট্‌পট্ তুলে নিল। সামনের লোকটা উঁচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে বীভৎস চোখে তাকিয়ে আছে।

নাগপুর। এখানে আপাততো তার যাত্রা শেষ। এইটুকুই যেন তার কাছে আশ্বাস বলে ঠেকল।

সবাই নামবার পর বন্দনা নেমে এল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সেই লোকটা, বন্দনাকে যেন অভ্যর্থনা করতে এসেছে এইভাবে সে তাকে হাতের ইশারায় নামতে বলল।

আজ তিন বছর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্দনা। ভাগ্য-অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে শুধু। রাণাটা যদি রাণু হত, অর্থাৎ রাণু যদি ছেলে হত, তাহলে তাদের নাকি ভাবতে হত না এত। বাপ-মায়ের এই আক্ষেপের

অবসান ঘটাবার জন্যে রাণু কঠিন সংকল্প নিয়ে বার হয়েছে রাস্তায়। তিন বছরের পর্দাহীন জীবনে ছোটখাট বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে, কিন্তু আজকের এই বিপদটা তার কাছে ভয়াবহ ঠেকছে। লোকটা চায় কি?

'কিছু নয়, কেবল নামটা জানতে চাই।'

বন্দনা বললো, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম পরে বলব। জুলুম করেন তো আগেও বলতে পারি।'

'তবে জুলুমই করলাম।'—বন্দনা হেসেই বলল।

লোকটা বলল, 'মিহির, মিহির পুরকায়স্থ।'

নামটা যেন শোনা-শোনা। হঠাৎ বলে ফেলল বন্দনা, 'আপনি বাঙালি?'

মিহির বলল, 'অবাঙালি নই। এবার আপনার নামটা?'

'বন্দনা।'

নাগপুরে ঘন্টাখানেক বিমানটা ছিল। তার পর বোম্বাই চলে গেল সেটা। বন্দনা দেখল, ওই বিরাটকায় প্লেনটা একটা আকাশ-স্বপ্নের মত উধাও হয়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। নাগপুরে আজ তাকে থাকতে হবে। কাল ফিরতি বিমানে সে ফিরবে।

কে এই লোকটা? বন্দনাকে নিছক ভাঁওতা দিয়ে গেল বুঝি ও অবাঙালি নই—এরকম বাঁকা করে কথা বলাই বুঝি ফ্যাশান! লোকটা যে পাজি এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ তার নেই। কিন্তু বন্দনার উপর কেন-যেন সদয় ব্যবহার করল খুব। যে একটা ঘণ্টা ছিল, সে-সময়টা বন্দনার হাঁড়ি-হেঁসেলের খবর জানবার জন্যে প্রশ্নের পর প্রশ্নই করেছে শুধু। বন্দনাও কিছু গোপন করে নি।

গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল বন্দনা। এরোপ্লেন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তবু সে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করতেই দেখল, পায়ের কাছে একটা কি?

মানি-ব্যাগ। অনেক টাকা যে, বিস্তর নোটে ঠাসা। চোখ তার অন্ধকার হয়ে এল, মাথা ঘুরে গেল। বোম্বেতে ফোন্ করবে সে? স্থির হয়ে বসে রইল বন্দনা।

ওদিকে বিমলা আবার উপরে উঠে এসেছে, বলছে, 'মেয়েকে অমন একলা ছেড়ে দিতে নেই, রাণার মা। পথ-ঘাট খারাপ, পাজি লোকজনের ভিড়। কখন কি অঘটন ঘটে বলা যায় কি? তাছাড়া কথাবার্তাও বড় খারাপ হয়েছে ওর ইদানীং। বলে, উড়তে চলেছি। অমন কথা মেয়েদের মুখে কি সাজে?'

রাণা বলল, 'দিদি কাজে গেছে। চাকরি করবে না বুঝি?'

'করবে বই-কি? তবু একটু চোখে-চোখে রাখা ভালো। আমাদের উনি তো আমার উপর কড়া পাহারা রেখেছেন—রাতদিন চোখে-চোখে।'

অন্ধ মহেন্দ্রপ্রতাপ স্তব্ধ হয়ে বসে উপদেশ শুনছিলেন।

রাণার মা বললেন, 'হয়তো তাই আজও ঠিক আছ তুমি।'

রাণা বলল, 'তোমরা ভারি হিংসুক কিন্তু। মস্ত গাড়ী চেপে দিদি গেছে, তাই বুঝি ভালো লাগছে না?'

বিমলা তেতে গেল, বলল, 'অমন গাড়ী অনেক দেখেছি রাণাবাবু, এবার তোমরা দেখ।' দুদ্দাড় করে নেমে গেল বিমলা।

দিন তিনেক পরে ফিরবে বলেছিল বন্দনা। কিন্তু পরদিনই সে ফিরে এল। গিয়েছিল একা, ফিরে এল দু জনে। বন্দনা আর মিহির।

এমন হৃষ্টপুষ্ট একটা লোকের সঙ্গে বন্দনাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে দেখে বিমলা দরজার আড়ালে চলে গেল। ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দেয়ালে টাঙানো হরিপদর ছবিটার দিকে সে একবার তাকাল মাত্র, তারপর উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল এদের।

মিহির উপরে উঠে সহজ ও স্বাভাবিক গলায় ডাকল, 'মহেন্দ্রবাবু।'

মহেন্দ্রপ্রতাপ ঝিমুচ্ছিলেন, চমকে বললেন, 'কে ?'

'আমি মিহির, মিহির পুরকায়স্থ—মৃগাঙ্কবাবুর ছেলে।'

মনিব-পুত্রের পদধূলি! আশ্চর্য হয়ে গেলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। ক্ষোভ তাপ রাগ অভিমান নিয়ে অন্ধ মহেন্দ্রপ্রতাপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আজ পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের মধ্যে একটা সংবাদ যারা নিল না, এতটুকু খেসারত যারা দিল না, তাদের আজ এই করুণার অর্থ ?

'দেখা করতে এলাম। কেমন আছেন।'

'যেমন দেখছ। ভালোই।'

রাণা ও রাণুর মা জড়সড় হয়ে বসে আছে। রাণু হাতের সুটকেসটা রেখে বাবার পাশে গিয়ে বসল। রাণার কাছে তার দিদি যেন একেবারে অচেনা ঠেকছে এখন, একদিনে তার দিদি যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'ফ্যাক্টরি কেমন চলছে ? সেখানেও দুর্ঘটনা ঘটল, আমার জীবনটাও—যাক্ গে, তুমি নাকি নতুন কি ব্যবসা করছ ?'

'একটা এয়ার-সার্ভিসের কাজে হাত দিয়েছি।'

'ভালো।'

'বাবা কেমন আছেন ?'

'ভালোই আছেন।'

পাঁচ বছর বাদে সাক্ষাৎ। এই পাঁচ বছরে মহেন্দ্রপ্রতাপের কী সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে তাই ভাবছিল মিহির। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখছে সে। একবার বন্দনার দিকেও সে তাকাল। এই দৈন্য নিয়েও এত অহংকার মেয়েটার। ভারি মানি-ব্যাগ ফেলে গিয়ে জালে জড়িয়ে ফেলতে গিয়েও পেরে উঠল না মিহির, এই হয়তো তার আক্ষেপ। বোম্বাইয়ে পৌঁছেই সে শুনল, নাগপুর থেকে ফোন্ এসেছিল। তাই ফিরতি বিমানে সেও চলে এল।

রাণা বাপের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'দিদিও এসেছে, বাবা।'

চম্‌কে উঠলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, বললেন, 'কই ?'

রাণু বাবার হাঁটুর উপর হাত দিয়ে বলল, 'এই যে।'

হাতে স্বর্গ ফিরে পাওয়ার মত আনন্দ হবার কথা, কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ আতঙ্কে যেন শুকিয়ে উঠতে লাগলেন।

মিহির বলল, 'আপনি কম্‌পেন্‌সেশন চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। খেসারত বাবদ আজ কিছু এনেছি, মহেন্দ্রবাবু।'

নাগপুরের সেই ব্যাগটা সে বা'র করছিল পকেট থেকে, মহেন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'আর দরকার হবে না, সে তামাদি হ'য়ে গেছে অনেক কাল আগে। আজ তুমি এস।'

মিহির উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তবে আজ চলি।'

বাইরে এক পা বাড়াতেই একটা কাল সাপ দেখে চম্‌কে উঠল যেন মিহির। একটা প্রকাণ্ড বেণী। বিমলা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের মধ্যের আলাপ-আলোচনা শুনছিল। মিহির ধীরে ধীরে নেমে গেল, একবার মাত্র ফিরে তাকাল বিমলার দিকে।

মিহিরের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র মহেন্দ্রপ্রতাপ আঁৎকে ওঠার মত শব্দ করে বললেন, 'সর্বনাশ। রাণু, রাণু কই রে ? ওর সঙ্গে যাস্‌নে রাণু, ও সাংঘাতিক, ও যে কী, তা জানিস্‌নে তোরা।'

রাণু বলল, 'জানি বাবা, তুমি মিথ্যে ভেব না।'

মহেন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'উড়োজাহাজে কাজ নিয়েছিস্‌ বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'মাইনেটা একটু মোটা।'

বিমলা এবার ঘরে এল। এক কোণে গিয়ে বসল সে। রাণুর দিকে বার বার সে তাকাতে লাগল।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। বন্দনা দুদিন বাড়িতে থাকে, দুদিন থাকে বাইরে। বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরও আসে মাঝে মাঝে। মেয়ে কাজে যাক, তাতে আপত্তি করার উপায় নেই মহেন্দ্রপ্রতাপের। কিন্তু মিহিরের আসায় তাঁর আপত্তি। আজ মিহির বদলে গিয়েছে কি না, তা তিনি জানেন না। কিন্তু তার স্বভাব এক কালে যে ভয়ংকর ছিল, এ কথা তাঁর জানা।

রাণু বলল, 'না বাবা, লোকটা যে পাজি, তা প্রথম দিন দেখেই টের পেয়েছি। তুমি ভেব না।'

'ভাবি কি অযথা! যেখানে ও ঢুকবে, সেখানে একটা-না-একটা অঘটন সে ঘটাবেই।'

বিমলা বলে, 'তোমার কাজটা কী ভাই? উড়োজাহাজে কিসের কাজ কর—ঝাড় পোঁছ?'

বন্দনা বলে, 'ওই গোছেরই। কেন, করবে তুমি?'

'মন্দ কি। ওতেই যদি মোটা টাকা পাওয়া যায়।'

বন্দনা মুচকে হাসে।

হরিপদ স্ত্রীকে শাসন করে বলে, 'অত উপরে যাতায়াত কেন? ও মেয়ে গোল্লায় গেছে, ওর সঙ্গে মেলা-মেশা আমি পছন্দ করিনে।'

বিমলা বলে, 'মানুষের সঙ্গে কথা কইব না?'

হরিপদ জবাব দেয় না। এক গোছা তাস নিয়ে চৌকির উপর ছড়িয়ে বসে কী যেন হিসেব করে, আর নিজের মনেই মাথা নেড়ে বলে, 'হল না।'

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে তাস থেকে মাথা তুলে মুচকি হেসে বলল, 'লোকটা বুঝি?'

বিমলা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

হরিপদ বলল, 'ভদ্দর পাড়ায় কী কাণ্ডটাই ঘটছে। কালই পুলিশে এজাহার দিতে হবে।'

সেই দিনই গভীর রাত্রে হরিপদ চীৎকার করে জেগে উঠল। দরজা খোলা। তীরবেগে সে বাইরে এল, তর তর করে উপরে উঠে গেল—কোথাও বিমলা নেই। তার বৌ গেল কোথায়? তা হলে নিশ্চয় বন্দনার সঙ্গে সে কোথাও গেছে। হরিপদ আবার উঠে এল উপরে। দরজার উপরে করাঘাত করল বেপরোয়া।

ঘরের আলো জ্বেলে বন্দনা দরজা ফাঁক করল, বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হল কি, এত হৈ চৈ করছেন কেন?'

হরিপদ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'বিমলাকে পাচ্ছিনে। কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সে।'

'তার মানে?'

'কিচ্ছু মানে বুঝতে পারছিনে আমি।'

বন্দনা বলল, 'যত সব পাগলামো আর আজব কথা। বাথরুম ভালো করে খুঁজুন গিয়ে।'

অসহায়ের মত হরিপদ বলল, 'খুঁজেছি।'

গভীর রাত্রি। বাইরে আল্‌কাৎরার মত গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের সঙ্গে নিস্তব্ধতাও যেন জমাট বেঁধে গেছে। সেই স্তব্ধতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট গোঙানি ক্রমে যেন কাছে সরে আসছে। কালো আকাশ চিরে হয়তো কোনো নিরুদ্দেশের দিকে ছুটে চলেছে একটা যান্ত্রিক পাখী।

'এত উঁচুতে উঠলে ভারি ভয় করে আমার।'

'ভয় কী, এই তো আমি আছি।'

মহাশূন্যের এই শব্দধ্বনি পৃথিবীতে এসে পৌছল না।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত

সারাদিন কোথায় কি করে বেড়ায়, কেউ জানে না। ফেরে অনেক রাত্রে। কোনোদিন বারোটায়, কোনো-কোনো দিন একটা-দুটোয়। ফিরে যখন আসে, তখন তাকে দেখতে এমন ভয়ানক আর ভীষণ লাগে যে, কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পায় না লবঙ্গ।

বাঁশের বাতা দিয়ে চৌকীর সমান উঁচু মাচান করা, আধখানা ঘর জুড়ে। দুই ছেলে আর তিন মেয়েকে নিয়ে লবঙ্গ শুয়ে থাকে। দাওয়ায় পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্র লাফ দিয়ে নেমে আসে। বালিশের তলা থেকে দেশলাই নিয়ে ক্রাস্ ক্রাস্ শব্দ করে কাঠি জ্বালায়। ডিবে ধরায়। ঝাঁপ সরিয়ে ভিতরে ঢোকে লক্ষ্মণ—ডিবের আলোতে বড় ভয়ঙ্কর দেখায় তাকে।

ভারি গলায় লক্ষ্মণ বলে, তোর বরাত আজ ভালো লবঙ্গ।—অনেক পেয়েছি। মেলা।

কাঁচা নোটের গাদি আলোর নীচে মেলে ধরে।

লবঙ্গর সত্যিই আহ্লাদ হয় কি না, বলা শক্ত। কিন্তু সে গদগদভাবে বলে, এত! কাঁচা বাড়িতে আর থাকা যায় না। পাকা দালান তোল।

লক্ষ্মণ হাসে, বলে, তুলব।

—আমার জন্যে বলছি নে। লবঙ্গ মাচানের দিকে তাকিয়ে বলে, ওদের জন্যে।

লক্ষ্মণ উঁচু হয়ে বসে গেল মেঝেয়, মেটে হাঁড়ির ঢাকা তুলে দেখল, ভাতে জল ঢালা আছে। নুনের পাত্র টেনে নিয়ে সে খেতে বসে গেল, বলল, তুই শু গে যা।

খাওয়া শেষ করে ফুঁ দিয়ে ডিবে নিভিয়ে দিল লক্ষ্মণ। সেও শুতে গেল। মাচান তার ভারে মচমচ শব্দ করে উঠতেই লক্ষ্মণ থামল, চেপে বসল, বলল,

একদিন নিশ্চয় ভেঙে পড়বে। দালান তোলার আগে এটা পালটে নে। বাঁশে তো ঘুণ ধ'রে গেছে।

অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে লবঙ্গ বলল, তোমার হাড়ে ঘুণ ধরেনি তো? খাটনি তো কম খাটছ না? দশ বছর ধ'রে দেখছি একটানা কাজ। সেই অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে যাওয়া, আর রাত নিশুতি হলে ফিরে আসা।

লোহার মত ভারি একটা আস্ত হাত লবঙ্গর গায়ের উপর দিয়ে লক্ষ্মণ শুয়ে পড়ল। কোনো কথা বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ঘুমলি নাকি? একটা মস্ত দাঁও মারার মতলবে আছি, যদি মিলে যায়, তা হলে এখানে আর থাকা না। হাওয়া হয়ে যাব।

—কোথায়?

—দূরে কোথাও। এখানে আমাদের নামে কত কেচ্ছা! কেচ্ছার বাইরে কোথাও চলে যাব।

লবঙ্গ নিশ্বাস ফেলল। লক্ষ্মণ বাইরে বাইরেই কাটায়, কিন্তু লবঙ্গর নামে যে কেচ্ছা আছে, আর পাঁচজনে যে তার নামে যা-তা বলে বেড়ায়—এ হুঁশ তাহলে আছে লক্ষ্মণের। নিজের অজানিতেই লবঙ্গ লক্ষ্মণের লোহার মত শক্ত লোমশ হাতের উপর হাত বুলাতে লাগল।

নিত্য এই নিশুতি রাতে লক্ষ্মণ এই ভাবে আসে, এইভাবে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে যায় লবঙ্গর সঙ্গে। যদি কখনো কোনোদিন মাঝরাতে কোনো ছেলে জেগে ওঠে, লক্ষ্মণ তখন বাতি জ্বালতে বলে, ডিবের আলোয় তাকে আদর করে। এই ভীষণ জীবটার দিকে চেয়ে থাকে তারই ছেলে, যেন সে দেখছে এক আগন্তুককে, এক অচেনা জীবকে, চোখে তার তেমনি বিস্ময়, তেমনি ভীতি মাখানো।

কট্‌কট্‌ করে হেসে ওঠে লক্ষ্মণ, বলে, শালা নিজের বাপকে চেনে না!

মাচানের উপর থেকে জবাব দেয় লবঙ্গ, বলে, দোষ কি ওর একার? কে চেনে? কে জানে? ওদের বাপকে চেনে কে?

লক্ষ্মণ তেমনি হেসে বলল, তুই তো চিনিস ?

—আমার চেনার দাম কি ? লবঙ্গ মাচান থেকে নেমে এল, বলল, তাতে কি আমার কোনো হিল্লে হল ? কেউ কি মিশল আমার সঙ্গে ?

লক্ষ্মণ গর্জন করে উঠল, বলল, আস্পর্ধা !

চমকে উঠল লবঙ্গ, লোকটা তার উপর রেগে গেল নাকি ? না, লক্ষ্মণ রেগেছে ওদের উপর, যারা লবঙ্গদের আলাদা করে রেখে দিয়েছে। বলল, আছিস কি না ক্যানেস্তা টিনের চালা-ঘরে, তাই কেউ গ্রাহ্য করে না। থাকতিস্ কোঠা-বাড়িতে তা হলেই পায়ে এসে মাথা কুটত। কেন, বলে কি ওরা, খুলে বল তো একবার।

—কিছু না।

লবঙ্গ রাগাতে সাহস করে না লক্ষ্মণকে, কখন কী যে করে বসবে রাগের মাথায়, তার কি ঠিক আছে কিছু ? চেহারাটা কী ভয়ংকর।

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে লক্ষ্মণ বলল, তোর বদনামের বাকিই-বা আর আছে কি ? সত্যি তুই আমার কে ? তোকে চুরি করে এনেছি, এইমাত্র। এক সঙ্গে আছি, পাঁচটা সন্তান দিয়েছি। দশ বছরে পাঁচটা, অনেকই তো হল ? কি বলিস ?

কিছু বলল না, মাথা নীচু করে বসে রইল লবঙ্গ। সত্যি, কি সম্পর্ক তার সঙ্গে লক্ষ্মণের ? লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলারই-বা আছে কি ? সে তো লক্ষ্মণের বিয়ে-করা বৌ নয়।

মাঝে মাঝে বড়লোক হয়ে যায় তারা, আবার রেস্ত ফুরিয়ে গেলেই নতুন রেস্ত না পাওয়া পর্যন্ত টানাটানিতে চলে সংসার। এখন অনটন চলেছে। মোটা একটা দাঁও-এর গল্প করেছিল সেদিন লক্ষ্মণ, তার কি হল লবঙ্গ জানতে চায় না। কিন্তু ছোটখাট একটা কিছু এর মধ্যে জুটে না গেলে বড় অসুবিধে। অন্ধকার ঘরে বাঁ-হাতের উপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে ছোট বাচ্ছাটাকে দুধ দিচ্ছিল আর ভাবছিল, সে কে, কোথা থেকে এসে পড়ল

এখানে! এসে পড়ল, আর ফিরে যেতে পারল না কেন? প্রথম প্রথম লক্ষ্মণের সে কী কড়া পাহারা! কী ভীষণ ভয় লাগত তখন এই লোকটাকে! যমদূতের মত মনে হত। চোখের দিকে তাকাতে পারত না। তার পর তার পেটে এল মালু। আটক পড়ে গেল লবঙ্গ। মালুর আজ নয় বছর বয়স হয়ে গেল। ঠিক বাপের মতই চোখ-দুটো হয়েছে তার।

দাওয়ায় পায়ের শব্দ। দুধ ছাড়িয়ে মাচান থেকে নেমে এল লবঙ্গ। ডিবে জ্বালল। লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকাল, তার চোখে কি যেন প্রশ্ন।

লক্ষ্মণ বলল, কিছু না। কিছু হল না। দেশের লোকদের কি হল, লবঙ্গ? সবাই হুশিয়ার হয়ে গেছে! আপিসে-আদালতে কী পাহারা।

মাচানের কোণে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, কি খেলি?

—ছিল কিছু।

—কি ছিল?

লবঙ্গ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুদ-টুদ। ওদের গাছ থেকে গোটা কয়েক ঢ্যাড়শ ছিঁড়ে এনেছিলাম। জ্বাল দিয়ে নিলাম একসঙ্গে।

—আর ওরা?

—ওরাও খেল।

লক্ষ্মণ মাথা নীচু করে বসে রইল অনেকক্ষণ। এই বিরাট মানুষটাকে এখন কত ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কত অসহায়। মনে হচ্ছে, সে যেন ধরা পড়ে আদালতে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল কি সব ভাবল। ডিবেটা নিভে এল ইতিমধ্যে—আপনা আপনিই। সেদিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ বলল, আমি থাকতেই এই? যদি না থাকি, তখন তুই কি করবি এতগুলো বাচ্চা নিয়ে? কি খাওয়াবি? কোথায় পাবি?

এমনি একটা ভীষণ আর ভয়ংকর জীবের হাতে যেদিন ধরা পড়ে গিয়েছে সে, সেদিন থেকে সব চিন্তা সে শেষ করে দিয়েছে। যার জীবন এমন জঘন্য

ও ঘৃণ্য, তার আবার ভবিষ্যৎ, তার আবার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা? লবঙ্গ বলল, সে সব ভাবি না। যা হবার হবে। এবার শুয়ে পড়। দুপুরে খেয়েছ কিছু?

—বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি এক-এক সময়। কিন্তু ঠাণ্ডা করি নিজেকে। লক্ষ্মণ শুয়ে পড়ল।

পাশে গিয়ে শুতে শুতে লবঙ্গ বলল, সেই-যে মোটা একটা কিসের কথা বলছিলে সেদিন।

—দাঁও? ভেস্তে গেছে। বখরা নিয়ে বনিবনা হল না, যত-সব লোভীর দল। মানুষ আছি চার জন, প্রত্যেকেই চায় আধা বখরা।

লবঙ্গ বলল, কি? কাজটা কি?

—সেসব বুঝবি না। মেয়েমানুষের অত সবে দরকার কি? একটু থেমে লবঙ্গর কানে কানে বলল, মানুষ খুন। চুপ।

শিউরে উঠল লবঙ্গ, লক্ষ্মণকে চেপে ধরে বলল, তা কেন?

—মোটা টাকা যে!

দালান? দালানে দরকার নাই লবঙ্গর। এই মাচানটাই সে সারিয়ে নেবে। চালের ক্যানেস্তায় মোটা করে এক পোঁচ আলকাৎরা বুলিয়ে নেবে, তাতেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে। খুরপাই দিয়ে চেঁছে মেঝে সে সমান করে নিয়ে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু এসব কথা লক্ষ্মণকে সে বলতে পারল না।

বাকী রাতটুকু লবঙ্গর চোখে ঘুম এল না। লক্ষ্মণও হয়তো ঘুমোয় নি। কাক-ডাকার অনেক আগেই সে উঠে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে মাটির ঠিলি থেকে ঢক ঢক করে জল খেল। লবঙ্গকে কিছু না বলে ঝাঁপ সরিয়ে বেরিয়ে গেল লক্ষ্মণ।

উঁকি দিয়ে দেখল লবঙ্গ। লক্ষ্মণকে দেখা গেল না. একটা প্রকাণ্ড তারা আকাশের কোলের কাছে জ্বল জ্বল করছে।

সঙ্গীরা হয়তো আছে এখানে-ওখানে ভিড়ের মধ্যে কিংবা ল্যাম্প-পোস্টের আড়ালে। এখানে এই চৌ-রাস্তার মোড়ে অনেক্ষণ থেকে একা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মণ। এই এত লোকজনের মধ্যেও তাকে একেবারে আলাদা করে দেখা যায়। যেমন জোয়ান তেমনি লম্বা—কিন্তু সন্দেহ করার কিছু নেই; ওর চোখ-মুখ এমনি সরল আর সাদা-সিধে।

হবে না কেন, আজ না হয় সে ডাকু, কিন্তু একদিন তো পণ্ডিত ছিল। খেতুরের মাইনর ইস্কুলে মাস্টারি করে বছর চার। বেশ চলেছিল মাস্টারি। মাইনে পেত যৎকিঞ্চিৎ, তাও ঠিক সময় পেত না কখনো; কিন্তু এততেও ব্যাজার হত না মধুবালা—বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল সে, বড় শান্ত। মুখে রা ছিল না, ধূলোকে সোনা করে দিত—জানতে দিত না লক্ষ্মণকে তার সংসারের টানাটানি।

মুখ শুকনো দেখে লক্ষ্মণ যদি বলত, অমন কেন রে? খাস নি বুঝি?

—না, আজ আমার ব্রত।

খেতুরের মাইনর ইস্কুল আজও হয়তো আছে, কিন্তু লক্ষ্মণের জীবন থেকে সেসব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে একেবারে। আর ও-মুখো হবার জো তার নেই। ইচ্ছেও তার নেই আদপে। কেবল মনে পড়ে তার ইস্কুলের কচি-কচি সেই ছেলেদের মুখ। বড় মায়া হয়। কী মারটাই লক্ষ্মণ মেরেছে তাদের! ব্যাকরণের একটা সূত্র যদি কেউ ভুল করত, লক্ষ্মণের মাথায় রক্ত উঠে যেত আচমকা। চড়াৎ করে বসিয়ে দিত চড়। সেসব কচি ছেলে আজ কত বড় হয়েছে, কে জানে!

খেতুর মাইনর ইস্কুলের সেই লক্ষ্মণ আজ দাঁড়িয়ে আছে চৌরাস্তায়, আজ আর সে পণ্ডিত নয়; আজ সে এক অপোগণ্ড। নিজের জীবনের এই মস্ত বদল দেখে এক-এক সময় নিজেই তাজ্জব হয়ে যায়। তার জীবনে আরও কি বদল আছে, তাই হয়তো ভাবতে চেষ্টা করে।

ভাগ্যিস মধুবালা ছিল বাঁজা, তাই রক্ষে অনেকটা। তা না হলে আরও কতকগুলো বাচ্চাকাচ্চার ঝঞ্ঝাট কি পোয়াতে চাইত লখঙ্গ?

কিন্তু কী কাজে যেন এসেছে সে—এই চৌরাস্তায়? ভুলে যায় নি, কিন্তু মনটা হঠাৎ উড়ে গিয়েছিল তার। হাসি পেল লক্ষ্মণের। কথায় কথায় যার মন উড়ে যায়, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—তার আবার দাঁওএর স্বপ্ন, তার আবার মানুষ মারার সাধ! কিন্তু, রক্তও চড়ে যায় মাথায়। যেমন একদিন চড়েছিল খেতুরে, যেদিন ঝট করে মরে গেল তার বৌ—মধুবালা।

এই রাস্তা দিয়ে যাবার কথা ডাকগাড়ির। চলেই গেল কিনা, সন্দেহ হল লক্ষ্মণের। যত দূর চোখ যায়, চার রাস্তায় চার বার তাকাল ততদূর পর্যন্ত। কোনো লাল-রাঙা গাড়ির টিকিও দেখতে পেল না সে। থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মুখের মধ্যে চারটে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে তাকে ডাকে কে ও-ফুট-পাথ থেকে? লক্ষ্মণ ভালো করে চেয়ে দেখল, রামসানাই। রামসানাই ফুটপাথের ধারে বসে মেওয়া বেচছিল।

লক্ষ্মণ রাস্তা পার হয়ে রামসানাইয়ের সামনে গিয়ে বসল উঁচু হয়ে—যেন দরদস্তুর করছে, বলল, তুইও এখানে নজর করতে এসেছিস? কই, গাড়ি তো দেখলাম না।

রামসানাই হাতে একটা মস্থুস্থি নাচিয়ে বলল, দূর পাগলা। দো দফে মৈঁ নে দেখা।

লক্ষ্মণ প্রতিবাদ না করে উঠে পড়ল, এসব মোটা কারবারের কথা সে ভাবে না; এখন তার ছুটকোএকটা কাজ চাই। না হলে চলবে না।

ঘুরে বেড়াতে লাগল সে রাস্তায় রাস্তায়। বড় বড় দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়। আবার চলে। বড় বড় অফিস দেখে বেড়ায়। একটা গেট পেরিয়ে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল। কিচির মিচির শব্দ, যেন পাখীর ডাক। লক্ষণ পিছিয়ে এসে প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিল—একপাল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ভারি ভালো লাগল লক্ষ্মণের। আর কারো কথা এখন তার মনে হল না, মনে হল খেতুরের কথা।

ইচ্ছে হল, প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু বে-আইনী কাজ করে করে পোক্ত হয়ে গেলেও এ-কাজে তার সাহস হল না। সরে এসে দাঁড়িয়ে রইল তফাতে।

এটা কি ইস্কুল? লক্ষ্মণ গেটের খাকি জামা-পরা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা লক্ষ্মণের আপাদমস্তক তাকিয়ে বলল, অনাথালয়। অরফ্যানেজ।

তখনো সন্ধ্যে হয়নি। লক্ষ্মণের আজ জীবনে এই বুঝি প্রথম ইচ্ছে হল ঘরে ফিরতে। কিন্তু এত শীগ্‌গির ফিরলে মনে করবে কি লবঙ্গ? মালুরাই বা ভাববে কি? সন্ধ্যের আলোয় তাকে দেখে হয়তো ভয়ই পেয়ে যাবে তারা। লক্ষ্মণের মনে হচ্ছে, সে যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ট্যাঁকে কড়ি না থাকলে ব্যাটাছেলের মন বুঝি এমনিই হয়। কড়ি চাই। তাতে পড়ে যদি হাতে হাত-কড়া, পরোয়া নেই। বড় বড় পা ফেলে হাঁটা দিল লক্ষ্মণ।

নিশুতি রাতে লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকেই লবঙ্গকে বলল, এই নে। কাল পেট ভরে খাস্। মুখ শুকিয়ে তো আমসি করেছিস।

বেশী কিছু নয়। খান কয়েক নোট মাত্র। এতেই চলে যাবে কয়েকটা দিন।

লবঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাল আবার শুনতে হবে কতকগুলো ঘেন্নার কথা। সবাই বললে, রাতে বুঝি রোজগার করলি?

লক্ষ্মণ দাঁতে দাঁত রেখে বলল, ওদের জবাই কর। বলিস, তোরা কামাস দিনে, আমার কারবার রাত-বেরাতেই।

ঝোঁকের মাথায় লক্ষ্মণ বলে বসল বটে, কিন্তু মানুষের মুখই বা আটকাবে সে কি করে? লবঙ্গ সত্যিই তার কে? চুরি-করে-আনা একটা মেয়েমানুষ ছাড়া সে তো বেশী কিছু নয়? পাঁচটি সন্তান সে উপহার দিয়েছে বলেই সে তো বৌ হয়ে যায় নি লক্ষ্মণের? তার ছেলেমেয়েদের সে বাবা বটে, কিন্তু পাঁচজনে তা মানবে কেন? তারা গ্রাহ্য করবে কেন লবঙ্গকে?

নিশুতি রাতের অন্ধকার ঘরে চুপ-চাপ শুয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ্মণ বলল, বৌ আমার একটা ছিল।

লবঙ্গ ফিরে শুল, বলল, সে কোথায় ?

অন্ধকারের মধ্যেই ঘরের চালের দিকে আঙুল তুলে লক্ষ্মণ বলল, স্বগ্‌গে।

লবঙ্গ বলল, মিথ্যে কথা, বিয়ে তুমি করনি।

—তোকে বিয়ে করিনি। কিন্তু করেছিলাম তাকে।

এতদিনের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও লবঙ্গ একথা জানতে পারে নি। একথা শোনায় তার ক্ষতিই বা কি, লাভই বা কি—সে হিসেব তার নেই। কিন্তু কেবলই সে জানতে চাইল, কি অসুখ তার হয়েছিল, নাম তার কি ছিল, কবে সে মরল।

—তোকে চুরি করার দু মাস আগে। মধুও মরল, আমার জীবনটাও পালটে গেল। ছিলেম পণ্ডিত, হলেম অপোগণ্ড।

লবঙ্গ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ওসব কি কথা ? আমার কাছে তুমি পণ্ডিত। খেতুরের লক্ষ্মণ পণ্ডিত। তোমাকে কি চিনি আজ থেকে ? যখন আমি অ্যাট্টুকু, তখন থেকে শুনি তোমার নাম, তোমার শরীরের গপ্‌প। ইয়া লম্বা আর ইয়া চওড়া। সবাই বলত, এমনিতে সে লোক ভালো, কিন্তু রাগলে চণ্ডাল।

লক্ষ্মণ হাসল, বলল, তার প্রমাণ তো পেয়েছিস ?

—খু-উ-ব। তাই তো ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকি। নইলে তোমায় কেয়ার করত কে ?

মুখ খুলে গেছে লবঙ্গর। সাহস বেড়ে গেছে। এমনভাবে কথা বলছে, যেন লক্ষ্মণ তার স্বামী। কিন্তু সে যে তার কেউ নয়, এ হুঁশ তার নেই আদপে।

মধুবালা মরেছে নাকি স্রেফ না খেয়ে। মাইনর ইস্কুলের পণ্ডিতের মাইনে কত, সেকথা তো গোপন করার দরকার করে না। লক্ষ্মণের মত এই বিরাট

শরীরটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে খোরাক দরকার হত নিশ্চয় সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি। যা মাইনে পেত, তা দিয়ে মধুবালা লক্ষ্মণকেই খাইয়ে রাখত; নিজে নাকি খেত না আদপে; কিন্তু বলত না কিছু। নিজেকে সে নাকি তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেছে।

—তাহলে খুব ভালোবাসত তোমাকে?

—কি জানি। বাসত কি, না বাসত—

সে খোঁজ লক্ষ্মণ করে নি কোনোদিন। কিন্তু যেদিন বিনা-নোটিশে সে হঠাৎ মরে গেল, ডাক্তার এসে তার অসুখের কথা লিখে দিল অনাহার, তখন মাথা খারাপ হয়ে গেল লক্ষ্মণের। ট্যাঁক তখন তার ফাঁকা, সৎকারের কাঠ কেনার কড়ি নেই।

—পাঁচটা টাকা দিন। চাইলাম, বেহায়ার মতই চাইলাম বিষ্টু বারিকের কাছে। লোকটা টাকার কুমীর। বলে, টাকা নেই। শাসিয়ে এলাম তাকে। বলে এলাম, পাঁচটা দিনের মধ্যে ডাকাত পড়বে তোমার বাড়িতে। ডাকাতের মত পড়লাম গিয়ে চার দিনের দিন রাতে—এক হাতে বল্লম, এক হাতে দা নিয়ে। ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট সে, একজন মাস্টার বিপদে পড়লে একটু দেখবে না? চিনে ফেলেছিল বারিক, কিন্তু ধরতে পারেনি। আদালতে যাবে-যাবে করেছিল নাকি। কিন্তু প্রমাণ কি? সাক্ষী কে? প্রাণে সে বেঁচে গেছে, এই ঢের।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল লবঙ্গ। এসব তার জানা, তবু লক্ষ্মণের মুখ থেকে শুনে একেবারে নতুন লাগছে।

—হাতে কাঁচা টাকা। ঘর ফাঁকা। মন উড়ু-উড়ু। খেতুরে থাকা আর চলে না। প্রমাণ কিছু থাক্ বা না থাক্, খেতুরের লোকজন তো আর সে সম্মান আমাকে করতে পারে না। খেতুর ছাড়ব ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু একা না। জগদ্ধাত্রী পুজোয় সেবার তুই এসেছিলি না অশ্বিনী পুরকায়েতের পুজোমণ্ডপে? দেখে পছন্দ হয়েই ছিল। তাই খেতুর থেকে বিদায় নেবার দিন রাত-দুপুর তোকে—

লক্ষ্মণের মুখ চেপে ধরল লবঙ্গ, বলল, থাক থাক। সে বীরত্বের গপ্প আর করে দরকার নেই।

লক্ষ্মণ আবার কিছুক্ষণ কি-সব ভাবল, বলল, বারিকটাই দায়ী। পাঁচটা টাকার জন্যে আমাকে ডাকু বানিয়ে দিল।

—যত দোষ বারিকের। বারিক বলেছিল, মেয়ে চুরি কর?

লক্ষ্মণ বুঝি হাসল, বলল, বারিক বলবে কেন? বলেছিলি তুই—পুজোমণ্ডপে সেদিন না এলেই এ-ঘটনা ঘটত না।

কিন্তু ঘটনায় যা ঘটে গিয়েছে, তাকে বেদনায় বেঁধে তো লাভ নেই। লবঙ্গ একটু চুপ করে থেকে, নিশ্বাসটা চেপে দিয়ে বলল, ভালোই হয়েছে। তোমার মত ইয়ে পেয়েছি। তা না হলে তো পেতাম না।

—ইয়ে কি রে, লবঙ্গ? লবঙ্গর মাথায় ঝাঁকি দিল লক্ষ্মণ।

লবঙ্গ বলল, এক চুমুক ঘুমিয়ে নাও। রাত কাবার হতে চলল।

কিন্তু ঘুম হল না লক্ষ্মণের। প্রথম কাক-ডাকার আগেই শুকতারার আলোয় আকাশ যখন জ্বল জ্বল করে উঠেছে, লক্ষ্মণ তখন ঘরের ঝাঁপ ফাঁক ক'রে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

দুপুরের দিকে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর বৌ বিনোদিনী গোবর হাতে নিয়ে দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কি রান্না হচ্ছে? বরাত ফিরে গেল রাতারাতি? কড়কড়ে নোট দেখছি হাতে?

—চাল কিনতে যাচ্ছি।

কুৎসিত ইঙ্গিত করে বিনোদিনী বলল, দিল কে?

—লোক আছে। মানুষ কি নেই ভেবেছ? নোট ভাঁজ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলল লবঙ্গ।

বিনোদিনী ছাড়ল না, বলল, তা থাকবে না কেন? মালুরা পাঁচ ভাই-বোন তো আর আকাশ থেকে পড়ে নি? কিন্তু সে কে, তারা কারা?

বিনোদিনীর কথা কাঁটার মত বিঁধল তার গায়ে। জবাব দিতে পারল না লবঙ্গ। একবার বলতে ইচ্ছে হল, তারা নয়, সে ; যা-তা লোক সে নয় ; মিস্ত্রী সে নয়, সে পণ্ডিত ; সে লক্ষ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করা নিষেধও আছে, আর তার নামও সে বলতে পারবে না। তার মনে হতে লাগল, একদিন ফিরে যায় লক্ষ্মণের বরাত, একদিন শেষ হয়ে যায় তার এই লুকোচুরি, সেই দিন সব পরিচয় সকলে জানতে পারবে। সেইদিন তাদের এই ঘেন্নার ইঙ্গিত শেষ হবে।

লক্ষ্মণ ঘুরে বেড়ায় সারা শহর। কিছু পায়, আবার কিছু পায়ও না। এই বিরাট শরীরটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে সংকোচ তার হয়। রাস্তার লোকজন ফিরে ফিরে তাকায় তার দিকে। হয়তো এ চাওয়াটা তাদের নিছক কৌতূহল, কিন্তু লক্ষ্মণের মনে হয় তারা বুঝি তার মনের অভিসন্ধিটা জানতে পেরে গিয়েছে। সে যে নিছক চোর, নির্মম ডাকাত—হয়তো তার চাল-চলনেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সব।

উঁচু শরীরটা উঁচু করে তুলে প্রাচীরের এপাশে দাঁড়ায় লক্ষ্মণ। অনাথ ছেলে-মেয়েদের মনে গ্লানি নেই এতটুকু, এতটুকু দুঃখের আভাস নেই। খেতুরের ছেলেদের সঙ্গে এদের কত প্রভেদ! এত ছুটোছুটি করতে, এত ফুর্তি করতে জানেই না তারা।—

পিতার নাম, পিতার ঠিকানা, পিতার পেশা, পিতার মৃত্যু, পিতার মৃত্যুর কারণ, পিতার মৃত্যুর তারিখ, মৃত্যুকালে পিতার বয়স। কেবল পিতা, পিতা আর পিতা!

দারোয়ানের কাছ থেকে একটা ফর্ম চেয়ে নিয়েছে লক্ষ্মণ। অনাথালয়ে ভর্তির ফর্ম। এমনি, কৌতূহল। কাদের এখানে ভর্তি করে, তাই তার জানবার ইচ্ছে। এত হাসিখুশি যে ছেলেরা, তারা কারা? কে তাদের পিতা?

আরও অনেক প্রশ্ন ছাপা আছে ফর্মে। খুঁটিনাটি করে সব জবাব নাকি লিখে দিতে হয়।

ভালো। টুকরো টুকরো করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল লক্ষ্মণ। এ দিয়ে তার কোনো দরকার নেই। তার দরকার এখন অন্য কাগজের—কড়কড়ে নোটের, যা পেলে তার একটা হিল্লে হয়ে যায়। দালান ওঠে লবঙ্গের। চাই একটা মোটা রকমের দাঁও। বেশি না, বিশ হাজার, তিরিশ হাজার।

রামসানাইদের আড্ডার পথে পা বাড়াল লক্ষ্মণ। চওড়া মল্লিক রোড পেরিয়ে হৃদয় কুঞ্জের গলি; গলির শেষে পল্টুবাবুর বস্তি। লক্ষ্মণদের হেড কোয়ার্টার। ছোট উঠোনের মাঝখানে খাটিয়া পাতা, খাটিয়ায় বসে মিশির খৈনি টিপছিল। লক্ষ্মণকে দেখেই উল্লাস করে উঠল সকলে।

দাঁও-এর প্ল্যান। প্ল্যান নাকি তৈরি। বিশ-তিরিশ নয়, তারও বেশি বখরা এক-এক জনের। জান্ কবুল করে নামতে হবে নাকি এ কাজে।

লক্ষ্মণ সব শুনল গালে হাত দিয়ে বসে, অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল, তার পর সোজা হয়ে বসে বলল, রাজি।

মিশির পিঠ চাপড়ে দিল লক্ষ্মণের। জোরে জোরে খৈনি টিপে বলল, তিন-চার লাখ টাকার কারবার।

লক্ষ্মণের শরীরে চাঞ্চল্য এসে গেল। তার মনে হতে লাগল, এর চার ভাগের এক ভাগ তার বখরাটা তার হাতেই বুঝি এসে গেছে। মুঠি দুটো তাই শক্ত করে সে বসে রইল। সে দেখতে পেল, লবঙ্গের কলঙ্ক সে মোচন করে দিয়েছে, সে তার বাচ্চাদের হিল্লে করে দিয়েছে। পিতা, পিতা, পিতা, —পিতা ছাড়া গতি কার কিসে? পিতাই তো সব, পিতার পরিচয় যার নেই, সে আবার মানুষ কিসের?

সেদিন রাত্রে লক্ষ্মণ লবঙ্গকে কিছু বলল না। আনন্দের ঝোঁকে এক-একবার বলে ফেলতে ইচ্ছে তার হয়েছে। কিন্তু না, এসব গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ করতে নেই মেয়েদের সঙ্গে। তাদের পেটে কথা থাকে না।

এক রাত্তির গেল, দু রাত্তির, তিন রাত্তিরও গেল। লবঙ্গকে বলল না লক্ষ্মণ। তার মতলব হল, একদিন তাক লাগিয়ে দেবে লবঙ্গকে। টাকার আণ্ডিল ঢেলে দেবে ঘরের মেঝেয়। তাজ্জব করে দেবে লবঙ্গকে।

ওদিকে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর বৌদের ঘর, তার পাশাপাশি আরও কতকগুলো চালা। লবঙ্গ একেবারে একা। সবার থেকে তফাতে ছেলেদের খেলার মাঠের এক কোণে তার এই ছোট্ট কুঁড়ে। একা একা রাত কাটাচ্ছে লবঙ্গ। আজ দু রাত্তির লক্ষ্মণ আসছে না। দশ বছরের মধ্যে এমন অনিয়ম করে নি সে। হয়তো হঠাৎ এসে লবঙ্গকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যেই আসছে না তাহলে।

তাক লেগে গেছে লবঙ্গের, সত্যিই তাজ্জব হয়ে গেছে সে। বিনোদিনীদের কাছে সে শুনেছে, শহরে ভীষণ ডাকাতি হয়েছে, একটা লোক ধরা পড়েছে, তার নাম নাকি—

কানে আঙুল দিল লবঙ্গ। সে শুনতে চায় না নাম। লক্ষ্মণ নিজে এসে বলে যাক, সে ধরা পড়ে গেছে; তা না হলে কিছুতে বিশ্বাস করতে পারে না লবঙ্গ। লবঙ্গর মাথা ঝিমঝিম করছে, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে—এদের নিয়ে এবার কি করবে সে? একবার এসে বলে যাক লক্ষ্মণ।

নিজের পরিচয় অবশ্য কিছু নেই, লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে নিজের নাম জুড়েও কিছু বলার তার মুখ নেই। সে চুপ করে থাকে, গুম হয়ে বসে ভাবে। আর রোজ ডাকাতিটার গল্প শুনতে চায়। শুনতে চায় ডাকাতের কি হল?

বিনোদিনী বলল, ফাঁসি।

গলায় ফাঁস লেগে গেল লবঙ্গের, দম আটকে গেল তার, ঢোক গিলে বলল, কবে হল রে?

—হয় নি। হবে। রায় হয়ে গেছে, এবার ঝুলিয়ে দেবে একদিন। বিনোদিনী বলল, আস্ত দুটো মানুষ নাকি খুন করেছে ওই হারামজাদা, ফাঁসি তো কম সাজা হল। পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়ালে গায়ের ঝাল মেটে।

বিনোদিনীর গায়ের ঝাল মেটে বটে, কিন্তু লবঙ্গর সারা গা জ্বালা করছে, যেন তার সারা গায়ে কে লঙ্কা-বাটা মেখে দিয়েছে। লক্ষ্মণের ফাঁসি হয়ে যাবে? কিন্তু তার আগে একবার দেখা হয় না তার সঙ্গে? ছুটো কথা কেবল তার জানবার আছে—'আমি কি করব, ছেলেদের কি হবে?' খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে লবঙ্গ ভাবছেই।

লক্ষ্মণও ভাবছে। জেলের একটা ছোট্ট ঘরে সে আটক, লোহার গরাদে-দেওয়া দরজায় মোটা তালা ঝুলছে, তবু হাতে তার হাতকড়া। সে বসে আছে নির্বিকারভাবে। যেন কোনো ভাবনা নেই, কোনো চিন্তা নেই। বাইরে পাহারাদারের মোটা বুটের শব্দ বাজছে শান-বাঁধানো বারান্দায়।

অমনি কটকট শব্দ করে তার ফাঁসির সময়ও এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। বাইরে রোদ। এই রোদ ডিঙিয়ে যে রাত আসবে, তারই শেষ লগ্নে তার ফাঁসি। সেই নিশুতি রাতের শেষে। দরজার ঝাঁপ ফাঁক করে যে সময় বরাবর সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, আজ সেই সময় তার প্রাণটা তার শরীরের ঝাঁপ তুলে বেরিয়ে যাবে। লক্ষ্মণের মনে পড়ল, পরিচয়হীন তার পাঁচটি সন্তানের কথা, তাদের মায়ের কথা।

দ্রুত একটা পায়ের শব্দ আসছে, লক্ষ্মণ তৈরি হয়ে বসল। জেলার। দরজার তালা খোলা হল। জেলার যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার লাস্ট উইশ্—শেষ ইচ্ছা? কিছু বাসনা আছে? থাকে তো বল, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ বলল, আছে।

—কি?

লক্ষ্মণ বলল। জেলারও স্পষ্ট শুনলেন। কিন্তু তাঁর মনে হল, ভুল শুনেছেন তিনি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মণ স্পষ্ট করে আবার বলল। বলল, সাদি। বিয়ে করব।

বিশ্বাস হল না জেলারের। তাঁর মনে হল, তিনি ভুল শুনলেন। তাই জিজ্ঞাসা করতে হল তাঁকে। এবার তিনি গাম্ভীর্য ভুলে উচ্চশব্দে হেসে উঠলেন।

হাসি থামিয়ে একটু ঝুঁকে অনেকটা ব্যঙ্গের সুরেই বললেন, সে কে, সে কোথায় ?

লক্ষ্মণ অকপটে সব বলল।

জেলার এবার মনে মনে হাসলেন, বাইরের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হল তাঁকে। এ যে এক অদ্ভুত আব্দার খুনী আসামীর। অভিনব।

এর কিছুক্ষণ বাদে জেলারের আদেশে তৎপর হয়ে উঠল সকলে—সান্ত্রী, ওয়ার্ডার, ছোট জেলার।

লবঙ্গর চিন্তার শেষ নাই। রোয়াকে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে চলেছে সে। বাইরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বিনোদিনী-দের দাওয়ার পাশের ওই সিস্থু গাছটায় বসে গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে কি একটা পাখি। লবঙ্গ যদি ওইভাবে চেঁচাতেও পারত, তাহলে যেন শান্তি পেত কিছুটা।

কয়েক জোড়া ভারি বুটের শব্দে লবঙ্গ তটস্থ হয়ে উঠল। তার উঠোনে হঠাৎ এই পেয়াদা কেন ?

তার নাকি ডাক এসেছে জেলখানা থেকে। লবঙ্গের সন্তানদের পিতার আহ্বান।

ডেকরেটর মনোহর

পাঁচ-সাত বছর আগে এখানে ছিল ফাঁকা মাঠ। মাঠের এক পাশে এক ফালি জমিতে ফুটবল খেলার জন্যে বাঁশের পোস্ট পোঁতা ছিল, ছেলেরা রোজ বিকেলে সেখানে বল পিটতো। ফাঁকা মাঠের আশে-পাশেও লোকজন ছিল না বেশি ; দু-চার ঘর যা ছিল, তাও কিছু তফাতে। এদিকটা তাই নীরব আর নির্জীবের মত পড়ে থাকত চুপ-চাপ। ওদিকে চীনা কারপেণ্টার চুংচিং কোম্পানীর ঘর থেকে করাতে কাঠ-চেরার শব্দ একটু পাওয়া যেত, আর ঘড়ঘড় শব্দ করে ইঁট গুড়ো করার আওয়াজ আসত শুরকি-কল থেকে। সে কলও আজ নেই, সে কারখানাও নেই।

আজ সব বড় বড় বাড়ি। আকাশ ছোঁয়-ছোঁয়, এমনি উঁচু। চওড়া আর লম্বা রাস্তা এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে, এমনি মনে হয় এখন। এরই মাঝখানে গোলাকার একটা ছোট বাগান, জালের নীচু রেলিং দিয়ে গোল করে ঘেরা। নাম গোল পার্ক। এই বাগানের হাত যেন সাতটা—সাত দিকে সাতটা রাস্তা সটান চলে গেছে। কেউ যোধপুরে, কেউ গড়িয়াহাটায়, কেউ কাঁকুলিয়ায়, কয়েকটা বম্পাস লেকের দিকে। বড় বড় বাড়ি, আর বড় বড় রাস্তা—তবু কোলাহল নেই, কলরব নেই। এই বাড়িগুলো যেন পথের দিকে চেয়ে পাঁচ-সাত বছর আগের ফাঁকা মাঠের স্বপ্ন দেখে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে।

এই অল্প সময়ে এমন আচমকা বদলে যেন চমকে গেছে ঘরবাড়িরা। তাই দিন-দুপুরেও তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো জাঁক করে না, কোনো হৈ-হাঙ্গামা নেই।

দোকান আর স্টল একে একে বসে যাচ্ছে রাস্তার দুপাশে। পান-বিড়ি, স্নো-পাউডার, রুটি-বিস্কুট, শয্যাদ্রব্য ও হোশিয়ারি থেকে শুরু করে চায়ের স্টল, ধুনুরি-ধোনকর, ঝালাই আর পালিশ। সব কটা রাস্তা এখনও সাবালক

হয় নি। গোল পার্ক থেকে গড়িয়াহাটার বাজারে যাবার রাস্তাটা লায়েক হয়ে উঠছে—দোকানগুলো এই দিকে তাই বসছে একে একে। লোকজনের চলাফেরা যাতায়াতও এদিকেই বেশি। হালে নতুন একটা দোকানে চকচকে পাঁচ-রঙা সাইনবোর্ড লটকানো হয়েছে—মনোহর ডেকরেটিং কোং। উপরে করোগেটের টিন, দেয়াল এক ইঁটের গাঁথনি, পাশাপাশি কয়েকটা ঘর, এটা তারই একটা। সন্ধ্যের পর থেকে রঙ-বেরঙের আলো জ্ব'লে আর নিভে বিজ্ঞাপন দেয় এই মনোহর ডেকরেটিং কোম্পানীর। ঝকঝকে বাড়িঘর আর রাস্তা—আলোয় আলোময় হয়ে যায় চারধার নিয়ন বাতির ঝলমলানিতে, এর মাঝখানে মনোহর ডেকরেটিংএর সেকেলে আলোর কায়দা নেহাত বেয়াড়া মনে হয়। কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই মনোহরের। নিজের ফ্যাশানে সে যেন মশগুল।

—দোকানটা নতুন, কিন্তু ব্যবসা তো আর আনকোরা নয়। আরও পাঁচ-সাতটা দোকান আমাদের আছে। একটা চোরবাজারে, একটা চড়কডাঙ্গায়, বৈঠকখানায় দুটো, বড়বাজারে—

এ দোকানটা ছোট। মনোহর স্বীকার করে। তবু তো সেলামী না দিয়ে পাঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় সে জোগাড় করতে পেরেছে। এর জন্যে পাকা চার মাস তাকে জোঁকের মত লেগে থাকতে হয়েছিল হরকুমারবাবুর গায়ের সঙ্গে। লোকটা যেমন কিপটে, তেমনি রক্তশোষা।

হেসে উঠে বললাম,জোঁকের মতলেগেথাকলেতুমি,আর রক্ত চুষল হরকুমার ?

মনোহর বলল, আমি লেগেই ছিলাম বেকুরের মত, কিন্তু কাজের কাজ করল তো ও। এই ঘর পঞ্চাশ টাকা দেয় কোনো ভদ্দরলোক। আমি তো কোটেশন দিয়েছিলাম তিরিশ টাকা।

একটু ভেবে বললাম, কেমন মনে কর, ভাড়া উঠবে ?

মনোহর এমন প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না হয়তো, একটু যেন চমকেই উঠল, সামনে গোল পার্কের দিকে একবার তাকাল, বলল, বলা যায় কি ! লোকজন তো বাড়ছে, অন্নপ্রাশন, বিয়ে-সাদি, বাগান-পার্টি—এসব হলেই—

মনোহরকে যেন ভাবিয়ে দিয়েছি। আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে সে মাঝপথে থেমে গিয়ে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

কি যেন ভাবছে মনোহর। নতুন করে এখন একটা দোকান খোলা ঠিক হল কি না, ঘরভাড়া উঠবে কি না, এ তল্লাটে এমন ব্যবসার কোনো বাজার আছে কি না—হয়তো এইসব কথাই ভাবছে ও।

বলল, বরাৎ। কারো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়, কোনো আম শুকিয়ে হয়ে যায় আম্‌সি। লেগে যেতেও পারে বৈকি। অনেক টাকা ঢেলেছি, একথা ঠিক। দেখছেন না, টাটকা নতুন মালে ঠেসে ফেলেছি দোকান। চটের আর চাটাইয়ের দুরকম আসন, মাঝারি ছোট আর প্রমাণ সাইজের সতরঞ্চি,কাঁচের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, পিরিচ আর ডিশ, ফুলদানি—স্টকে সব মাল মজুদ।

চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, পাশাপাশি দুটো আলমারির সব কটা তাকই ফরাসে বিছাবার শৌখিন চাদরে ঠাসা। কিন্তু এইই নাকি সব নয়। এ ছাড়া গোডাউন আছে, তারও ভাড়া গুনতে হয়। কুলী রাখতে হয় দুটো, মাল জোগান দিতে আর কুড়িয়ে আনতে। জলের বড় বড় টব, গ্যাস-বাতি, কম-বেশি নানান পাওয়ারের বাল্‌ব, প্লাগ, তার, হোল্ডার। ঝক্কি কি কম! এমন আয়োজন সে করেছে, মনোহর বলতে লাগল, নুন থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। ছোট হোক, বড় হোক—যে-কোনো ব্যাপারের বাড়িতে সব সে সাপ্লাই দিতে পারবে, যা-কিছু দরকার হোক।

আয়োজনের ত্রুটি অবশ্য নেই, কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন একান্ত হবে কি না, এইটেই ছিল জিজ্ঞাসা। অনেক টাকা সে ঢেলেছে। ঢালতে ভরসা পেয়েছে হয়তো এটা তার জাতব্যবসা বলেই, আরো পাঁচ-সাতটা দোকান আছে বলেই। একটা দোকানে চোট খেয়ে গেলে অন্য-একটা দোকান তা সামলে দেবে, এ-ই হয়তো তার ভরসা।

—উহু'। কোনো ভরসাও নেই, পরোয়াও নেই। মনোহর চেয়ারে বসে ছিল, একটা হাঁটু থুৎনির কাছে তুলে নিল। বলল, আরো দোকান আছে

বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আর নেই। আমার শেয়ারে যা ছিল, সব আমি কুড়িয়ে-কাচিয়ে এনে ইনডিপেণ্ডেণ্ট ব্যবসা করছি এখন।

ব্যবসা মনোহরের। কিন্তু অযথা দুশ্চিন্তা হতে লাগল আমার। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা মার খেয়ে যাবে। সতরঞ্চি আর জলের টব ভাড়া খাটিয়ে কতই হতে পারে বা! তার উপর—

মনোহর বলল, ঠিক বলেছেন, তার উপর আছে গেস্ট কণ্ট্রোল অর্ডার। যত খুশি লোক খাওয়াতে পারা যাবে না—গোনাগুন্তি পঁচিশ, মেরে-কেটে পঞ্চাশ। যাদের সামর্থ্য আছে এই অছিলায় তারাও চা-কেক খাইয়ে বিদায় দিচ্ছে নিমন্ত্রিতদের। এত কড়াকড়ি হলে আমাদের চলে কি করে? এন্তার লোককে খাওয়ানো যেতো, তাহলে আমাদের মত ডেকরেটরের এত বিপদ হত না।

বললাম, ওই কথাই ভাবছিলাম।

মনোহর বলল, আর ভেবে ফল কি। আর্টিস্ট মাত্রেরই এখন এই দুরবস্থা। গাইয়ে বলুন, বাজিয়ে বলুন, ঢাকী বলুন, ঢুলী বলুন—সবার এই হাল। অবস্থা সব গুণীরই যখন এই, তখন আমরা ডেকরেটরেরাই বা বাদ যাই কেন। তাই আপদকে আর বিপদকে মেনেই নিয়েছি।

ভালো। পাগল যদি সেয়ানা হয়, তাহলে তার পাগলামি সারানো কঠিন। মনোহর তাহলে জেনে-শুনেই এ পথে নেমেছে।

সারাদিন দোকান খুলে একভাবে সে বসে থাকে। তার জীবনের এটা মস্ত বড় একটা প্রতীক্ষার ব্রত। ছোট এক ফালি ঘর, দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুটো আলমারি, বাকি দুটো তার পিঠের দিকে। আলমারিগুলো ভালো, কিন্তু তার বসার টেবিলটা খেলো কাঠের, নড়বড় করে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে নিয়ে মনোহর সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে চুপচাপ। সে আর্টিস্ট, সে ডেকরেটর। গুণীর জীবন এ রকম ব্যর্থ হওয়াই নাকি স্বাভাবিক।

লোকটার চোখে-মুখে উদাসীনতার একটা ভাব লক্ষ্য করেছি। জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হবার দরুন এ ভাবটা কি না, তা ধরা যায়নি অবশ্য।

তার চোখের সামনে বড় বড় উঁচু-উঁচু বাড়ি। তারা যেন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে টিনের এই শেডের দিকে। মনোহর ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে ওদিকে। চোখে ইশারা নেই, ইঙ্গিত নেই; আশাও নেই, আশ্বাসও নেই কিছু। তবু এইভাবে প্রতীক্ষা করাতেই বুঝি তার আনন্দ। হবেও-বা। তা না হলে সমস্ত জীবনের সম্পদকে রেহান রেখে সে দোকান খুলত না ডেকরেটিংএর।

বিকেলের দিকে মনোহর হাঁটু নামিয়ে সোজা হয়ে বসে। এই সময়টা রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে, মেয়েরা সাজগোজ করে লেকে হাওয়া খেতে যায়।

একদিন ধরে বসলাম, ব্যাপার কি হে, মনোহর। প্রেম করছ নাকি!

কথাটা বললাম বটে, কিন্তু নিজের কানেই তা ব্যঙ্গের মত শোনালো। প্রেম করবে মনোহর, কার সঙ্গে! সে গুণী হতে পারে, শিল্পীও হতে পারে সে। কিন্তু তার প্রেমে পড়বার মত মানুষ তো এদিকে চোখে পড়ে না।

মনোহর চমকে উঠল, বলল, কে বলল আপনাকে?

লোকটার চোখের দিকে তাকালাম। দু চোখ যেন আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠেছে তার। মুচকে হেসে বলল, বাজে কথা। কেউ বলে থাকলে ভুল করেছে।

—বলে নি কেউ কিছু। আমি তোমার কাছেই শুনতে চাই।

মনোহর চুপ করে রইল। হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে বলল, দুনিয়াটা দেউলে হয়ে গেছে।

—তার মানে?

—একটা গাহাক নেই। আজ তিন মাস হয়ে গেল।

এর পরে আরও তিন মাস কাটল, কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি। মনোহর এখন যেন মুষড়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু মুখে সে তা স্বীকার করে না। বলে, দোকানদারি ঝকমারির কাজ, কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে, স্যার। আমাদের চড়কডাঙ্গার ব্রাঞ্চ যখন খোলা হয়, আমি তখন অবশ্য হইনি, বাবার কাছে শোনা কথা, তখন পাক্কা দেড়টি বছর নাকি ঝাঁপ খুলে

বসে থাকতে হয়েছিল আমার মেজ জ্যাঠাকে। দেখতে দেখতে দোকান চেনা হয়ে যাবে, তবে না আসবে খদ্দের।

দেড় বছরের মধ্যে মাস আষ্টেক হয়তো কেটেছে, এখনো আরও অনেক দিন এইভাবে বসে থাকতে রাজি মনোহর।

—কিন্তু তোমার দোকানটা একটু ঢেলে-সাজা দরকার, মনোহর। মালপত্র নতুন বটে, কিন্তু সবই সাবেক-কেলে প্যাটার্নের। এগুলো বেচে দাও। হাল-ফ্যাশানের মালপত্তর আনাও। এ পাড়াটা দেখছ না, নতুন গজিয়ে উঠছে, এর রুচিও নতুন।

মনোহর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তার পর কি যেন ভাবল, বলল, মানায় না, তাই না? আমিও তো তাহলে বড্ড বে-মানান।

নিজের আপাদমস্তক সে নিজে দেখতে পায় না। তা না হলে একথা সে জিজ্ঞাসা করত না। এই চকচকে রাস্তা, ঝকমকে বাড়ি, জ্বলজ্বলে আলো, এই প্রসন্ন আর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ; নতুন জীবনের আর যৌবনের, নতুন আশার আর উল্লাসের, নতুন পোশাক আর পরিচ্ছদের বন্যা—এর তোড়ে মনোহরের মত তৃণখণ্ডের ভেসে যাবার কথা। ভেসে সে যায় নি, স্রোতের তোড় থেকে গা বাঁচিয়ে একটি কিনারে সে আটকে রেখেছে নিজেকে—প্রশস্ত রাস্তার এক পাশে এই নির্জন দোকানের নড়বড়ে টেবিলে।

তাকে পরামর্শ দিয়ে বললাম, অত হাঙ্গামে দরকার নেই। সব বেচে দিয়ে পান-সিগ্রেট রাখো। সেইটে হবে ব্যবসা। এখন যা করছ, এটা ডাঁহা ছেলেমানুষী।

অজানিতে অপমান করে বসেছি হয়তো ওকে। ওর মুখের উপর দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল যেন হঠাৎ। হঠাৎই আবার তা নিভে গেল।

মনোহর বলল, ও কাজ করতে বলবেন না। এ ব্যবসা না পোষায় যদি তাহলে ব্যবসাই ছেড়ে দেব একেবারে।

এক মুহূর্তে একেবারে উদাস হয়ে গেল যেন সে। নড়বড়ে টেবিলে একটা হাঁটুর চাপ দিয়ে শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল একবার। একটু আক্ষেপ করেই যেন সে কথা বলতে শুরু করল, বলল, অ্যাদ্দিনের পরিচয় আপনার সঙ্গে, কিন্তু আজও আপনি চিনতে পারলেন না আমাকে। আমাকে দোকানদার বলেই ঠাউরে রেখেছেন দেখছি।

মনে মনে হাসলাম, সত্যিই বটে, একটা দোকানদারকে দোকানদার বলে ঠাউরে ভুলই করেছি বটে। সদর রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে গাহাকের জন্যে হাঁ করে বসে থাকায় কোনো আপত্তি ওর নেই, কিন্তু দোকানে পান-বিড়ি-সিগ্রেট রাখাতেই যত অসম্মান। কিন্তু ওকে একথা বলা ঠিক নয়। ও নিজেকে কি-যে ঠাউরে রেখেছে, সেইটেই আমার চিন্তা হয়ে দাঁড়াল প্রায়। ও নাকি গুণী, ও নাকি আর্টিস্ট।

—ছবি আঁকতে জানিনে, কলম চালাবার মত বিদ্যে নেই, গান-বাজনা আসে না; কিন্তু ঘর সাজাতে জানি, স্যার। তেমন কণ্ট্রাক্ট যদি কোনো দিন পাই, তাহলে সাজিয়ে দেখাব।

দেখব। কিন্তু সবই তো তার যদির উপর নির্ভর। তাই ভাবলাম, তেমন বরাত যদি করে থাকি, তার হাতের সাজসজ্জা তাহলে দেখব একদিন।

সামনের বাড়ির চারতলার বারান্দায় রাতে নিয়ন আলোর নল জ্বলে। মোলায়েম আর ঠাণ্ডা সে আলো। চারদিক ঝলমল করে, কিন্তু সে দিকে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে না। মনোহর সে দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বসে বসে কি যেন ভাবে ও। তার বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, ওর ভিতরটা যেন বাঙ্ময় হয়ে আছে, প্রকাশের কোনো ভাষা নেই বলেই সে এমন নীরব।

মনোহর ডেকরেটিংএর সাইনবোর্ডের উপর রঙ-বেরঙের বাল্‌ব্ জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে। ওটা যেন মনোহরের মনের রঙিন আশা আর নিরাশার আলো-খেলা। ওর মনের মধ্যেও হয়তো অমনি করে আলো জ্বলে আর নিরাশা নিভে যায়। কিন্তু এত শিগগীর নিভলে হবে কেন, তাকে

শক্ত হয়ে বসে থাকতে হবে প্রতীক্ষা নিয়ে। মনোহর বসে বসে অদূরের ওই নিয়ন আলোর রং দেখে। ওই এক-রঙা আলো তার চোখে রামধনুর কোনো রং বুলায় কি না কে জানে। মনের কোনো কথা মুখে প্রকাশ করতে সে নাকি নারাজ, সে নাকি পছন্দ করে না ও-রকম বেহায়াপনা। ভিতরটা এক এক সময় হয়তো বলি-বলি করে ওঠে, কিন্তু ভাষা দিয়ে সেই বলা সাজিয়ে বা'র করা তার নাকি সাধ্য নয়। সে এমনি বসে থাকে বটে, এমনি নির্লিপ্ত, নির্বিকার ; কিন্তু তার মনের চাহিদা নাকি আছে। সেটা কি ? সে কথা এখন থাক্। মনোহর এখন তা বলতে রাজি না।

মনোহর বলল, ব্যবসা করার জন্যে পান-বিড়ি রাখতে বলছিলেন না সেদিন ?

বললাম, হ্যাঁ, বলেছিলাম। অন্যায় হয়েছিল নাকি ?

—অন্যায় নয়। আমার এ-দোকান ঠিক ব্যবসা হিসেবে করা নয় কিনা।

—তবে ?

—এটা আমার সাধ, এটা আমার ইচ্ছে।

কিছুই বোঝা গেল না। সব রেস্ত উপুড় করে ঢেলে দিয়ে মাসে পঞ্চান্ন টাকা করে ভাড়া গুনে এ আবার কোন্ ধরনের সাধ, আর কোন্ দেশী আহ্লাদ, ঠিক বুঝে উঠলাম না।

বিরক্ত হয়েই হয়তো বললাম, চিমটে নিয়ে বেরিয়ে পড়, সংসারের মায়া ছেড়ে দাও, মনোহর। সংসারী জীবের মুখে অমন কথা মানায় না।

মনোহর একথা শুনে রাগের বদলে হাসল, বলল, ইচ্ছে আছে।

—কিসের ইচ্ছে।

—এই যে বললেন, চিমটে নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

দিনের পর দিন গত হয়। মনোহর ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলে একটানা। কোনো দিকে কোনো, বড় রকমের দূরের কথা, ছোট ধরনের উৎসবের বা

অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখি নে। কিন্তু রোজ সে বসে থাকে একভাবে। আলমারি ঝেড়ে সাফ করে, ফুলদানির ধুলো পরিষ্কার করে; তার যা আছে তা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখবার দিকে তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

—কোনো কনট্রাক্ট পেলে না?

মনোহর কি-যেন ভাবছিল, চমকে উঠে বলল, কিসের কনট্রাক্ট?

—বড় রকমের কিছু। তোমার হাতের কাজ দেখার জন্যে সত্যিই ব্যস্ত হয়েছি।

মনোহর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, পাব, পাব। পেতেই হবে একদিন।

—আমাকে ডেকো কিন্তু। তুমি আর্টিস্ট, কোনো কদর হল না দেখে সত্যি বড় আপসোস হয়।

মনোহর আড়চোখে কেবল একবার তাকাল আমার দিকে। কিছু বলল না। তাকে আজ যেন একটু চিন্তিত আর একটু চঞ্চল দেখলাম। বড় কোনো কনট্রাক্ট পাবার কথা হয়তো হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে এখনি তা ফাঁস করতে হয়তো চায় না। তার আলমারিগুলোর জিনিসপত্র আজ যেন একটু নতুন করে গোছানো দেখলাম। এটা আমার চোখের ভুল কিনা তা অবশ্য বলতে পারি নে।

নিয়ন-আলোর ছায়া এসে পড়ল মনোহরের চোখে। এতক্ষণ বাতিটা নেভানো ছিল হয়তো, এবার বুঝি জ্বলল। ঘাড় ফিরিয়ে অত উঁচুতে তাকালাম না। মনোহর বুকের মধ্যে জড়ো করা হাঁটু দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? আমারও আগে খুব বেড়িয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছিল। কিন্তু এই দোকান খোলা এস্তোক একেবারে বাঁধা পড়ে গেছি।

মনে হল, ও যেন একা থাকতে চায় এখন।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, লেকের হাওয়া খেয়ে আসি একটু। গরমও পড়েছে খুব।

দোকান থেকে বেরবার সময় নিয়ন-আলোর দিকে একটু তাকিয়ে নিলাম। চারতলার বাইরের দেয়ালে একা-একা একটা আলোর নল জ্বলছে।

সেদিন সন্ধ্যের পরে মনোহরের দোকানে এসে দেখি, দোকান ফাঁকা। নড়বড়ে টেবিলের ওধারটা একেবারে শূন্য—মনোহর নেই। মনোহর তো নেইই, তার দোকানের মালপত্রও নেই একটাও। আলমারির তাকগুলোও সব খালি।

দুই হাত দুই কোমরে দিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, লোকটা হঠাৎ হয়তো ভুল বুঝতে পেরেছে তার। বোঝা মাত্র মালপত্র বেচে দিয়ে হয়তো হাওয়া হয়ে গেছে সে। হঠাৎ মনটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করব, এমন লোক নেই আশেপাশে। দরজা এমন হাট করে খুলে রেখে চলে যাবার হেতু বোঝা গেল না, দোকানে এখনো ফারনিচারগুলো তো আছে!

হঠাৎ চোখ পড়ল ওপাশে। নিয়ন-আলোর বাড়িটার দিকে। ঘাড় তুলে তাকাতে হল। আলোর যেন ফুলঝুরি একটা। নানা আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে চারতলার ছাদ।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। নানা রকম অনুমান আর আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু। হতেও পারে, এ হয়তো মনোহরেরই হাতের কাজ। বড় কনট্রাক্ট এবার হয়ত সে সত্যিই পেয়েছে তাহলে। বাইরের সাজ তবু একটু দেখা গেল, ভিতরটা সে কিভাবে সাজাল, সেইটে জানার ইচ্ছে হতে লাগল।

যাক্ গে। কোমর থেকে হাত দুটো নামিয়েই হন হন করে হাঁটা দিলাম। অনেকটা চলে গিয়েও একবার পিছন ফিরে তাকালাম। উঁচু বাড়িটার আলোকসজ্জা এখান থেকেও দেখা যায়।

পরদিন মনোহরের খোঁজে গিয়ে দেখি, মনোহর নেই। কিন্তু দোকান তেমনি হাঁ করে খোলা। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দোকানের সামনে পায়চারি

করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও কারো দেখা পেলাম না। রোদও ক্রমশ কড়া হয়ে উঠতে লাগল। চলে যাব বলে ঠিক করছি, এমন সময় দেখি মনোহর। চওড়া রাস্তার ওপাশ থেকে গোল পার্কের গা ঘেঁষে সে আসছে।

হাতের সিগ্রেট মাটিতে ফেলে জুতোর মাথা দিয়ে ঘষে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

মনোহর হাত তুলে ইশারা করে হাসতে হাসতে কাছে এল। তার চুল রুক্ষ, দু চোখ লাল।

ব্যস্ত হয়েই বললাম, ব্যাপার কি?

মনোহর বলল, কাল দেখেন নি? আপনাকে খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। এক হাতে কাজ, এত বড় বাড়ি!

—কনট্রাক্ট নিয়েছিলে বুঝি?

মনোহর হেসে মাথা নাড়ল।

—কত টাকার?

মনোহর বলল, বড় রোদ। ভিতরে আসুন।

ভিতরে গিয়ে বসলাম মুখোমুখি। এক দৃষ্টে তাকাতে লাগলাম তার মুখের দিকে আর আলমারিগুলোর দিকে।

মনোহর বলল, কিছু নেই। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছি। অত বড় বাড়ি সাজানো চাট্টিখানি কথা নাকি? সারা রাত জেগে। মাথা ঝিমঝিম করছে এখন।

—পাচ্ছ কত। বেশ মোটা দাঁও মেরেছ মনে হচ্ছে।

মনোহর বলল, কি জানি। ওসব কোনো কথা হয় নি। বহুকেলে চেনা বাড়ি। একটু এগিয়েই কক্‌লার লেন, ওখানে পাশাপাশি থাকতাম। হঠাৎ ওরা বড়লোক হয়ে গেল। তাই কেমন উল্টে-পাল্টে গেল সব—সব ভেস্তে গেল, মশাই।

মনোহর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। মাথা তুলে ও বলল, কাজটা দেখলেন না আপনি এই আক্ষেপ থেকে গেল কিন্তু। প্রাণ ভরে সাজিয়েছিলাম, সবাই খুব তারিফ করল।

—কিন্তু ভেস্তে গেল বলছিলে যে।

মনোহর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল যেন, বলল, ভেস্তে গেল না? ওরা বড়লোক হয়ে গেল, তফাত হয়ে গেল, আলাদা হয়ে গেল, অন্যরকম হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে বললাম, উৎসবটা ছিল কি ওদের? বিয়ে নাকি?

উঠে দাঁড়াল মনোহর, বলল, না, শ্রাদ্ধ। ন্যাকামি করছেন কেন বলুন তো! কাল পূর্ণিমার বিয়ে হল?

মনোহর টেবিলটা ঘুরে আমার পাশে এসে বসে বলল, হঠাৎ লাখ টাকা পেলেই মানুষ বদলে যায়, আগের কথা বিলকুল ভুলে যায় একেবারে। তাই টাকায় ঘেন্না ধরে গেছে, এক কানাকড়িও নেব না ঠিক করেছি। ওই যে নামটা বললাম, যার বিয়ে হল কাল, তার বদল যদি দেখতেন—চমকে যেতেন মশায়। আমাকে যেন চেনেই না আর, কিন্তু একদিন ভয়ানক চিনত। সে সব কথা তো বলে লাভ নেই আর। আমি যে বদলাই নি, তা প্রমাণ দিয়ে এলাম ওই বাড়ি-ঘর সাজিয়ে—আমি কালও যা ছিলাম, আজও তাই আছি। আমি মনোহর ডেকরেটর।

—কিছু বল নি, কোনো দিন?

—কিছু না। এইখানে বসে চুপচাপ শুধু দেখেছি দুনিয়ার রং-বদল। কেমন একটা মায়া, কেমন যেন একটা টান। কিন্তু এবার সব খতম। আমার ছুটি।

এর পর মনোহরের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। শুনেছি, মালপত্তর ফিরিয়েও নাকি আনে নি সে। তার দোকান-ঘরটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। গ্রামোফোনের দোকান বসেছে সেখানে। মস্ত একটা চোঙ লাগিয়ে সারাদিন

রেকর্ড-বাজানো হয়। চোঙটা হাঁ করে থাকে সামনের চারতলা বাড়িটার দিকে। নানা ধরনের হাহাকার আর কান্নার গান বাজতে থাকে একটানা। অনুনয় অনুযোগ আর অনুরাগে রেকর্ডগুলো যেন ভরপুর। পাড়াটা মাতিয়ে দেয় একেবারে।

একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই গান শুনছিলাম। মনে হল, যেসব কথা মনোহর মুখ ফুটে কখনো বলতে পারে নি, তাই যেন আক্রোশের সঙ্গে আজ জানানো হচ্ছে। মনোহরই যেন ওই চোঙের মধ্যে দিয়ে ওই বাড়িটার দিকে তার মনের আক্ষেপগুলো লাগারে নিক্ষেপ করে চলেছে, কেন যেন এমনি মনে হল আমার।

পাখোয়াজ

বাঘের মত চেহারা। দুটো কব্জি যেন লোহার দুটি মোটা পাত—চওড়া আর মজবুত।

যেমন শিকারে, তেমনি সঙ্গীতে, যেমন তেজে, তেমনি তোম্বিতে, ইন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন চৌকশ। দাপটে আর প্রতাপেও কম নয়।

অনুরাগ নেই এমন বড়-একটা বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বাগান-বাগিচায় যেমন মন, মোটরের ইঞ্জিন-মেরামতে মনোযোগ ঠিক সেই অনুপাতে। পাখি ভালোবাসেন তিনি, পাখি পোষেন, পাখি শিকারও করেন। রক্তাক্ত-কলেবর হরিয়াল মেরে এনে ময়নার খাঁচার নীচে রেখে পোষা পাখিকে পড়ান, 'বল কৃষ্ণ হরে হরে।'

পাখি বলে। বিকট হাসি হেসে উঠে ইন্দ্রপ্রতাপ বলেন, 'হরিয়ালের রোস্ট খাব আজ।'

মহকুমা শহর। লোকের বাস অনেক—হাজার তিরিশের মত। এই তিরিশ হাজার লোক ভয়ে কাঁপে ইন্দ্রপ্রতাপের নামে। কাউকে কোনো দিন ভয় দেখান নি তিনি, তবু এ ভয় কেন? তাঁর টাকা অঢেল, স্বাস্থ্য অতুলনীয় আর চেহারাটা বাঘের মত। অনেক বাঘ মেরেও এনেছেন তিনি।

সত্যিই লোকটা পাখোয়াজ। সঙ্গীতের আসরে বসে তিনি পাখোয়াজ বাজান না, পেটেন। গলা সিংহের মত ভারী। এমন গলায় ধ্রুপদ ছাড়া খাপ খায় না অন্য কোনো গান। তিনি ধ্রুপদই গেয়ে থাকেন। সবাই বাহবা দেয়।

নতুন এস. ডি. ও. এলে প্রথমে এসে নমস্কার জানিয়ে যায় ইন্দ্রপ্রতাপকে।

ইন্দ্রপ্রতাপ বলেন, 'ভয় কি! কাজ শুরু করুন। রুল করতে হলে রুড হতে হবে, খেয়াল রাখবেন।'

এর আগের জনা তিনেক এস. ডি. ও. এই উপদেশ নীরবে শুনেছে। এবারকার এস. ডি. ও. চিন্তাহরণ চাকী কথাটা শুনেই বলল, 'আপনার ওপর কি রুড হওয়া সঙ্গত হবে?'

বাঘের মত তাকিয়ে ইন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'অর্থাৎ?'

এস. ডি. ও. চাকী বলল, 'রুল করতে তো হবে।'

লোকটার রসজ্ঞান আছে। মোক্তার বিরিঞ্চি বটব্যাল পাশে ছিল, মুখ আড়াল করে লুকিয়ে হাসল। এমন কথা এই প্রথম শুনল তারা। ইন্দ্রপ্রতাপকেও রুল করতে চায়, এমন হাকিম এর আগে কেউ আসে নি।

বটব্যাল হাসল বটে, কিন্তু তারও বুক শুকিয়ে উঠল। এটা ভীমরুলের চাক, না, মৌমাছির চাক—বোঝা গেল না। মুখে মোলায়েম হাসি, কিন্তু কামড়টা দিতে ছাড়ল না চিন্তাহরণ চাকী।

বটব্যাল বুড়ো লোক। অনেক কালের ঘাগী। পশার জমাট, প্রতিপত্তি অল্পবিস্তর আছে। ইন্দ্রপ্রতাপকে সেও ভয় করে, কিন্তু ভয় করতে তার ইজ্জতের কোথায় যেন বাধে। তার কাছে তাই হাকিমের উক্তিটা খুবই মুখরোচক লাগল। আড়চোখে সে তাকাল ইন্দ্রপ্রতাপের দিকে। কিন্তু বুকটা শুকিয়ে উঠল তার। ওপরালা আর সদরালারা এই লোকটার হাতের, হাকিমকে সে হুট-আউট করে দিতে পারে—এমন সম্ভাবনাও আছে। মোক্তারের ভয় হল এই কথাটা ভেবেই বেশি। এমন কড়া লোকটাও যদি খসে যায়, তাহলেই সব যাবে চুকে। বরাতে বিধি যখন মিলিয়েছে এমন এস. ডি. ও. —তখন সে যাক্, বটব্যালের মনে মনে এমনি ইচ্ছে।

দুটি সিংহ বিকট হাঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফটকের দু' পাশের দুটি থামে। বেরোবার সময় বটব্যাল একবার সেদিকে তাকাল।

এস. ডি. ও.র গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে, বটব্যাল এগিয়ে গেল, প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বলেছেন ঠিক। কিন্তু বলাটা কি ঠিক হল? ও যে একটা ঘুঘু চিন্তা তো হরণ করে গেলেন না সার্, চিন্তা হে বাড়িয়েই তুললেন।'

হাকিমী গলায় চাকী বলল, 'কিসের কথা বলছেন?'

'না কিছু না।' বিরিঞ্চি বটব্যাল সরে এল।

হুস করে বেরিয়ে গেল চিন্তাহরণের গাড়ি। লাল শুরকির রাঙা ধুলো ছেঁকে ধরলো বটব্যালকে।

ছোট মহকুমা। নাম নবগ্রাম। কিন্তু ইন্দ্রপ্রতাপের প্রতাপও ছোট নয়, তার দাপটেও নতুনত্ব নেই কিছুই।

বিরিঞ্চি প্রাচীন লোক। কিন্তু তারও মনে হয়, তার জ্ঞান হবার পর থেকে সে যেন এই প্রতাপের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ইন্দ্র তো বয়সে তার বড় ছেলের চেয়েও ছোট। কিন্তু তবু কেন যে এই প্রতাপটা এমন পুরাতন বলে ঠেকে, তা কিছুতেই বুঝতে পারে না বিরিঞ্চি বটব্যাল।

সত্যি, লোকটার নাম যে সবাই পাখোয়াজ দিয়েছে, ঠিকই করেছে। শিকার করে, গান করে—সবই করে। কিন্তু সবই কেমন বেখাপ্পা। যখন গান গায়, তখন মনে হয় ছম্রা বন্দুক ছুঁড়ছে। শিকার করার সময় তার মূর্তিটা কেমন হয়, তা কেউ দেখতে যায় নি। তার মাচার সঙ্গী তো আর সকলেই হতে পারে না, সে কেবল জন-কয়েক বাছাই করা লোক নিয়ে বনে ঢোকে।

নবগ্রামে ইন্দ্রপ্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একজন, সে হচ্ছে এই বটব্যাল। মহাল থেকে ইন্দ্রপ্রতাপ বছরে যা খাজনা পায়, আদালত থেকে বিরিঞ্চি নাকি তার কম কামাই করে না। মোক্তার হলে কি হবে, কোনো উকিলের সাধ্য নেই বিরিঞ্চি বটব্যালের উপর টেক্কা দেয়। লোকটা যে অহংকার করে, সেটা কিন্তু মিথ্যে নয়। তার রোজগার অঢেল। কিন্তু ইন্দ্রপ্রতাপের সমান কি না, সে হিসেব কেউ দেখতে যায় নি।

নবগ্রামে নতুন জীবনের প্রেরণা দেখা দেয়। নয়া এস. ডি. ও. মহকুমাটাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে যেন এসেছেন, এমনি মনে হতে লাগল। সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ান তিনি, যেন দেশটাকে সার্ভে করে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে আসেন, বেয়ারা-আরদালীর ধার ধারেন না, মাঠঘাট চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখে এসে আবার গাড়ি হাঁকিয়ে ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে যান।

কি যেন করার মতলব, কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

তাঁর আপিসের জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ সব কেরানিই প্রায় তটস্থ। অনবরত চিঠি ডিক্টেট করছেন তিনি, অনবরত টাইপ করা হচ্ছে, অনবরত ডেস্‌প্যাচ করা হচ্ছে। আসলে তো ক্ষুদে মহকুমা হাকিম, কিন্তু মেজাজটা যেন লাট-বেলাটের মত। কেরানিরা সব কাহিল হয়ে উঠেছে।

মৃগাঙ্ককে আড়ালে ডেকে বিরিঞ্চি বলল, 'অত চিঠি যায় কোথা রে? লিখিস্ কি?'

'হাকিমের হুকুম তামিল করি। চিঠি যায় সদরে।' মৃগাঙ্ক নির্লিপ্ত জবাব দিল। একটু পরে বলল, 'ছোট মহকুমা এবার বড় হবে—তাই এত লেখালেখি।'

'কত বড় রে, সদরেয় চেয়েও বড় নাকি?' টিপ্পনি কাটল বিরিঞ্চি।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল না।

নবগ্রামে যেন কুজ্ঝটিকা নেমেছে। যেন ওই কুয়াশার আড়ালে একটা ভয়ংকর পরিবর্তনের মহড়াও চলেছে, এইরকম অনুমান করে সকলে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাধ্য নাই কারো।

নতুন হাকিমের মেজাজ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। হালুইকরের দোকানেও এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়, বান্ধব-মন্দির ক্লাবেও রিহার্সেলের ফাঁকে ফাঁকে চিন্তাহরণের প্রসঙ্গ ওঠে। কিন্তু একজন মাত্র এইসব প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে একেবারে তফাতে রেখেছে। সে ইন্দ্রপ্রতাপ।

ইন্দ্রপ্রতাপ বন্দুকের নল সাফ করছিলেন, আর ভাবছিলেন, হাকিমের সেদিনের সে কথাটার অর্থ কি। ভাবতে ভাবতে হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার উপর আঙুলের চাপ পড়ে থাকবে, শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। চমকে উঠেই নিজের মনে হাসলেন। তাঁর এভাবে চমকে ওঠাটাই তাঁর কাছে চমক বলে ঠেকল। জীবনে হয়তো এটা তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা।

দেয়ালে তেলছবি টাঙানো। ওটা যেন ছবি না, ওটা ইন্দ্রপ্রতাপের অবিকল ছায়া। একবার সেদিকে তাকালেন তিনি। আশ্চর্য ঠেকল তাঁর। ওই ছায়া কথনো কেঁপে উঠতে পারে, এ বিশ্বাসই যেন হল না তাঁর। একদৃষ্টে ছবিটা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিক্রম বেশি কার, ওই ছবিটার, না, তাঁর নিজের? ওই জ্বলন্ত চোখ-দুটোর দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে মাথা যেন ঝিমঝিম করে ওঠে তাঁরও।

ছবিতে যদি এই তাপ, তাহলে আসল মানুষটার চোখের উত্তাপ কতটা, তাই ভাবছিলেন তিনি। এমন সময় কি যেন মনে পড়ে গেল।

টেবিলের উপর আধ-ভাঙা বন্দুকটা ফেলে তিনি বড় আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চুল বুরুশ করে নিলেন। ডাকলেন, 'মতিয়া।'

তেতলার বারান্দায় কাকাতুয়াকে খাবার দিচ্ছিল সে। এটা তার কাজ নয়, এর জন্যে লোক আছে আলাদা। কিন্তু মাতিয়া হয়তো অবসর-বিনোদন করছিল। তার কাজ বাঁধা। হঠাৎ হাঁক শুনে সে তরতর করে নেমে এল।

ভয়ংকর মূর্তিটা সম্মুখে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'কি করছে?'

'কিছু না, বসে আছে।'

'খবর দাও। আমি যাব।'

বাঁদী চলে গেল।

ইন্দ্রপ্রতাপ একটু বাদে উপরে উঠলেন। সিঁড়ির দু'পাশের দেওয়াল যেন তাঁর শিকারের অ্যালবাম। কালাহাণ্ডির বাঘ-শিকারের দৃশ্য, আসামের জঙ্গলে

গণ্ডারের খোঁজে চলেছেন—তার ছবি, রাজাভাতখাওয়ার তাঁবুর, জয়ন্তী পাহাড়ে হরিণ-শিকার—সব এনলার্জ করে টাঙিয়ে রেখেছেন রুপালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে। ওঠবার সময় ছবিগুলির দিকে একবার তাকালেন মাত্র। নিজের বীরত্বে নিজেই যেন বিভোর হয়ে গেছেন তিনি।

সাজানো ঘর। ফরাস আছে, সোফাও আছে, আলমারি আছে, দেরাজ আছে। একটা দেয়াল বই দিয়ে ঠাসা। বইয়ের আলমারির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তার-ছেঁড়া একটা এস্রাজ।

'আসতে বল।'

ইন্দ্রপ্রতাপের গৃহের আর হৃদয়ের নেপথ্য এই জায়গাটা। ইঁট আর প্রাচীর দিয়ে তিনি এই এলাকাটা যেমন রেখেছেন আড়াল করে, তাপ আর দাপট দিয়ে তেমনি এটা আড়াল করা আছে। মতিয়াও খোঁজ রাখে না সবটুকুর।

'বসো।' ইন্দ্রপ্রতাপ একটু সরে বসলেন। সামনের আয়নাতে তাঁর মুখের ছায়াটা দেখা যাচ্ছিল, নিজের সে ছায়া দেখে হয়তো সংকোচ হল তাঁর। আর একটু সরতেই ছায়াটাও আড়ালে চলে গেল।

'কিছু ঠিক করলে?'

'না।'

গুণ-কাটা ধনুকের মত সটান সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ইন্দ্রপ্রতাপ। হন হন করে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মতিয়াকে বললেন, 'আরও সময় দিলাম, ব'লো।'

দোতলার বারান্দায় খাঁচার মধ্যে টিয়াটা অকারণে বাড়ি ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল। সেই শব্দে কাকাতুয়া শেকলে বাঁধা পা আছড়াতে আছড়াতে, পাখার ঝাপট দিয়ে, দাঁড়সুদ্ধ উড়ে যাবার জন্যে যেন ছটফট করতে লাগল, আর একেবারে নীচের তলায় ময়না বলে উঠল, 'বল কৃষ্ণ হরে হরে'।

সারা-বাড়ির নিস্তব্ধতা এক নিমেষে চুরমার হয়ে গেল।

ইন্দ্রপ্রতাপ বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন। তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল, তাক্ করে তিনি ওই তেলছবিটার বুক ফুটো করে দিয়ে ওর ওই দাপটটা খান খান করে দেন।

সন্ধ্যেয় গানের আসর বসে। এ আসরে গাইয়েও দু-চারজন আসেন, কিন্তু তাঁরা কেউ গলা খুলতে রাজি হন না। তাঁরা সবাই সমজদার হয়ে বসে থাকতেই ভালোবাসেন। ইন্দ্রপ্রতাপের এতে কোনো আপত্তি নেই। কোলের উপর পাখোয়াজ তুলে নিয়ে তিনি পিটতে শুরু করেন, ওদিকে মহেন্দ্রবাবু ও যদু পণ্ডিত দুজন দুটি তানপুরা নিয়ে বসে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তোলে।

এই নাকি ভালো লাগে ইন্দ্রপ্রতাপের। এমনি পাখোয়াজ বাজিয়ে গাওয়া। যাতে হাতের জোর দরকার হয়, শরীর চালানো যায়। তানপুরার তারে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে যাওয়াটা তাঁর পছন্দ নয়।

ইন্দ্রপ্রতাপ ধ্রুপদ আলাপ করেন, তার পর গান ধরেন—

এক রাজার ছেলে

যাত্রা করে বেড়ায়—

এটা যেন তাঁর মস্ত আক্ষেপ, এমনি চোখ-মুখের ভাব করে তিনি সখেদে উচ্চারণ করেন গানের কলি। এ ছাড়া অন্য কোনো কলি আর বার হয় না মুখ দিয়ে। এই একটা লাইন ঘণ্টার পর ঘণ্টা উচ্চারণ করে সঙ্গীতের আসর জাগিয়ে রাখা হয়।

তবলচি হীরুবাবুর হাত অবশ হয়ে যায়। কিন্তু ইন্দ্রপ্রতাপের গলায় ক্লান্তি নেই, হাতেও ক্লান্তি নেই।

তেতলার ঘরেও এই আওয়াজ গিয়ে পৌছয়। কিন্তু এর সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয়তো হয় না সেখানে।

সিলিঙে ঝাড় আলো ঝুলছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে ইন্দ্রপ্রতাপের স্ত্রী অলকা। ঘরের একটি কোণে আলোর নীচে বসে মতিয়া তুলসীদাসের পাতা ওলটাচ্ছে।

'পাখোয়াজ থেমেছে, মতিয়া ?'

মতিয়া মাথা তুলেই উঠে এল কাছে, 'কিছু বললে মাঈজী ?'

'পাখোয়াজ থেমেছে ?'

কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আওয়াজ তো আর শুনছি নে।'

বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে অলকা হাসল, বলল, 'তবে হয়তো থেমেছে।'

'কেন মাঈজী ?'

'না, কিছু না।'

মতিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পালঙ্কের পাশে, কি-যেন জিজ্ঞাসা করতে চায় সে।

'কিছু বলছিস ?'

'হাঁ, মাঈজী। বাবুজী কিসের সময় দিয়ে গেল আজ ?'

পাশ ফিরে শুলো অলকা, বলল, 'কিছু না। ক মাস হল তোর এখানে ?'

'তিন মাহিনা এই হবে।'

'তবে এবার তোর চাকরি গেল।'

শব্দ করেই হেসে উঠল অলকা।

কিছু বুঝল না মতিয়া। চাকরি সে করছে, কিন্তু কিসের চাকরি আর কেন চাকরি তা সে বোঝে না আদপে। একটা মেয়েমানুষকে আগলে বসে থাকা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। এই কাজের জন্য যা সে মাইনে পায়, তাও তো কাজের অনুপাতে কম নয়। এমন চাকরিটা চলে যাবে, এ সংবাদে সে চিন্তাতেই পড়ল।

কিন্তু কেন যাবে না চাকরি ? ইন্দ্রপ্রতাপ তো অনবরত লোক বদলাচ্ছে। এ পর্যন্ত কত জন এল, কত জন গেল—কাউকেই তিন মাসের বেশি রাখা হয় নি। লোক পুরনো হয়ে যাক, এটা বুঝি চান না ইন্দ্রপ্রতাপ।

খটকা লেগে গেল মতিয়ার মনে। মাঈজী হাসে কেন। বাবুজী এক রাতেও উপরে আসবে না ; শুধু নীচে বসে বসে পাখোয়াজ বাজাবে এমনি করে। কেন ?

মতিয়া সারারাত ঘুমল না। চুপ করে বাবুজী আসে কিনা, তাই দেখার জন্মেই হয়তো ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। কিন্তু কেটে গেল রাত। কেউ এল না।

আবার দিনের আলো আসে। কেটে যায় আবার একটা রাত্তির। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে অবসাদ কাটাবার একটা সুযোগ যেন আসে অলকার।

চুলের বন্যা পিঠ ডিঙিয়ে প্রায় পা পর্যন্ত এসে নেমেছে। এই চুল বাগিয়ে ধরে আঁচড়ানো মতিয়ার সাধ্যের যেন বাইরে। ধীরে ধীরে সে আঁচড়ায়, নিপুণ হাতে মোটা বিনুনি বেঁধে তোলে একটা। পিঠের উপর টান হয়ে পড়ে থাকে যেন একটা অজগর।

মতিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, নোকরি যাবে কেন। বাবুজীকে বুঝিয়ে বলে তার চাকরিটা রাখতে পারবে কি না অলকা। অলকা কি তার কাজে সন্তুষ্ট নয়? যাতে কোনো রকম অসুবিধা অলকার না হয়, তার জন্যে সে তো মেহনত করছেই।

'আমি রাখার কে রে মতি। আমিই যে বন্দী।' অলকা মাথা নীচু করে বলে।

মতিয়া উঁকি দিয়া মুখ দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু দুই হাটুর মধ্যে পুরো মুখটা লুকানো। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, বাবুজী কি গোসা হয়েছে মাঈজীর উপর।

'ভীষণ গোসা রে, ভীষণ গোসা।'

নিশ্বাস ফেলে মাথা তুলল অলকা।

দোতলার বারান্দায় টিয়া পাখিটা পাখা ঝাপট দিয়ে খাঁচার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে হয়তো। তার শব্দ পেয়ে মতিয়া চকিত হয়ে উঠল। না, বাবুজীর পায়ের শব্দ নয়।

মহকুমায় নাকি রেল আসবে। আর করতোয়ার মরা স্রোত বাঁচিয়ে তোলার জন্যে নাকি বাঁধ বাঁধার আয়োজন চলছে সদরে। হরিণখালি থেকে স্রোত নবগ্রামের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ আথ আর আউসবনে অদৃশ্য হয়ে গেছে মনোহরডাঙার কাছে। ওই স্রোতকে টেনে আনতে পারলে নবগ্রাম নাকি বেঁচে উঠবে।

হাকিমের নাকি উৎসাহ এ কাজে বেশি। নবগ্রামে নতুন এসে এর উপর এত টান হল কি করে লোকটার, তাই সকলে ভাবে। লোকটা কর্‌িৎকর্মা বলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। যেটুকু সে করছে, তার চেয়েও বেশি তার নামে চালু হয়ে যেতে লাগল।

নবগ্রাম তাহলে বেঁচে উঠবে কি সত্যিই? একটা নিভৃত নেপথ্যে এতদিন কাটিয়ে এসেছে এই মহকুমা। কতকাল আগে তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু এককালে করতোয়া নাকি এই নবগ্রামের গা দিয়ে বয়ে যেত। তার পর অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই অদৃশ্য স্রোত আবার নাকি টেনে তোলা হবে।

বিরিঞ্চি বটব্যালের উৎসাহের শেষ নাই। বৃদ্ধের মনেও যেন ফুতি এসে গেল যৌবনের। রেল হবে, গঞ্জ হবে—লোক বাড়বে, মামলা বাড়বে, তাহলে তো পসারও বেড়ে উঠবে তার আরো। ইন্দ্রপ্রতাপের ঐশ্বর্যের অহংকার চূর্ণ তাকে করতেই হবে।

সেদিন সংগীতের আসরে যদু পণ্ডিত কথা পাড়লেন। বললেন, 'নবগ্রামের এবার নাকি হাল ফিরবে।'

মহেন্দ্রবাবু তানপুরায় সুর বাঁধছিলেন, হঠাৎ সুর কেটে গেল যেন, বললেন 'হাল ফিরবে? বল কি হে, ছিল আধা শহর, এবার পুরা শহর বানানোর ষড়যন্ত্র চলেছে। যে স্রোত মরে গেছে, তাকে যেতে দাও—তাকে খুঁচিয়ে ঘা করা কেন?'

'গঞ্জ হবে যে হে।'

হীরুবাবু তবলায় চাঁটি দিয়ে বললেন।

মহেন্দ্রবাবু ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'গাঁয়ের গঞ্জনা বাড়াতে এসেছে এই হাকিম।'

ইন্দ্রপ্রতাপ মন্তব্য করলেন এতক্ষণে, বললেন, 'সব কথাতে হাকিমের কথা ওঠে কিসে? সামান্য একটা তো এস. ডি. ও.—তার আবার ক্ষমতা কি? উপর থেকে হুকুম আসছে, সে চাকরের মত খেটে মরছে। আপনারা ভাবছেন, লোকটা একটা লাট-বেলাট।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'অন্ততঃ মেজাজটা তাই।'

সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে।

বছর ঘুরে গেল। রেলের লাইনও এগিয়ে এল না, করতোয়ার স্রোতও মাটি ফুঁড়ে দেখা দিল না। কিন্তু হাকিমের কাজের কোনো কামাই নেই। চরকিবাজির মত সারা শহরে সে ঘুরে বেড়ায়। লোকটার মনে হয়তো ক্লল করার চরম আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।

সেদিন দেখা গেল, ইন্দ্রপ্রতাপের বাড়ির সামনে তার গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুজনের মধ্যে তাহলে বুঝি ভাব হয়ে গেল, দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন বিরিঞ্চি।

'কি বলে ও?'

গানের আসরে যদু পণ্ডিত প্রশ্ন করল।

ইন্দ্রপ্রতাপ কোলের উপর পাখোয়াজ বাগিয়ে জুৎ করে বসতে বসতে বললেন, 'বলবে আর কি? বলে, টাকা। ভিক্ষে চায়।'

'ভিক্ষে কিসের?'

'বাঁধ। লোকটা ম্যাজিক দেখাতে এসেছে মনে হয়।' ইন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'যে স্রোত মরে সাফ হয়ে গেছে, সেই স্রোত নাকি ও খুঁজে বার করবেই। করতোয়াকে নাকি জাগাবে। হাসি পায় যদুবাবু। বয়সটা কাঁচা, তাই স্বপ্নটাও বড় রঙিন।'

'ঠিক।'

তবলায় যেন ঠিক সমের মুখেই ঘা দিলেন যদু পণ্ডিত।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'বেশি বয়স পর্যন্ত ব্যাচিলার থাকাটাও মাথার পক্ষে ঠিক না। ওতে মাথার একটু গোলমাল হয়ই।'

'হয়েছেও তাই। কিন্তু কথা দিয়েছি, দেব কিছু।'

গান ধরল ইন্দ্রপ্রতাপ—

রাজার ছেলে
যাত্রা করে বেড়ায়।...

মাঝরাত পর্যন্ত চলল গানের মহোৎসব। তেতলার পালঙ্কে গিয়ে সে আওয়াজ আঘাত করতে লাগল। কিন্তু এ আঘাতে পোষা পাখিদের চোখের তন্দ্রা কাটল না।

মতিয়া ডাকল, 'মাঈজী।'

অলকা জবাব দিল না। চোখ দুটো তার ভারী হয়ে আছে। মন তার গুমট। আজ তিন বছর শেষ হল। তিন বছর আগে এমনি এক রাতে তাকে নিয়ে এসেছে ইন্দ্রপ্রতাপ। এই তিনটি বছর তার কাছে একটা লম্বা দুঃস্বপ্নের মত হয়ে আছে। চোখ থেকে ছিঁড়ে নামিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না সে স্বপ্নটা। ইন্দ্রপ্রতাপের কঠিন চোখের দৃষ্টি তার কাছে জ্বলন্ত দুটি অঙ্গারখণ্ডের মত ঠেকে। সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মনে মনে ভেবেছে, একটা আপস করা যায় কি না, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে সে পারছে না।

মতিয়া সাড়া না পেয়ে আর ডাকল না। ওপাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তার পর ঘুমিয়ে পড়ল অকাতরে।

সিঁড়িতে শব্দ পেয়ে অলকা উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে রইল। শব্দটা ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠে এল কাছে। চোখ খুলতে ভয় করছিল অলকার। কিন্তু সে তাকাল, দেখল, ভীষণাকৃতি সেই লোকটা দাঁড়িয়ে, চোখ দুটি জ্বলছে অঙ্গারের মত।

ইন্দ্রপ্রতাপ সংক্ষেপে বললেন, তিন বছর আজ শেষ। দিনটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। তাই—

কোনো জবাব না পেয়ে ইন্দ্রপ্রতাপ আশ্চর্য হলেন। কিন্তু দাঁড়ালেন না আর।

ইন্দ্রপ্রতাপেরও তাহলে মন আছে? সে মনে বছরের হিসাবের দাগ তাহলে পড়ে? আশ্চর্যই ঠেকে অলকার। তার পল্লীর নীড় থেকে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে এসে মস্ত বীরত্ব জাহির করেছেন যিনি, সেই বীরকে মাঝরাতে পা টিপে পা টিপে তার কাছে আসতে হল—এইটে বড় অবাক লাগল অলকার। কোথায় সেই মহেশতলা, আর কোথায় এই নবগ্রাম। অলকা প্রথমদিকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছে ইন্দ্রপ্রতাপকে, বলেছে, সাধারণ মেয়েলি কান্না কেঁদেই সে বলেছে, 'আমায় রেহাই দিন।'

'কেন?'

'সে কথা জানতে চাইবেন না। সে বড় কঠিন কথা।'

'জানাতে হবে।'

অগত্যা সে জানিয়েছে, বলে দিয়েছে যে, সে ভালোবেসেছে একজনকে।

'কে সে?'

একথাটা কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুতে বলাতে পারেন নি ইন্দ্রপ্রতাপ। দিনের পর দিন শুধু সময়ই দিয়ে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু সে সময়ের সবই অপচয় হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন ইন্দ্রপ্রতাপ অবাক হাঁক দিলেন, 'মতিয়া'।

মতিয়া ছুটে এল, 'হুজুর। বাবুজী।'

'খবর দাও। আমি যাব।'

উপরের ঘরে গিয়ে সমুখের আয়না বাঁচিয়ে সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন তিনি। অলকা ধীরে ধীরে এসে পাশে বসল।

'চোখে জল কিসের?'

'আনন্দের।'

'কিসের আনন্দ?'

'আপনি খবর দিলেন।'

ইন্দ্রপ্রতাপ নড়ে বসলেন, ক্রূর হাসি হেসে বললেন, 'কিছু ঠিক করলে?'

'করেছি। আর ক'টি দিন সময় দিন।' অনুনয়ের সুরে বলল অলকা, 'মাত্র আর ক'টা দিন।'

মেয়েটার সুর তবে বদলেছে। নরম তাহলে হয়েছে অনেকটা। এতে ইন্দ্রপ্রতাপ কিছু স্বস্তিবোধ করলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে আতঙ্ক আর উদ্বেগ যেন বেড়ে গেল। কী ভয়ঙ্কর কথাটা যে শোনাবে মেয়েটা, এই হল তাঁর ভয়। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে হবে। এই তিনটি বছর যে পীড়নে পীড়ন করেছে, সে পীড়নের প্রতিহিংসা তিনি নেবেন। এ সঙ্কল্প দৃঢ় হল তাঁর।

অলকার দিকে একবার তিনি তাকালেন। আর একবার তাকালেন বইয়ের আলমারির দিকে, তার-ছেঁড়া এসরাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ওটা বাজাও না?'

অলকা অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে রইল, তার পর মাথা নেড়ে জানাল—না।

চুলের বন্যাই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। মহেশতলার হনুমানজীর আখড়াই তার কাছে একটা অভিশাপ। পিঠময় চুল এলিয়ে দিয়ে থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনছিল কথকতা। এমন সময় কার লুব্ধ দৃষ্টি এসে তার চুলের লূতাজালে জড়িয়ে গেল, তা সে প্রথমে জানতেই পারে নি।

ইন্দ্রপ্রতাপ উঠে গিয়ে এসরাজটা তুলে আনলেন, বললেন, 'ইস্, তার ছিঁড়ে গেছে? আমায় বল নি কেন?'

অলকা ইন্দ্রপ্রতাপের মুখের দিকে তাকাল। কথা বলল না। বাজাবার যদি সাধ তার হত, তাহলে নিজের চুল ছিঁড়ে তা দিয়ে তার বানিয়ে নিয়েই

বাজাতে পারত। কিন্তু শখ যে তার নেই—একথা জানাবার ইচ্ছেও তার হল না।

ইন্দ্রপ্রতাপ নেমে গেলেন। যাবার সময় কোনো কথাই আর বলে গেলেন না। তাঁর মন আজ দমে গেছে কেন যেন, মেয়েটার রূঢ়তায়, না, মৌনতায়—তা তিনি বলতে পারেন না।

নীচে নেমে এসে মতিয়াকে ডাকলেন। মতিয়া ছুটে কাছে যেতেই বললেন, 'ছুটি। আজ থেকে ছুটি তোমার। খাজাঞ্চিবাবুর কাছ থেকে তলব নিয়ে যাও।'

প্রতিবাদ নয়, আবেদন নয়—কোনো কিছুই নয়। মতিয়ার চোখ সজল হয়ে উঠল। আর সে উপরে গেল না। মাঈজীর সঙ্গে শেষ দেখা করে আসার ইচ্ছে হল বটে, কিন্তু মায়া বাড়িয়ে লাভ? মতিয়া নীচে নেমে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

·

সঙ্গীতের আসরে ইন্দ্রপ্রতাপ এলেন রণমূর্তি নিয়ে। গান গাইতে নয়, আজ তিনি যেন এসেছেন যুদ্ধ করতে। আসরে বসেই তিনি কোলে তুলে নিলেন পাখোয়াজ। আজ তাঁর সমস্ত তন্তু ও তন্ত্রী উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। মেয়েটা সময় চেয়েছে আর ক'টা দিন। বেশ।

মহেন্দ্রবাবু তানপুরায় ঝঙ্কার দিতেই গলা খুলে গেল ইন্দ্রপ্রতাপের। পাখোয়াজে করাঘাত করতে করতে গলা ছেড়ে দিলেন ইন্দ্রপ্রতাপ। সেই গম্ভীর গর্জনের ধাক্কায় ঘরের দেয়াল যেন কেঁপে উঠতে লাগল। যদুবাবু আড়-চোখে তাকালেন মহেন্দ্রবাবুর দিকে, কিন্তু মহেন্দ্রবাবুও কিছু বুঝতে পারছেন না নাকি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই আর্তনাদ বেজে চলল একটানা।

রাত গভীর হল ধীরে ধীরে। ইন্দ্রপ্রতাপ ধীরে ধীরে গলা নামালেন, আবার প্রবল আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠে পাখোয়াজে আঘাত করতে লাগলেন। হঠাৎ ফেঁসে গেল পাখোয়াজ শব্দ করে। আচমকা থেমে গেল গান। আসরে

হঠাৎ বিষাদ নেমে এল। একটা বিপর্যয় ঘটে গেল যেন। সকলের মুখের ভাব এমনি।

রাত অনেক বেজে গেছে। কোনো কথা না বলে কোলের উপর থেকে অকেজো পাখোয়াজটা নামিয়ে রেখে ইন্দ্রপ্রতাপ সটান উঠে এলেন তেতলায়। 'মতিয়া' বলে ডাকতে গিয়েই থেমে গেলেন। সে তো চলে গেছে। ভুল হয়ে গেছে ইন্দ্রপ্রতাপের, নতুন লোক বহাল করা হয় নি।

ঘরে উঁকি দিলেন, কাউকে দেখতে পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, পালঙ্ক শূন্য। ডাকলেন, 'অলকা, অলকা।' কোনো সাড়া পেলেন না। পাশের কামরায় এলেন, ঘর শূন্য। ইন্দ্রপ্রতাপের মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে বলে তাঁর বোধ হল। সারা বাড়ি খুঁজেও কোথাও কাউকে পেলেন না তিনি।

দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। সারা মহকুমা এখন ঘুমে অচেতন, একমাত্র ইন্দ্রপ্রতাপই বুঝি একা জেগে। সামনের তেলছবিতে তাঁর যে রূপটা আঁকা আছে সেটা মিথ্যে বলে বোধ হল তাঁর, সেটা ফাঁকি বলে ঠেকল। তাঁর মত একটা অসহায় আর দুর্বলের চিত্র অমন তেজীয়ান কথনো হতে পারে না।

ইন্দ্রপ্রতাপ বন্দুক টেনে এনে লোড করলেন। নিজেকে গুলি করে সাফ করার মত ভীরু কথনো তিনি হন নি, মনের জোর অতটা নিঃশেষ হয় নি। তিনি তাক করে ওই ছবিটার ঠিক বুক লক্ষ্য করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

বন্দুকের শব্দে ছুটে এল চাকর-বাকর, ধীরে ধীরে এসে জমল নবগ্রামের লোক কাতারে কাতারে। বিরাট তেলছবিটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। বন্দুক বাগিয়ে ধরে ইন্দ্রপ্রতাপ বসে সেই দৃশ্যটা দেখছেন। তিনি নড়ছেন না, তাঁর চোখের পলকও পড়ছে না।

পরের দিন হাটে-বাটে-দোকানে ক্লাবে এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। আদালতেও সকলের মুখেই বিষদের ছায়া। কিন্তু উৎফুল্ল দেখা গেল

একজনকে—তিনি বিরিঞ্চি বটব্যাল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ঘায়েল হয়েছে, এইটেই তাঁর কাছে মস্ত সংবাদ। বুড়ো মোক্তারের চোখে-মুখে যেন যৌবনের দীপ্তি ঝিলিক মারছে।

একবার শুধু তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'রেল না বসিয়ে, বাঁধ না বেঁধে হাকিমটা বিনা নোটিশে সটকে পড়ল! এটা কম লোকসান নয়। শহর বাড়বে, লোকজন বাড়বে, পশার বাড়বে—কত ভরসাই করেছিলাম তার উপর।'

ফেরার

পকেট থেকে দেশলাই বার করল অধর। কষ্টিপাথরের উপর সোনার চিকচিকে ঝিকে দাগের মতো দেখাচ্ছে পায়ের নীচের টানা রাস্তাটা। এই গাঢ় আঁধারের মধ্যে পথ আবছা দেখতে পাচ্ছে সে, কিন্তু ঠিক চিনতে যেন পারছে না। এইখানে-না ছিল সেই বুড়ো সিসু-গাছটা, এই বাঁকেই তো ছিল বাচস্পতি মহাশয়ের টোল। সব সাফ হয়ে গেল কী করে, তাই ভাবছে অধর। বলা যায় কী, অন্ধকারে ঠাহর না করতে পেরে হয়তো সে ভুল পথে এসে গেছে। দিগ্‌দিগন্তজোড়া এই বিরাট অন্ধকারের মধ্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি কতটা আলো জোগাতে পারে, আদপে সে হিসেবও তার নেই। পথ খুঁজবার জন্যে তাই সে আলো জ্বালবার চেষ্টা করল। নরম হয়ে গেছে বারুদ। তার মন আজ যেমন ভিজে, তেমনি ভিজে গেছে কাঠিগুলো। নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামবার সময় জল ছিটে তার জামাকাপড় ভিজে গিয়েছিল অনেকটা—মনে পড়ল অধরের।

তিন বছর। তিন বছরে একটা সিসু-গাছ যদি লোপাট হয়ে যেতে পারে, তিন বছরে একটা শিশু-মন বুড়ো হয়ে যাওয়া বুঝি অসম্ভব নয় যাচ্ছে বটে অধর, কিন্তু পায়ে-পায়ে তার সংকোচের কাঁটা বিঁধছে। যার জন্যে চোর দুর্নাম, সে-ই যদি চোর বলে তাকে!

কাঠি থেকে বারুদ খুলে খুলে যেতে লাগল, তবু উদ্যম তার ফুরালো না কিছুতে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও আলো জ্বালতে পারল না অধর। বাচস্পতি মশায়ের টোলের চৌচালাটা থাকতে দোষ ছিল কি? অধরকে পথের সংকেত দেবার জন্যে পথের আশেপাশে যে দু-চারটি ইশারা আগে খাড়া ছিল, তারা সব একে একে সরে পড়েছে। বাঁশের মাচা করে তার উপর বসে চিড়ে-মুড়ি বেচতো লোকটা—কী যেন নাম, নামটা কিছুতে মনে হলো না তার। এদিকে

ঐ পাকুড় গাছের নীচে ছোট তরফের ম্যানেজার দাবা খেলার আড্ডা খুলেছিল একটা, সেটাই-বা কই। আশ্চর্য সে যতই হচ্ছে, ততই তার হাঁটার ফুর্তি বেড়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সংকোচের কাঁটা ততই তার পায়ে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছে। কী মনে করবে এলাচ।

এ পথ তার চেনা পথ। আশৈশবের চেনা। সন্দেহ আর সংশয় যতই হোক, একটা চেনা লোকের নাম মনে তার না-ই পড়ুক, তবু এই পথ ভুল যে সে করতে পারে না—এ বিশ্বাস তার আছে। পথের দু'পাশের পরিচিত সংকেত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, গাঢ় অন্ধকার তার চারদিক আগলে দাঁড়ালেও তার গতি তাই মন্থর হল না। গতিতে তার তেজ আছে, কিন্তু মনটা কেন-যেন নরম হয়ে গেছে। কেবলি মনে হচ্ছে—এলাচ যদি একদম বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে। তার কাঁচা মনটা যদি বজ্জাত হয়ে গিয়ে থাকে একেবারে।

সামনেই পথটা ঢালু। ভুল হবার নয়। ঢালু পথে নামতে নামতে একটু হাসল অধর। এত চিহ্ন উধাও হয়ে গেছে, কিন্তু ঢালু পথ টেনে তুলে কেউ তো সমান-সমান করে দিতে পারেনি। এই পথের উপরই একদিন হাতাহাতি হয়েছিল তার নকুলের সঙ্গে। তিন বছর ফাটক যে তাকে খাটতে হল, নকুলের কারসাজিই ছিল তার তলে তলে। গাঁয়ে চুরি না হয় কার ঘরে। এক রাত্রে, তিন বছর আগে, পথের উপর হাতে-নাতে ধরে ফেলল তাকে নকুল। পালাবার পথ ছিল না, চুরি করেই সে ফিরছিল বটে, কিন্তু যে অপবাদ দিয়ে নকুল তাকে জেল খাটাল, তেমন চুরি অধর যে করেনি, গাঁয়ের লোক তা জানেই না নিশ্চয়। না জানুক। কিন্তু এলাচ কতটা কি জানে, সেইটুকু মাত্র জানার তার বড় আগ্রহ। তিন বছর লোহার গারদে ব'সে ব'সে তার মনে কেবল এই জিজ্ঞাসাই জেগেছে। সেই জিজ্ঞাসার জবাব শুনবার জন্যেই হয়তো আজ তার গতিতে এতটা তেজ দেখা দিয়েছে। ছাড়া পেয়েছে পরশু। টম্‌টমে চেপে সেই দিনই সে চলে আসতে পারত, কিন্তু আসেনি। মাঝপথে

শিবপুরে নেমে পড়েছিল। তারপর নৌকো চেপে ধীরে ধীরে সে বড়ল নদীতে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছল চাকদহে।

এই তার পুরনো চাকদহ। এর প্রত্যেকটি গাছের পাতা ও মাটির কণার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। সেই অন্তরঙ্গতা আরও প্রবল ও দুর্বার হয়েছে যার জন্যে, তার নাম নতুন করে উচ্চারণ সে না করল! অন্ধকার এখন অনেকটা যেন পাতলা হয়ে গেছে। এক চিলতে চাঁদই বুঝি ওটা, ঘন আমবনের ফাঁক দিয়ে আলোর একটু আভাস দেখতে পাচ্ছে অধরচন্দ্র। আর হাঁটা যায় না, আর হেঁটেও লাভ নেই। সম্মুখেই জলা। রাস্তা থেকে নেমে সে জলার ধারে গিয়ে বসল। দূরে কুকুর ডাকছে। আজ রাতেও আবার চুরি হচ্ছে না তো কোথাও। আবার নতুন ক'রে নকুল তাকে আজও ধরিয়ে দিতে পারে বই-কি। জলার ওপার থেকে কার যেন কান্না ভেসে আসছে। শিশুর কান্না। নিস্তব্ধ রাত। গলার স্বর শুনবার জন্যে তার কান উৎকর্ণ হয়েছিল, এই কান্নার শব্দে সে যেন গ্রামের নাড়ির স্পন্দনের আওয়াজ পেল। এলাচের ঘরটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার ঘরও এই জলারই ওপারে। এলাচের ঘর থেকে এই শব্দটা আসছে না তো। একথা ভাবার সঙ্গেসঙ্গে বুকের মধ্যে তার ধক্ ক'রে উঠল কেন। অধর ঘাসের উপর টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল, চট করে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। নকুলের একটা প্রকাণ্ড বীভৎস মূর্তি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে।

—আমার গায়ে হাত তুললি তুই! এর শোধ আমি নেব।

ঢালু পথে তিন বছর আগে নকুলের যে ভয়ংকর গলা সে শুনেছিল সেই ভীষণ গলা আজ আবার তার কানে বেজে উঠল। সেই সঙ্গে জলার ওপার থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছেই।

এখানে ব'সে সমস্ত গ্রাম চৌকি দিচ্ছে যেন অধর। সে তার চোখ আর কান সজাগ ও সতেজ রেখে ঠায় ব'সে রইল। তারপর কখন সে শুয়েছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে জানে না।

মেলা বসেছিল চন্দনীর মাঠে। মস্ত মেলা। আশপাশের গাঁ ভেঙে পড়েছিল সেই মাঠের উপর, লোকে লোকারণ্য। বেগুনি, ফুলুরি, পাঁপড়-ভাজা, গালার চুড়ি, পুঁতির মালা, ধামা, খলুই, মোড়া আর পিঁড়ি একদিকে যেমন ঝাঁক বেঁধে ব'সেছিল, তেমনি আর একদিকে ছিল চুনিপান্না আর সোনাদানার ভিড়। পায়ে হেঁটে এসেছিল অধর, আর টমটম চেপে এসেছিল এলাচ। দুপথে দুজন এসে এক জায়গায় মিলে গেল এই মেলাতে।

—কী নিবি বল্।

—আমি বললে মেলাই খচ্চা পড়ে যাবে। তোর যা-খুশি কিনে দে।

এলাচের কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকাল অধর। বলল, মেলাই খচ্চা পড়বে মানে ?

—আমি চাইলে বলব, সোনা দে। পারবি দিতে ?

অধর বলল, সেই ভালো, আয় আমিই দিচ্ছি কিনে।

কিনে দিয়েছিল সাতনরী পুঁতির মালা, আর গালার চুড়ি এক জোড়া। এলাচের খুশি যেন ধরে না। চারিদিকে এত লোকজন, তবু সে খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল, বলল, খচ্চা বাঁচালি কই, এত কিনতে গেলি কেন ?

অধর এত কেনার কৈফিয়ত না দিয়ে বলল, আয়।

তারা দু'পা এগিয়েছে, অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল কে ওটা ? অধর চোখে যেন ঝাপসা দেখলো। ভালো করে চাইতেই দেখে নকুল। নকুল রাগী বিষধর সাপের মতো যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এলাচের হাত ধরে অধর এগিয়ে গেল, একটু দেরী হলেই ছোবল এসে হয়তো পড়ত মাথার উপর।

মেলার ভিড় ঠেলে তারা এসে দাঁড়াল একেবারে ফাঁকায়। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে এলাচ বলল, বড্ড পাজি ওটা। আমাকে দেখলেই যা-তা বলে।

তারা দু'জন হাঁটতে লাগল। সামনে মণ্ডলকুপীর প্রকাণ্ড মাঠ। মেলা দেখার সাধ যেন মিটে গিয়েছে তাদের। তারা সেই মাঠের পথে পা

বাড়াল। হেঁটেই তারা ফিরে যাবে চাকদহে। দেড়-কোশ তো পথ মোটে। এলাচের সঙ্গী যারা এসেছিল, তারা যদি খোঁজ করে, কী হবে তবে। অধর বললো—কিছু হবে না, জোর জোর পা চালা।

তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়ে চলেছে। কেন দৌড়চ্ছে, তা তারা জানে না। নকুল বাঘ না ডাকাত! কিসের ভয় তাকে? এর কোনো হিসেব না করেই দৌড়তে লাগল তারা। দূরে দেখা যাচ্ছে শীতলা-মার বুড়ো বটতলা। ওখানে পৌছতে পারলে তারা নিশ্চিন্ত। ওই গাছটা তাদের গ্রামের সীমা। মণ্ডলকুপীর ওখানে শেষ, চাকদহের শুরু। তারা দু'জন হাঁফাতে হাঁফাতে বটতলায় এসে পৌছতেই নকুল বলল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অধর।

গলার স্বর শুনে চমকে উঠল অধর। চমকে উঠতেই দেখে চাকদহে সকাল হয়ে গেছে। জলে কার-যেন ছায়া। চোখ তুলে তাকাতেই দেখে নকুল দাঁড়িয়ে।

—তাই বলি, এখানে শুয়ে কে? ফেরা হলো কবে?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে অধর উঠে বসল। কোনো কথার জবাবই দিতে পারলো না। পৃথিবীর ওপর এত রকমের বদল হয়ে গেল, বাচস্পতির চৌচাল, ম্যানেজারের আড্ডাখানা, সিসু গাছ—কিছু বলতে কিছু নেই; কিন্তু নকুল আজ তেমনই আছে। তিনটি বছর হয়তো খুব লম্বা একটা সময় নয়, কিন্তু অধরের জীবনের এই তিনটি বছর তিনটি সুদীর্ঘ যুগের মত তার জীবনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। নকুলকে দেখে তাই সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

নকুল বলল, উঠে দাঁড়া।

অধর উঠে দাঁড়াল না, নকুলই তার পাশে বসল। অন্তরঙ্গের মতো নকুল বলল, কোন্ জেলে ছিলি? চেহারাটা তো কয়েদির মতোই করে এসেছিস। তারপর আর খবর-টবর?

নতুন খবর অধরের কিছু নেই। নকুল যদি তাকে কোনো খবর দিতে পারে, সে সাগ্রহে তা শুনবে। রাত্রে যে কান্না শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে

পড়েছে, সেই কান্নাটা তার কানের মধ্যে হঠাৎ কেন-যেন ভৎর্সনার মতো বেজে উঠতে লাগল। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটে গিয়েই থাকে, সেই শুভ সংবাদটাই নকুল তা হলে তাকে শোনাক্! কান পেতে বসে রইল অধর।

নকুল কিছু বলল না। অধর উঠে গিয়ে ডোবার জলে গিয়ে চোখ-মুখ ধুলো। নকুল অযথাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—হাসছ যে।

—বেজায় হাসি পাচ্ছে।

—হেতু?

জামার হাতা দিয়ে চোখ মুখ মুছতে মুছতে অধর প্রশ্ন করল। কিন্তু নকুল সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

সকালের সূর্য অনেকটা তীব্র হয়ে উঠল, তবু নকুল যেন কোনো কথা ফাঁস করল না। নকুলের এই রকম দেখে অধর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল আরও। তার ইচ্ছে হ'তে লাগল, সে নকুলের হাত চেপে ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করে—এলাচ কোথায়। কিন্তু এলাচের নামই সে উচ্চারণ করতে পারল না, হাজার চেষ্টাতেও না। একদিন তাদের মধ্যে হাতা-হাতি হয়ে গেছে, সে তো অনেক দিন আগের বাসি ঘটনা। তাকে টাটকা ফুলের মতো ফুলদানীতে সাজিয়ে না রেখে ফেলে দেওয়াই মঙ্গল। অধর সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে সোজা হয়ে বসছিল এক একবার, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার গা ছেড়ে দিয়ে নকুলের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। এই নকুল তার উপর অযথা একটা অসম্মানের বোঝা চাপিয়েছে। তার হিংসা মারাত্মক প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে তাকে যে অপবাদ দিয়েছে, যে-অপরাধে তাকে অপরাধী করেছে, তার জন্যে আজ নকুল মনে মনে পরিতাপ করছে কি না, তাই খুঁজবার জন্যেই বুঝি অধর তার মুখের দিকে অমন করে তাকাচ্ছিল। মুকুন্দবাবুদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব।

গ্রামের লোককে মুখ দেখানোও তার পক্ষে কঠিন। মুকুন্দবাবুদের যে-জিনিস সে রাত্রে চুরি গেছে, তারা তা আর ফিরে পাবে না। অধরের যা খোয়া গেছে, সেও আর ফিরে পাবে না। কিন্তু ক্ষতির ওজন অধরেরই বেশি, এ-কথা হয়তো ভেবে দেখবে না কেউ।

—তারপর দোস্ত, চিমটি কেটে যেন নকুল আরম্ভ করল, খবর-টবর কিছু শোনাও।

মরিয়া সাহসে অধর বলল, তুমিই বলো না ভাই।

—কি বলব ?

—এলাচের কথা বলো। কেমন আছে ও !

কথাটা বলে ফেলে অধর যেন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গেল। এবার জবাব শোনবার জন্যে তার সর্বাঙ্গ কান খাড়া করে বসে রইল যেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নকুল বলল, বড় তেজী মেয়ে। ঘাড় টান তো, ঘাড় টান।

—তার মানে ?

—মানে আর কি ? নাম এলাচ। কিন্তু আমি আজকাল ওকে দারচিনি বলছি—যেমন মিষ্টি তেমনি ঝাল।

কথার কোনো মানে বুঝতে পারল না অধর। আজকাল এই নতুন নাম নকুল তাকে কি সূত্রে আর কি সম্পর্কে দিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারল না সে। বলল, একটু সোজা করে বলো নকুল।

—বাঁকা করে বলার ইচ্ছে থাকলে অনেক বাঁকা কথা বলতাম। কিন্তু তেমন বলার ইচ্ছে আমার নেই। ওটা তো মেয়ে নয়, যেন কেউটে।

নকুলের কথায় ক্ষোভ আছে, কিন্তু ঝাঁজ নেই কেন, এইটেই অধরের কাছে আরও বিসদৃশ ঠেকছে। নকুল বলল, হাল সে ছাড়েনি! এই গাঁয়ে ও-ও রইল, এলাচও রইল, কুলোপানা চক্র কদ্দিন ওর থাকে, তাই দেখবে সে। তা দেখুক, কিন্তু এলাচকে অধর একবার দেখতে চায়।

—দেখা যাবে যখন-তখন যেখানে-সেখানে। বাবুদের বাড়িতে বাসন মেজে থাচ্ছে। বলছি, বিয়ে কর আমাকে, তোকে কিচ্ছু করতে হবে না—শুধু আমার বউ হয়ে থাকবি। ইস্, বড় তাত! আয়, উঠে আয় এদিকে।

নকুলের বিষদাঁতটা তাহলে ভেঙে গেছে একেবারেই। নিজের রাস্তা সাফ করার জন্যে যে অধরকে জেলে পাঠাল, আজ সে-ই অধরকে বন্ধুর মতো কাছে ডেকে নিয়ে বসতে চায়। জেলের খাটুনি খেটে যার শরীর পঙ্গু হয়ে যাবার দশা হয়েছে, তাকে রোদের তাত আর কাবু করবে কতটা। তবুও নকুলের কথামত অধর উঠল। কিন্তু ছায়ায় গিয়ে সে আর বসতে চাইল না। সে এখন নকুলের পাহারা থেকে সরে যেতে চাইল। বলল, আমি চলি ভাই। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নকুল অধরের দিকে তাকাল। যেন জানতে চায়, কিসের দেরী। অধর বুঝল, কিন্তু আর কোনো কৈফিয়ত সে দিল না। কাল রাত্রে অন্ধকার তার কাছে তেতো ঠেকেছিলো, আর আজ এই রোদের এই পরিষ্কার আলো তার কাছে অভিসম্পাতের মতো মনে হল। এই প্রকাশ্য আলোয় নকুলের চোখের আড়াল সে হবে কি করে এইটেই তার কাছে ভীষণ সমস্যা হয়ে দেখা দিল যেন। সে চোর। গ্রামসুদ্ধ লোক তাকে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাবে, এ-ও তার কম আক্ষেপ নয়। নকুলকে ফেলে সে হাঁটতে লাগল। অনেকটা হেঁটে এগিয়ে গিয়েও সে একবার পিছন ফিরে তাকাল না। তার মনে হতে লাগল, নকুল তার পিছু ছাড়েনি। আর যদি বা ছেড়েই থাকে, তবুও তার যে নিষ্কৃতি নেই—তাও সে জানে। জীবন্ত উপদ্রবের মতো জীবনের বহু চৌরাস্তায় সে সশরীরে যেমন হঠাৎ আভিভূ´ত হয়েছে, তেমন আবির্ভাবের অভ্যাস সে নিশ্চয় ত্যাগ করেনি। একটানা চলতে লাগল অধর। মৃগাঙ্ক, গণেশ, হরিপদ—এই তিনজন তার সুহৃদ, এ-গাঁয়ে তারা এখনো আছে। তাদেরও কোনো খোঁজ না নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে সোজা চলে গেল কোথায়! মণ্ডলকুপীর মাঠ পার হয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল অধর।

নকুল শীতলার বটতলায় এসে কোন্ পথ দিয়ে যে হাজির হয়েছিল বলা শক্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দেখল, অধর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

খবরটা দিতে হয় এলাচকে। নকুল ফিরল। এলাচ চান্ সেরে চৌধুরীদের বাঁধাঘাটের শানের উপর দাঁড়িয়ে একপিঠ ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে দুহাতে গামছা ধরে ফট্‌ফট্ করে চুল ঝাড়ছিল। তিন বছরে তার চুলই যে শুধু গোছে ভারি আর ঝুলে লম্বা হয়েছে এমন নয়, সে নিজেও লম্বায়-চওড়ায় বড় হয়েছে অনেক। আজ যদি অধর একবার তাকে দেখত! বেলা পড়ে এসেছে, এলাচের মনে তাগাদা আছে, তার চুল ঝাড়ার রকম দেখেই তা বোঝা যায়।

নকুল এসে হাজির। নকুলকে দেখে এলাচ এতটুকু সঙ্কুচিত হল না। ভিজে কাপড় কাঁধের উপর একটুখানি টেনে দিল মাত্র, বলল, এখানে কী চাই?

—চাইনে কিছু, দিতে এসেছি।

—কি দিতে?

—সংবাদ।

সাবানের টুকরো কুড়িয়ে নিতে নিতে এলাচ বলল, কি সংবাদ।

মুচকি হেসে নকুল বলল, এসেছিল, চলে গেল।

—কে, কে সে? তামাশা ছেড়ে সাফ কথা বলতে জানো না?

—অধর।

এলাচ চমকে উঠল। হাত থেকে সাবানটা পিছলে পড়ে গেল শানের উপর, সেখান থেকে এক লাফে চলে গেল জলের মধ্যে। এলাচ ধরতে চেষ্টা করল না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, যাক গে।

নকুল বলল, কার কথা বললি? সাবানের, না, অধরের।

এলাচ বলল, তোমার কথা! যাও হে যাও, পথ ছাড়।

হন্‌হন্‌ করে হাঁটা দিল এলাচ। নকুল বলল, মেয়েমানুষের মতনই না, যেন ছোট-তরফের হাওয়াগাড়ি।

থমকে দাঁড়াল এলাচ, বলল, কি বললে? তবু তো হাওয়াগাড়ি, শেকলে-বাঁধা জন্তুটি নই।

—তার মানে।

—যেটা নিয়ে ছোটকুমার বিকেল বেলা বাগানে পায়চারী করে।

ইস্‌, মোক্ষম গাল দিয়ে গেল এলাচ। নকুল চারদিক তাকাল। কাছে-ভিতে কেউ নেই, শুনতে পায়নি আর কেউ। আপশোশ হতে লাগল তার। খবরটা না দিলেই হত। ঝোঁকের মাথায় খবরটা দেওয়া বুঝি আহাম্মুকীই হয়ে গেল। নকুল বাঁধাঘাটের শানের উপর বসল, বসেই লাফ দিয়ে উঠল। শান তেতে আগুন হয়ে আছে। এটা রোদের তাত, না, এলাচ এই তাতটা রেখে গেছে, বলা কষ্ট। কি ভাবতে ভাবতে নকুল গুটিগুটি পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

ভিজে কাপড় ছেড়ে এলাচ রকে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় নকুল এসে উপস্থিত। এলাচ ওকে দেখেও যেন দেখল না, ঘরের মধ্যে চলে গেল। নকুল পা ঝুলিয়ে রকের উপর বসল। ঠাণ্ডা হিম মাটি। ভিতর থেকে এলাচ বলল, পরে এসো, আমি এখন খেতে বসেছি।

—মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে আসিনি। তুমি খাও না। নকুল পা দোলাতে দোলাতে বলল।

মুখ ভরতি ভাত নিয়ে চিবুতে চিবুতে এলাচ বলতে লাগল, আমার গ্রাস কাড়ে কার সাধ্য।

নকুলের পায়ের কাছে দোপাটির গাছ। একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে নকুল তার পাপড়ি খুলতে বসলো। বলল, গাঁয়ে আবার চোর ঢুকেছিল, এইটেই ভয়ের ব্যাপার হল।

ভিতর থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ এল চোর কে?

—কেউ না। নকুল পা দোলাতে লাগল।

—চোর তোমার ভাশুর নাকি, নাম করতে পার না।

নকুল এ কথার জবাব দিল না। এলাচ বলল, এসে আবার চলে গেল কেন?

—কে জানে!

—কোথায় গেল?

—গাঁ ছেড়ে। চন্দনীর দিকে তো যেতে দেখলাম, কোথায় গেল—কে জিজ্ঞেস করতে গেছে।

এলাচ দেয়ালের দিকে তাকাল। বাতার গায়ে সাতনরী পুঁতির মালাটা ঝুলে আছে। অনেক পুঁতি ঝরে গেছে, কুড়িয়ে রেখেছে সে। মালাটা মেরামত করতে হবে আজই। বালাজোড়া ভেঙে গেছে—যাক্ গে। এরি মধ্যে তিনটি বছর কেটে গেল। টেরই যেন পায়নি এলাচ। দিনগুলো বড়ই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। একটা গাঁয়ের একটা দিক ভেঙে আর-একটা দিক গড়ে উঠল, কিন্তু একটা জীবনকে এপর্যন্ত নতুন করে গড়েই তোলা গেল না। আক্ষেপ আর অনুতাপের কথা নয়, দিনগুলো সব অপচয় হয়ে গেল—এই বড় দুশ্চিন্তা।

নকুল বলল, চুপ করে গেলে কেন? খুব রস করে খাওয়া হচ্ছে বুঝি?

এলাচ উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ এলাচের কোনো উত্তর না পেয়ে নকুল বলল, চললাম তাহলে।

কিন্তু সে গেলো না। বসে বসে পা দোলাতে লাগল। এলাচ দরজার ফাঁক দিয়ে একবার দেখে নিয়ে আবার চুপচাপ বসে রইল এঁটো হাতে। এই অবেলায় খেলে শরীর তার ছেড়ে দেয়। হাত ধুয়ে এসে একটু গড়াবে, কিন্তু বাইরে বেরোবার তার ইচ্ছে নেই আদপে। এঁটো হাতেই সে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে নকুল উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল, বলল, ওকি, ঘুমুলে নাকি? আচ্ছা ঘুমোও, চললেম।

এবার নকুল সত্যিসত্যিই চলে গেল। নকুল চলে গেল বটে, কিন্তু এলাচ তবু উঠল না। অনেকক্ষণ এই ভাবে সে পড়ে রইল চুপচাপ। পুঁতির মালার সাতটি লহর আজ আর আস্ত নেই। ওটা মেরামত করতে হবে। করতে হবে বটে, কিন্তু সে-কাজেও এতটুকু গরজ হচ্ছে না তার। নকুলটা তাকে অযথা ধোঁকা দিয়ে গেল কিনা, বলা শক্ত। 'এসেছিল, চলে গেল' পুকুরঘাটে নকুলের এই ফাজলামোটা তার কানের মধ্যে বাজছে। চোর-দায়ে ধরা পড়িয়ে দিয়ে লোকটাকে অযথা এই হায়রানি করা কেন, কিছুতেই ভেবে পায় না যেন এলাচ। মুকুন্দবাবুরা তো নিশ্চয়ই অধরকে চোর বলে চিনে রেখেছে। হাজার চেষ্টাতেও এ অপবাদের কালি মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারবে না অধর। এলাচ গুণতে লাগল। সেটা ছিল আষাঢ় মাস, মাঝখানে আরো দুটো আষাঢ় পার হয়ে গেছে। আজ ফাল্গুন। তিন বছরই হল প্রায়। অধর তাহলে ঠিকই ফিরেছে—নকুলের ধাপ্পা এটা নাও হতে পারে। হোক ধাপ্পা আর না-হোক, ফিরুক আর না-ফিরুক—পরোয়াই যেন করে না এলাচ। কিন্তু একটু জানতে ইচ্ছে করে শুধু—ফাটক খেটে শরীরের হাল তার কেমন হল। সে শুনেছে, জেলের কয়েদীদের দেদার খাটিয়ে নেয়—গরু-মোষের মতন।

এলাচ যখন উঠল, তখন সন্ধ্যে। বাইরে বেরিয়ে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিল। অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেল শরীর। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ—এ বেলা বাবুদের বাড়িতে কাজে যাওয়া যখন হলই না, তখন আর বসে থেকে লাভ কী। ঘরে গিয়ে এলাচ শুয়ে রইল। মেঝেয় নয়, বিছানায়। বাঁশের বাতা দিয়ে এক হাঁটু উঁচু মাচায় তার কাঁথা বিছানোই ছিল। এলাচ টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘর অন্ধকারে ঘুটঘুট করছে। অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুজলে সব কিছু সাফ দেখা যায়। এলাচ দেখতে লাগল তার জীবনের রং-বেরঙের নানান ছবি।

এক একবার মনে হচ্ছিল, নকুল এসে হানা দিতেও পারে-বা। প্রত্যেক মুহূর্তে সে পায়ের শব্দের আশঙ্কা করছিল। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তার দায় হয়েছে। ছায়ার মতো পায়ে পায়ে ঘুরতে চায় লোকটা।

এলাচ ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। বাইরে সাড়াশব্দ নেই। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক। হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। আঁৎকে উঠলো এলাচ। নকুলের দুঃসাহস এতটা বেড়েছে, স্বপ্নেও সে ভাবেনি। দিনের আলোয় পথে-ঘাটে পিছু নেওয়া আর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা, এই যার কাজ—আজ যে সে এই নিশুতি রাতে এসে এমন করে হানা দেবে—

আবার আওয়াজ হল। আবার। এলাচ বলল, কে, কি চাই?

কোনো জবাব পেল না। উঠে গিয়ে এলাচ কুপী জ্বালাল। কুপী হাতে নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, কে?

একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এলাচের বুকের ভিতরটা ধক্‌ধক্ করে বাজতে লাগল। ভয়ে তার মুখ নীল হয়ে গেল নিশ্চয়। সে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে? মোক্ষদা মাসির ঘর পর্যন্ত একবার যদি তার গলা পৌঁছয়, তাহলে আর ভয় নেই—মাসি একাই এক-শ। এই ভরসাটা আছে বলেই এলাচ এমন একা থাকতে পারে। সে যে অসহায় এমন যেন কেউ না ভাবে—চোরই হোক, ডাকাতই হোক আর নকুলই হোক।

কুপীটা উঁচু করে তুলে ধরল এলাচ। ধোঁয়াটে শিখাটা তার নিজের চোখের সামনেই কাঁপতে লাগল, জানলার ওপারের লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল না। চেঁচাবার জন্যে তৈরি হয়ে সে বলল, কে, কে তুমি?

—চিনতে পারছ না?

অপরিচিত গলার স্বর শুনে এলাচ শাসিয়ে উঠল, শিগগির পালাও। নইলে—

—আমি অধর। চিনতে পারলে না বুঝি?

এলাচ শুনতে পেল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলো না যেন। আর একবার শোনার জন্যে সে যেন প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অধর বলল, দরজা খুলবে না বুঝি।

দরজা সে খুলবে নিশ্চয়ই। কিন্তু অধরটা এমন হয়ে গেল কেন, এইটেই ভাববার কথা। কয়েদ খেটে বিলকুল চোর হয়ে গেছে লোকটা। দরজা খুলবে কি না-খুলবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করার মানে? যদি সে না খোলে তাহলে অধর বুঝি ফিরে যেতেও রাজি?

এলাচ অধরকে ঘরের মধ্যে টেনে নিল। বলল, এত রাতে কোত্থেকে? তুই ফিরে এসেছিস, সে খোঁজ আমি রাখি। আমি বেঁচে আছি কি না, খোঁজ নিয়েছিস? তুই বদলে গেছিস অধর, তোর গলাই চেনা যায় না। ওকি, কথা কস নে কেন? অমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়!

অধর বলল, যে ফাটক খাটে সে তো চোরই। দিনের আলোয় আসতে সাহস হল না, সকলেই জানে আমি—

—জানে যে তুই চোর। ভালোই তো। মুকুন্দবাবুর ঘরে চুরি করেছিস। এবার তোকে সত্যিকারের চুরি করতে হবে। পারবি?

বলে কী এলাচ। এতদিন বাদে দেখা হল, একটু আশ্চর্য হবে, একটু মনের কথা বলবে—তার কিছু নেই, এখন ওকে ওস্কাচ্ছে চুরি করার জন্যে? অধর এলাচকে যা দেখে গিয়েছিল, এখন তার থেকে অনেক বদল হয়ে গেছে। অনেক বড়-সড় হয়েছে। কুপীর আলোয় ভালো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়—অনেক সুন্দর হয়েছে এলাচ। মনটা ছিল ওর শিশুর মত সরল। এখন সে মনটাও বুঝি ঝানু হয়ে গেছে—বেঁকে তুবড়ে গেছে। অধর চুরি করতে নারাজ। চুরি না করেই তার যে ঝকমারি গেল, চুরি করে আর ফ্যাসাদ বাধাতে সে পারবে না। এলাচটা সত্যিই বদলে গেছে। অধরের গলা চেনা যায় না বলে সে যে বদলে গেছে—এমন নয়। কিন্তু এলাচের

গলা আছে তেমনি, কিন্তু মনটা বুঝি তেমন আর নেই। অধরের উপর তার টানও বুঝি ঢিলে হয়ে গেছে একেবারে।

—উত্তর দিস নে যে। এলাচ অধরের কাছে এসে বসল, বলল, যেমন-তেমন চুরি না, মানুষ চুরি।

অধর এলাচের দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না সে।

এলাচ বলল, বেকুবের মতো চেয়ে দেখছিস কি? রাত কি তোর জন্যে বসে থাকবে। শিগগির জবাব দে কথার।

অধর বলল, বুঝতে পারছি নে এলাচ।

—আমাকে চুরি করতে হবে। আমাকে নিয়ে এ-গাঁ থেকে সরে পড়তে হবে। এই জন্যেই তোর জন্যে হাঁ করে পথ চেয়ে বসে ছিলাম, তা জানিস?

জানতো না অধর। এখন জেনে হতভম্ব হয়ে গেল। কথাটা অদ্ভুত আর অসম্ভব ঠেকল অধরের কাছে। কিন্তু ভাববার আর নাকি সময় নেই, রাত নাকি বসে থাকবে না। তাই অধর উঠে দাঁড়াল।

একটা ছায়া উঠে আসছে রোয়াকের উপর। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। লোকটা ঘরে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া হয়ে। দেশলাই জ্বালল একটা। ঘর ফাঁকা। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল যেন নকুলের।

নব্বই না হলেও তার কাছাকাছি তো হবেই। কিন্তু ওঁকে দেখে বোঝবার উপায় নেই ওঁর বয়স অত। এখনো শক্ত আছেন, সমর্থ আছেন, আর আছে তাঁর ধারালো স্মৃতি-শক্তি।

এই বাড়িটার বয়স তাঁর নিজের বয়সের ডবল। সুতরাং অনেক ইতিকথা আর স্মৃতিকথা এর ভিতে ভিতে যে গাঁথা আছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সবাই একে একে চলে গেছে, এখন পর্যন্ত এখানে একা টিকে আছেন নব্বই বা তার কাছাকাছি বছরের সাক্ষী এই স্বর্ণময়ী দেবী।

স্বর্ণময়ী দেবীর শরীরটা মজবুত, কিন্তু বাড়িটা টলমল করছে, আস্তর খসেছে, ইঁট নড়েছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ আজ একটা ভগ্নস্তূপের শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেচতে মন চায়নি, কিন্তু রক্ষা করারও কোনো সঙ্গতি নেই। বাড়িটা হাত বদল করে অন্যত্র সরে যাওয়াই তিনি সাব্যস্ত করলেন শেষ পর্যন্ত। মন টন-টন করে উঠেছিল হয়তো, কিন্তু সে কথা তিনি তুললেন না। বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে গেলেই হয়তো হত, কিন্তু ক'টা দিন যে বাকি তা আদপেই জানা নেই। অনিশ্চিতভাবে বসে না থেকে নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা করার পরামর্শই তিনি অবশেষে গ্রহণ করলেন।

কথায় কথায় এখানে নহবৎ আর সানাই বেজে উঠত, অথচ আজ এই মর্মান্তিক ঘটনায় কারো বেহালাতে একটা ছড়ের টান পর্যন্ত পড়ল না। কিন্তু পরোয়া কি, ছেড়ে যখন যেতেই হবে তখন নিঃশব্দে সরে পড়াই ভালো। কোনো আড়ম্বর আর ভালো লাগে না।

শিল্পের ও সাহিত্যের, স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের, আলাপনের ও আলিপনার কত শখ তাঁর ছিল এক কালে। সেসব কথা এখন বাসি। এখন কানে হয়তো লেগে আছে প্রাচীনকালের কোনো সংগীতের রেশ, মরি মরি করে হয়তো

তা গুমৃরে উঠছে, কিন্তু কিছুতে মরছে না। বাল্যকাল থেকে যে পরিবেশের মধ্যে তিনি কাটিয়ে এসেছেন তার সোনালি স্বপ্ন নিশ্চয় মুছে যায়নি স্বর্ণময়ার চোখ থেকে। কিন্তু তিনি নির্বাক, তিনি নিথর, তিনি যেন নির্মম।

ছেড়েই যাবেন। ঘরে ঘরে নানা কালের নানা জাতের নানা ছাঁদের আসবাব। এগুলি তো আর টেনে নিয়ে যাওয়া চলে না। ওই ইঁট-পাথরের সঙ্গে এগুলি রেখেই যেতে হবে। কিন্তু, বই, অত পুঁথি, অত খাতা—আর ওই অ্যালবামগুলো।

ঘরে ঘরে পায়চারি করে দেয়ালে দেয়ালে তাকিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। এগুলি এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক না। স্বামীর স্মৃতি, শ্বশুরের স্মৃতি মুছে যাক্, কিন্তু ঘুচে যেন যায় না। আর, এ তো কেবল স্মৃতিই নয়, এগুলো যে তাঁর নিজেরই পাঁজর আর মজ্জা। এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো তুচ্ছ করার নয়।

স্বর্ণময়ী তাঁর স্বামীর স্ত্রীই ছিলেন না শুধু, তিনি ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও সহপাঠী। লাইব্রেরী-ঘরের দু'কোণে দু'জন বসে একমনে পড়তেন একই লেখকের বই। পড়া সাঙ্গ হলে আলোচনা শুরু হত দু'জনের—সাহিত্যের বা শিল্পের, সঙ্গীতের বা আলপনার। স্বামীর সতীর্থ হওয়ায় জীবনে তাঁর সঞ্চয় বেড়েছে অনেক—দেশী আর বিদেশী নানা জাতের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। স্বর্ণময়ী দেবী নিজের জীবনকে স্বর্ণময় করে তুলেছিলেন।

কোনো সন্তান হয়নি বলে আক্ষেপের অবকাশ তাই জোটেনি কোনোদিন। জীবনকে স্বর্ণময় আর বর্ণময় করে নিয়ে খুঁটিনাটি একঘেয়ে অভাব অনুভব করার সুযোগই তাই হয়নি।

সে আমলে তাঁকে না চিনত কে? সুধী-সমাজ বলতে যে একটা বিশেষ সমাজকে বোঝায়, স্বর্ণময়ী ছিলেন তার নমস্যা। তাঁর গুণে আর মনীষায় শ্রদ্ধাও ছিল সকলের।

কিন্তু আজ সে আমলের আমূল বদল হয়েছে। স্বর্ণময়ী তাই আজ একক হয়েও একা। এত বড় একটা ট্র্যাজেডি যে ঘটে যাচ্ছে, সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ তাই নেই।

গায়ে সাদা জামা, পরনে ধবধবে সাদা থান, পায়ে হাল্‌কা চটি। স্বর্ণময়ী ধীরে ধীরে উপর আর নীচ, উঠোন ও বাগিচা, বারান্দা আর ব্যাল্‌কনিতে ঘুরে বেড়ালেন ক'দিন ধরে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তি বোধ করলেই তিনি ফিরে আসেন লাইব্রেরী-ঘরে। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেন কিছুক্ষণ, হয়তো কিছু ভাবেনও মনে মনে। কিন্তু মুখে তার কোনো ছাপ দেখা যায় না। এ বাড়ি ছাড়তে তাঁর কষ্ট যে হচ্ছে, তাঁকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে স্বর্ণময়ী তাকালেন, ডাকলেন, মাধব! কে এসেছে গ্যাখো।

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন, মাধব, কে এসেছে গ্যাখো।

মাধব ঘরে ঢুকল, বলল, কিছু বলছিলেন?

—কে এসেছে গ্যাখো। সিঁড়িতে শব্দ পেলাম।

মাধব বলল, কেউ না। আমিই এলাম নীচে থেকে।

স্বর্ণময়ী চোখ বুজলেন, বললেন, অত শব্দ করে হাঁটতে শিখলে কবে, মাধব।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে কথাটা শুনেই মাধব চলে যাচ্ছিল। স্বর্ণময়ী আবার তাকালেন, বললেন, মাধব, শোনো। এই বইগুলো সব পাড়তে হবে।

—সঙ্গে নিয়ে যাবেন বুঝি?

—বাছব। চোখ দিয়ে তো দেখবে না তোমরা, কত বই যে পোকায় খেলো।

মাধবও কম করে তিরিশ বছর আছে এখানে। এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর উৎসব সে দেখেছে। আজ সে একবার আলমারীর আর র‍্যাকগুলোর দিকে তাকাল। একটু থেমে বলল, এখনি নামাতে বলছেন?

—তোমার অবসরমত নামিয়ো। আর শোনো, ও-ঘরে ছবির অ্যাল্‌বামগুলো আছে, সেগুলোও দেখো তো একবার। টুকরো টাকরা দু-চারটে ছবি এদিক ওদিক পড়ে থাকতে পারে—

—দেখব। মাধব চলে গেল।

স্বর্ণময়ী মনে মনে দু'দিন ধ'রে খুঁজলেন, কি কি নেওয়া যায় সঙ্গে, কী-বা দেখা যায় বেছে। নেবার মত তেমন কিছু হয়তো নেই, কিন্তু বাছার জিনিস আছে অঢেল। কিন্তু কিছুতে হাত দিতে তাঁর আতঙ্ক হয়। কোন্ কোণ থেকে কী ভয়ঙ্কর জিনিস বেরিয়ে পড়বে, তার কি ঠিক আছে কিছু। স্মৃতিশক্তি তাঁর আছে বটে, কিন্তু সেই স্মৃতিকে জ্বালাময় ক'রে তোলাতেই তাঁর হয়তো ভয়। মাধব এর মধ্যে বার দুই তাগাদা দিয়েছে। বইপত্তর সব ঢেলে ফেলতে চেয়েছে। স্বর্ণময়ী দু'বারই বাধা দিয়ে বলেছেন, 'তাগাদা নেই। তোমার অবসরমত নামিয়ো।' মাধবের অবসর তো দিন-ভোর। এর আগে ঘর-দোর ছিমছাম রাখার জন্যে দিনের অনেক সময় তার যেত, কিন্তু এখন আর এসবে হাত দিতে তার মন নেই। যা চলে যাচ্ছে পরের হাতে, তা'তে এখন হাত দিয়ে লাভ কি মাধবের? এখানে নাকি বাড়ি উঠবে নতুন, নতুন ইমারতে এ-তল্লাটের রূপই নাকি বদলে যাবে। রূপ যতই বদলাক, মাধবের চোখে যে রূপের আমেজ লেগে আছে, সেই রমণীয় রূপ কি আর এতে আসবে। মাধবের মনটাও থমথম করে হয়তো। তিরিশ বছর তো কম সময় নয়।

—মাধব!

হাঁটু দু'টো বুকের মধ্যে নিয়ে বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিল মাধব। চেয়ে চেয়ে সে দেখছিল, ওই ঘরে বাবামশায় বসতেন, আর ওই ঘরে দাদাবাবু। স্বর্ণময়ীর ডাক তবু তার কানে গেল। কানে যেতেই সে চট করে উঠে দাঁড়াল, স্বর্ণময়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ডাকছিলেন?

—অবসর পেলে এগুলোতে একবার হাত দিস। এক-এক ক'রে দিনগুলো তো কেটে যাচ্ছে। বাছাবাছি করতেও তো সময় লাগবে।

মাধব একটু চুপ ক'রে রইল, বলল, রোজই ভাবি নামাই। কিন্তু সময়ই করে উঠতে পারছিনে।

—তা বললে তো হবে না, এটাও একটা কাজ। বাড়ি বেচে দিয়ে তবু তা আটকে বসে থাকা তো ঠিক না।

মাধব বলল, কাল সকালেই—

—ঘুম থেকে উঠেই না মাতলেও চলবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের দিকে কোরো। তাহলেই হবে।

বাড়িটা থমথমে হয়ে গেছে একেবারে। লোকজন অনেক দিন থেকেই নেই, কিন্তু তবুও এত নির্জন এর আগে ছিল না এ বাড়ি। বাড়ি বিক্রির দলিল-দস্তাবেজ তৈরি হয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গে সারা বাড়িটাই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর ইঁটে ইঁটে এর ভিতে ভিতে যে ইতিহাস আর ইতিকথা গাঁথা আছে মুটে-মিস্ত্রি এসে শাবলের ঘা দিয়ে দিয়ে সেই ইতিহাসকে গুঁড়োগুঁড়ো ক'রে ফেলবে—এইটে ভাবতেই যেন ভয়।

রাত্রের দিকে প্রাসাদের মত এই বাড়িটা ভয়ঙ্কর বলে ঠেকে আজকাল। ভীষণ নিশ্চুপ। দক্ষিণের বড় ঘরে আধোঘুমে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছেন স্বর্ণময়ী; বারান্দার পাশের ছোট কুঠুরিতে মাধব। দূরে কাদের দেবালয় থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে—মল্লিকদের ঘণ্টায় আওয়াজ তো চেনা; এটার শব্দ নতুন মনে হচ্ছে। পুরনো যারা ছিল একে একে চলে যাচ্ছে তাহলে। চারদিকে তাই এ নতুন হাওয়ার হাততালি বাজছে বুঝি।

মাঝরাতে স্বর্ণময়ী উঠলেন। বড় আলো জ্বাললেন না। দেরাজ টেনে বা'র করলেন মোমবাতি। তাঁর ইচ্ছে হল, এই নিশুতি রাতে একা একা তিনি ঘুরে ঘুরে দেখে আসবেন বাড়িটা। দিনে মাধবের জন্যে মন দিয়ে দেখা যায় না সব।

মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে পা টিপে তেতলায় উঠে এলেন স্বর্ণময়ী। রেলিং-দেওয়া লম্বা বারান্দা। এখান থেকে তিনি মোমের আলোয় যেন মহানগরীর রূপ দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে দূরে হাজার হাজার আলোর বিন্দু। তারা-সুদ্ধ আকাশের একটা খণ্ড যেন মাটির উপর ভেঙে পড়েছে ব'লে তাঁর মনে হল। আরো মনে হল, ষাট-সত্তর বছর আগের কথা। এইখানে তিনি যেদিন প্রথম এসে দাঁড়ালেন, সেদিন এই মহানগরী এমন ছিল না—এত আলো ছিল না, এত আস্ফালনও হয়তো ছিল না। সেদিন এখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে তাঁর মনে হয়েছিল সম্রাজ্ঞী। সেদিন কত উঁচু ছিল এই তেতলার বারান্দাটা, আজ একে ডিঙিয়ে ওই কত উঁচুতে মাথা তুলেছে ওই বাড়িগুলো। আজ আর তাই নিজেকে সম্রাজ্ঞী বলে তাঁর ভুল হচ্ছে না। মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকলেন, দেয়ালে প্রকাণ্ড তেলছবিটা জ্যান্ত মানুষের মত তাঁর দিকে তাকাল। স্বর্ণময়ী চমকে উঠলেন, হাত দিয়ে আড়াল করলেন আলো। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতেই নাকে হাস্নাহানার গন্ধ পেলেন যেন, নিজের মনেই তিনি হাসলেন। গন্ধটা তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি তাহলে। ঘরে ঘরে ঘুরে তাঁর স্মৃতিদের নিয়ে যেন লুকোচুরি খেলা খেলে বেড়াচ্ছেন। এবার নেমে গেলেন একেবারে নীচে উঠোন আর বাগান; রান্নাঘরের গা দিয়ে ঠেলে-ওঠা নিমগাছটা মোমের আলোতে চমকে উঠল যেন। স্বর্ণময়ীও সেই সঙ্গে চমকে উঠলেন, মোম গড়িয়ে হাতে পড়েছে; আঠার মত আটকে গেছে হাতের সঙ্গে। তাঁর চমকে বাতি গেল নিভে। স্বর্ণময়ীর কানে কারা যেন একসঙ্গে ফিসফিস ক'রে হাজার রকমের কথা বলতে লাগল একসঙ্গে।

মাটিতে পা যেন পুঁতে গেছে তাঁর, নড়তে পারছেন না স্বর্ণময়ী। মাধবকে চেঁচিয়ে ডাকা ঠিক হবে কি না ভাবছিলেন। সজোরে মাটি থেকে টেনে পা-দুটো তিনি যেন উপড়ে নিলেন। চলে এলেন উপরে।

বিছানায় শুয়ে পড়লেন, সারা গা ঘামে ভিজে যেতে লাগল তাঁর। লম্বা একটা অতীতের একটা উৎকট জনতা তাঁকে আজ ঘিরে ধরেছিল বলে তাঁর মনে হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে তিনি একটা জনারণ্য যেন দেখে এলেন আজ। কিন্তু এভাবে তারা এসে দেখা দিল কেন, তাই যেন ভাবছিলেন তিনি। বাগানটার দুর্দশা কতদূর হয়েছে, দেখে আসার ইচ্ছে ছিল তাঁর। দেখা হল না। তিনি শুয়ে রইলেন, ঘুম হল না। স্মৃতিরা তাঁর সারা গায়ে পিপীলিকার মত কামড়ে বেড়াতে লাগল।

সকালে মাধব দু'তিনবার এ ঘরে উঁকি দিয়ে গেছে। এত বেলা তো করেন না স্বর্ণময়ী। ডাকবে ভেবে মাধব বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। মুখের দিকে চেয়ে আজ যেন তাঁর আসল বয়সটা দেখা যাচ্ছে, চোখ গর্তে, গাল গেছে তুবড়ে। মাধব কাশল। একটু জোরেই হয়তো কেশেছিল, স্বর্ণময়ী তাকালেন, মাধবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চট করে উঠে বসে বললেন, কী রে?

মাধব বলল, বেলা অনেক হয়েছে।

বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু পারিপাট্য আছে অটুট। নাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। অনেকক্ষণ সময় লাগে তাঁর নাইতে—বরাবরই। শরীর ঠাণ্ডা ক'রে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, বকের পালকের মত ধপধপে ফরসা থান কাপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল অনেক।

হল-ঘরে ঢুকেই তিনি চমকে উঠলেন, মেঝেতে স্তূপ করে ঢালা বইয়ের পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাশে ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে মাধব।

স্বর্ণময়ী যেন বিরক্ত হলেন, বললেন, এত তাড়াহুড়ো কিসের, মাধব? দুপুরের দিকে নামালে হত না?

—কিচ্ছু নেই, দিদিমণি। পোকায় খেয়ে—

স্বর্ণময়ী কোনো জবাব দিলেন না। মাধবের দিকে একবার চেয়েই তিনি বারান্দা ডিঙিয়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, বইয়ের এই মহাশ্মশানের চারধারে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভীষণ অজগরের আকর্ষণে প'ড়ে অসহায় পাখি যেমন তাকে প্রদক্ষীণ ক'রে বেড়ায়।

তারপর তিনি নীচু হয়ে হাত দিলেন ওতে। এই সিরিজটা বোম্বাই থেকে যেদিন পার্সেলে এসে পৌছল, সেদিন দীপ্তেন্দুবিকাশের মুখ আনন্দে কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই ফরাসি-সিরিজ আর ওই ফারসি-সিরিজ পাঁচ দিন আগে-পরে এসে পৌছয়। দীপ্তেন্দুবিকাশ এমন পাগলামো শুরু করেছিল সেদিন, মনে হচ্ছিল সব কটা বই একনিশ্বাসে সে যেন পড়ে ফেলতে চায়।

—শুধু আমি পড়ব না, স্বর্ণ। তুমিও পড়বে। আমরা দু'জনে।

তারপর ওই, ওই যে রুশ গ্রন্থাবলী, ইতালীয়, জর্মান।

—সব ভাষা যদি জানা থাকত, স্বর্ণ, তাহলে পরের মুখে ঝাল খেতে হত না। অনুবাদ পড়লে কি খাঁটিটা পাওয়া যায়? আয়ু যদি হত হাজার বছর, তাহলেও বুঝি পৃথিবীর সব বই পড়া যেত না। কে না বলেছিল, সমুদ্র-সৈকতে নুড়ি নিয়ে খেলা। আমার বরাতে সে নুড়িও জুটল না।

স্বর্ণময়ীর কোমর ধরে গেল। একটা মোড়া টেনে আনলেন তিনি। এই ভগ্নস্তূপের পাশে বসে একে একে নেড়ে-চড়ে দেখছেন। স্মৃতিরা তো সামান্য বস্তু নয়, এক-একটা বিষধর সাপ। হঠাৎ কোন্‌টা তাঁকে মোক্ষম ছোবল দেবে বলা যায় না। তাই হয়তো তিনি খুব সন্তর্পণে নাড়ছেন-চাড়ছেন।

—স্বর্ণ, ভেব না এ অর্থের অপচয়। এটা বিলাসও নয়। পৃথিবীতে এসেছি, এখান থেকে কিছু আদায় করে নিয়ে যাবার এ শুধু মতলব। এই ঘর, এই বাড়ী, এই আলো,এই আসবাব, এসব তো আর টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না সঙ্গে করে।

মনে পড়ে, সেদিন স্বর্ণময়ী ধমক দিয়েদিলেন দীপ্তেন্দুবিকাশকে, বলেছিলেন, অকালে বড় পেকে যাচ্ছ তুমি, এসব দার্শনিকতার বয়স এটা নয়। বুড়ো হই, তখন শুনব এসব কথা।

এতদিন আগের কথাও মনে থাকে মানুষের? আশ্চর্যই লাগে স্বর্ণময়ীর। এসব যদি মনে না থাকত, কিছুই যদি আদপে মনে না থাকত তাহলে কত সহজ ও স্বচ্ছন্দ মনে হত নিজেকে।

লম্বা টেবিলের উপর একগাদা অ্যালবাম টেনে এনে রাখল মাধব।—বড় ছোট মাঝারি, ছেঁড়া আর ছুট্‌কো।

চেয়ে দেখলেন স্বর্ণময়ী, পর পর ওতে সাজানো আছে দিনের পর দিন, থরে থরে সাজানো আছে বছরের পর বছর। পাঁচ বছর আগের একটা পুরনো অক্ষর দেখলে মন ভারি হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু স্বর্ণময়ী অবলীলাক্রমে এত বছর আগের অক্ষত অক্ষর নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন। মুখের ভাব বদলাচ্ছে না এতটুকু, এতটুকু বিচলিত হচ্ছেন না যেন। কিন্তু হাত দিয়ে দেখার সময় সাবধানে যে হাত দিচ্ছেন তা আন্দাজ করা যায়।

বইয়ের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেলা বেড়ে গেল অনেক। এখনো খাওয়া-দাওয়া হল না। মাধব ডাকতে ভরসা পাচ্ছে না। একদিন এইসব বই ছিল তাঁদের জীবনের পরম ধন, আজ এসব দাঁড়িয়েছে জঞ্জালে। হাজার বছর আয়ু চেয়েছিলেন দীপ্তেন্দুবিকাশ। আয়ু বেশি হওয়াতে লাভ যে কি, তার স্বাদ তো পেতে হয়নি তাকে। স্বর্ণময়ী নিজের আয়ু নিয়ে যেন ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছেন, তাই স্বামীর আয়ু-কামনার কথা তাঁর মনে পড়ল।

উঠে এলেন স্বর্ণময়ী, দুহাতের ধুলো ঝেড়ে নতুন উদ্যম নিয়ে বসলেন এসে টেবিলের কাছে। আজ তাঁকে আরো সতেজ আরও শক্ত দেখাচ্ছে। তিনি যেন দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করেছেন আজ। গত রাত্রের জনারণ্য ডিঙিয়ে এসে তিনি দিনের আলোতে তাদের যেন খুঁজতে বসলেন। বাবলু, ছকু, শান্তা, মিনু—গ্রুপ ছবি তুলেছিল নীচের ঘরে সিঁড়িতে বসে। সেবার শেফালীর বিয়ে হয়। ছকুও এখন বুড়োর দলে, দেরাদুনে বসে পেন্‌সন ভোগ করছে। শেফালী নাকি আর নেই। মিনু তো এখন দিদিমা। এটা বাবার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ছবি, এটা মায়ের, এটাও মায়ের—

বিয়ের আগে তোলা। ইস্, পোকায় ঠিক মুখের কাছটাই কুড়ে খেয়েছে, কে তা চেনার উপায় নেই। আঙুলগুলো দেখে মনে হয় মল্লিকা ; হ্যাঁ মল্লিকা-ই, কপালের কাছে এই তো কাটা দাগের চিহ্নটা।

কত ছবি, ছবির কি আর শেষ আছে? লোকজনে গমগম করত এই বাড়ি, সকলেরই তো নানা বয়সের নানা অবস্থার ছবি এতে আছে। স্বর্ণময়ী দেবী দেখছেন, আর যেন মুষড়ে পড়ছেন। নিজেকে বড় একা আর অসহায় ঠেকছে ধীরে ধীরে।

মোটা মলাটের অ্যালবামটা টেনে নিলেন কোলের কাছে। এটা তাঁর নিজের অ্যালবাম, নিজের ব্যক্তিগত। মলাট তুলতে ইচ্ছা করছিল না, অতীতকে খুঁচিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে তাঁর যেন আতঙ্ক হচ্ছে ভয়ানক। এর মধ্যে তিনি আছেন, দীপেন্দুবিকাশ আছেন, আর আছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল। ডালা তুললেই ফণাসুদ্ধ কালসাপের দল কিলবিল ক'রে উঠবে বলে মনে হচ্ছে কেবল। প্রথম পাতাতেই কুমারী স্বর্ণময়ী ও কুমার দীপ্তেন্দুবিকাশ। ছবি আবছা হয়ে গেছে, রং গেছে হলদে হয়ে। তবু চেনা যায়। মনে মনে শুধু ভাবছেন, দরকার কি অতীতের গর্ত খুঁড়ে এভাবে নিজেকে জখম করা। এর থেকে কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা সঙ্গে নেবেন। অতীতকে কি আর বাছাই করা চলে? এক-একটা ছবির সঙ্গে এক-একটা দীর্ঘ কাহিনীর কথা মনে পড়ে যায়। সে-কাহিনীর প্রতিটি কথায় বিষাক্ত হুল। পাতার পর পাতা উল্‌টে চলেছেন স্বর্ণময়ী। শরীরে বড় অবসাদ ঠেকছে, চোখে যেন স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না সব। ফিকে রঙের ছবিগুলো ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। তবু তিনি ওল্‌টাচ্ছেন।

আর না। এবার গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসলেন তিনি। আর দেখা গেল না, হাত অবশ হয়ে গেছে।

মাধব দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। কাছে আসবে ভরসা হল না তার। ফিরে গিয়ে সে বারান্দায় হাঁটু দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে বসে

রইল অনেকক্ষণ। আরেকবার উঠে এসে দেখে গেল স্বর্ণময়ী একইভাবে বসে আছেন।

সিঁড়িতে দুদ্দাড় শব্দ করে কারা যেন আসছে। এ শব্দেও ঘুম ভাঙল না স্বর্ণময়ীর।

মাধব উঠে গিয়ে বলল, আপনারা এসেছেন? বসুন। আমি খবর দিচ্ছি।

বাড়ির নতুন মালিকরা এসেছে কবে দখল পাবে জানতে। মাধব স্বর্ণময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে কাশল, সাড়া পেল না। আবার কাশল, তবুও সাড়া না পেয়ে সে ডাকল, দিদিমণি। দিদিমণি।

সাহস ক'রে মাধব গায়েই হাত দিল। হাত ধরে নাড়ল। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে স্বর্ণময়ী।

সারা বাড়ি কাঁপিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল মাধব।

মান

এক-এক দিন এক-এক রূপে দেখা দেয় বনলতা। দৈন্য-দুর্দশায় যেন মুষড়ে পড়েছে কোনো দিন, কোনো দিন আবার সব ঝেড়ে মুছে নতুন জৌলুসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বয়সও বদলে যায় সেই সঙ্গে সঙ্গে। কোনো দিন থাকে পঁচিশের কাছাকাছি, কোনো দিন পঁয়তাল্লিশ যায় পেরিয়ে।

গোলমাল কোথাও-না-কোথাও আছে, এমনি সন্দেহ করে সকলে।

স্বামী আছে, কিন্তু স্বামীর পরোয়া করে না বনলতা। স্বামী তার কাছে বোঝার শামিল। এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। আসলে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা আর সন্দেহের কারণ এইখানেই।

কিন্তু এ দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই তার নেই। সে সহজে আর স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়ায়, বাজারে যায়, হাসপাতালে ছোটে। চরকির মত ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, কাজের যেন কোনো শেষ নেই তার।

কপালে বড় রকমের গোল সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, চুল গুছিয়ে বেঁধে, পায়ে চটি চড়িয়ে যখন বনলতা বের হয়, তখন বোঝা যায় সে চলেছে হাসপাতালে। যখন এলোমেলোভাবে কাপড় প'রে কপালের উপর থেকে চুল সরিয়ে এলো-খোঁপা বেঁধে খালি পায়েই সে দৌড় দেয়, তখন বুঝে নিতে হবে সে চলেছে বাজারে।

কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো জড়তা নেই। রাস্তার মাঝখানে অচেনা লোককেও সহজেই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে, কটা বেজেছে দেখুন তো আপনার ঘড়িতে।

কথার জবাব দিয়েই তো কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু হাত-ঘড়িটা দেখার পরও একটু ফিরে তাকাতে হয় বনলতার দিকে। সে কিন্তু তখন

মাথায় কাপড় ফেলে ডান হাত দোলাতে দোলাতে সোজা হেঁটে চলে যায়। ঘড়ি দেখে যে সময় বলে দিল, তাকে ধন্যবাদ জানাবার বা অন্য কোনোভাবে সৌজন্য প্রকাশের সময়ই যেন তার নেই।

স্বামী স্ত্রী আর দু'টি ছেলে—বড়টা দশ, ছোটটা ছয়। এই চারটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত ছোট সংসার। হরিপদবাবুর বাড়ির ছোট একটা কুঠুরি ভাড়া নিয়ে আছে বছর চার হবে। বারান্দায় রান্না হয়, ঘরের মেঝেয় খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর শুকনো খটখটে করে ঘর মুছে নিতে হয়, তারপর সতরঞ্চি আর মাদুর বিছিয়ে তার উপর হয় বিছানা।

অন্দরে গিয়ে বনলতাকে কেউ দেখে নি। তার ঘরে পাড়ার কেউ যায়ও না, তাকে ডেকে কথাও বলে না। সে কিন্তু মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। কথাবার্তা বলে, গলা ছেড়ে হাসে, আবার তখনই চলে আসে।

সামনেই মুদির দোকান। হলুদ মাখা হাত নিয়ে ছুটে এসে বলে, চট্ করে পাঁচ-ফোড়ন দাও দু'পয়সার। শিগগির দাও। উনুনে কড়াই চাপানো।

সওদা নিয়ে লাফ দিয়ে যখন চলে যায়, তখন আলগা খোঁপাটা গায়ের ঝাঁকিতে ভেঙে পড়ে পিঠময়। দোকানের অন্য কোনো খদ্দের থাকলে তারা হয়তো কিছু মন্তব্য করে, কিন্তু বনলতার কানে তা পৌছয় না আদপে।

দোকানী বলে, কে কি বলছে তাতে কি আমরা যোগ দিতে পারি, না, দেওয়া উচিত। আমরা কারবারী লোক, শুধু শুনেই যাই। সব খদ্দেরই আমার কাছে লক্ষ্মী।

—তাহলে আরো অনেকের চোখে লেগেছে, বলো। বড় বেহায়া।

দাঁড়িপাল্লার পাষাণ ভাঙতে ভাঙতে দোকানী বলে, চোখ থাকলেই চোখে লাগে, বাবু। দেব কতটা, আধ পোয়া?

—হুঁ। কি যেন ভাবতে ভাবতে খদ্দের চলে গেল। পঞ্চানন হালুইকরের মধ্যম পুত্র বৃন্দাবন।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে হরিপদবাবুর বাড়ির দিকে এক চুমুক তাকিয়ে বৃন্দাবন চলে গেল।

চুল তো নয়, যেন চুলের অরণ্য।

কারো কোনো কথার মধ্যে সত্যিই থাকতে নেই নাকি? মুদী তাকে জানান্ দেবার জন্যেই কথাটা বলল কি না, বৃন্দাবনের এটাই যেন ভাবনা হয়ে দাঁড়াল।

জয়কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এখান থেকে কিছু দূরে। দোকানের বয়সও হয়েছে অনেক, বৃন্দাবনের বয়স যখন দেড় তখন পঞ্চানন এই খাবার দোকান খোলে। কিন্তু লোকের যখন বসতি বাড়ছে, তখন এর একটা ব্রাঞ্চ খোলা দরকার। বাজারে যাবার বড় রাস্তার মোড়ে ফণী বাগচী নতুন বাড়ি করছে, তার একটা ঘর নেবার জন্যে পঞ্চানন কিছুদিন থেকে চেষ্টা করছে।

আজ বৃন্দাবন দোকানে পৌঁছেই বলল, বাবা, তোমার ব্রাঞ্চ খোলার কি হল।

পঞ্চানন ছেলের মুখের কথা শুনে চমকে গেল, পুলকিতও হল, কাজে উৎসাহ তাহলে হয়েছে বৃন্দাবনের। বলল, ফণীবাবু পাকা কথা দেন নি এখনো।

কালীঘাটের কালীমূর্তির বাঁধানো পট টাঙানো দেয়ালে। বৃন্দাবনের চোখ পড়ল সে দিকে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইল। কী অজস্র চুল, চুল তো নয়, যেন চুলের অরণ্য। ভারী ভালো লাগল তার ঐ পট, কিন্তু ওই ভয়ংকর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না সে।

ফিরিওলা দেখলেই ডাকা চাই বনলতার। হেজলিন, পমেটম, চুলের ফিতে, সায়া, ব্লাউজ—সবই হয়তো তার দরকার। কিন্তু কোনোদিন কিছু সে কেনে না, দরে পোষায় না আদপে। বলে, এ যে মগের মুল্লুক পেলে তোমরা, তিন ডবল দাম হাঁকতে শুরু করলে।

ফিরিওলা কিছু বলে না, মালপত্তর টেনে কষে বেঁধে হাঁটা দেয় আর হাঁক দেয়।

ঘরের মেঝেয় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে বনলতা হাওয়া খায় হাত-পাখার। সংগতি নেই বলেই সব শখ মরে যাবে কেন মানুষের। দিনুর বাপ আজ আড়াই বছর বেকার। একটা চাকরি খোয়া গেলে আর-একটা যে লুফে নেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগতে হয়, এই সাধারণ নিয়মটাও সে মানবে না কিছুতে।

বনলতা ডাকে, দিনের বেলা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ো না, শোনো। শুনছো?

ধীরেন পাশ ফিরে শুয়ে বলল, উঁ!

—একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছ যে। পাখাটা নেড়ে একটু হাওয়া খাও। হাত-পা নাড়তে একটু শেখো, হেঁটে-হেঁটে আর ছুটে-ছুটে আমার তো পায়ের দাঁড়ি ছিঁড়ে যাবার জোগাড়।

ধীরেনের হাতে পাখা গুঁজে দিয়ে বনলতা বলল, বড়বাজারের দিকে একটু যাতায়াত কর না, খাতা-লেখার কাজ-কাজ—

ধীরেন তেতে গেল, বলল, তুমি কি ভাবো আমাকে বল তো! বেকার ব'লে কি মানুষ নই? শেষে ওই খাতা-লেখার কাজ করতে বলো—

বনলতাও বিরক্ত হল একটু, বলল, না, টাঁকশালে গিয়ে নোটের নকশা আঁকো। আপিসে কাজ মানেই খাতা-লেখা, সরকারী আপিসেই বলো, আর সদাগরী আপিসেই বলো। আগের চাকরিটা তোমার কি ছিল লাটসাহেবী?

ধীরেন বলল, চেঁচিয়ো না, রাত-দিন খ্যাচাখেচি ভালো লাগে না। যখন হবার তখন হবেই।

—হোক। কিন্তু আমিও আর পারছিনে। কানেরও তো মাথা খেয়েছ। লোকে কি-সব বলে, কিছু তো গ্রাহ্য নেই।

ধীরেন বলল, কে বলে, কি বলে? আমাকে—

—না, তাহলে তো হতই। বনলতা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে শুধু।

যার চেতনা নেই, চৈতন্য নেই, যে একেবারে অসাড় ও অচেতন হয়ে গেছে, তাকে চিমটি কেটে জাগাবে কী করে বনলতা। পরিপূর্ণ শ্রী আর সৌন্দর্য, বাসনা আর কামনা, শখ আর সুখ—নানা সম্ভারে সাজিয়ে রেখেছিল সে নিজেকে। বাল্যের কোনো কথাই কি তার মনে নেই একেবারে! আছে। তার সাজগোজের বহর বরাবরই বেশি। তাদের ইস্কুলের মেজদি ছিলেন যেমন রাগী তেমনি কদাকার। বনলতার বিনুনি করার ধরন দেখলেই তিনি চটে বলতেন, এ তোমার কোন্ দেশী ফ্যাশান, বন। মেয়েমানুষের অত বাবুগিরি, অত কেতা-দুরস্তি ভালো নয়। কাল থেকে সাধারণভাবে আসা চাই। বুঝলে?

শনের মত তাঁর চুল, আর পাকানো দড়ির মত চেহারা। সে চুলে আর সে চেহারায় কোনো বিনুনিও হয় না, কোনো বাবুয়ানিও অচল। তাই তিনি হয়তো ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু বনলতা জানে তাকে দেখতে ভালো, সে সাজলে তাকে আরো ভালো দেখায়। তার এক গোছা কোঁকড়া চুলকে সামলানো তো চাই। না সেজে কেবল চুল সামাল দিতে গেলেও তো তা বাঁধতে হবে; নারকেলের দড়ি দিয়ে বস্তার মুখ বাঁধার মত করে তো তা বাঁধা চলে না। একটা ফিতে আর একটা ক্লিপ লাগালেই তা বাবুগিরি হয়ে যায় কী করে, কিছুতেই সে-সময় ভেবে পায় নি বনলতা।

আজও সে তা ভেবে পায় না। তার না-আছে জর্জেট, না-আছে বিষ্ণুপুরী-বেনারসী, একটা ঢাকাই শাড়ীও তো তার নেই। মিলের একটা শস্তা শাড়ী পরেই তো তাকে রাস্তায় বের হতে হয়, কিন্তু তবু পাঁচজনে এত ফিরে তাকায় কেন, এত কথা বলাবলি করে কেন—এ কথা কে বলবে তাকে।

হাসপাতালে যাচ্ছিল বনলতা। চটির একটা পেরেক উঠেছে হয়তো, খচখচ করে লাগছিল বুড়ো আঙুলটায়।

মণ্ডলদের সেজমেয়ে খিড়কির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, অভিসারে চললে নাকি, লতা? এত সেজেগুজে যে?

কথাটা হয়তো রসিকতা, কিন্তু খচ করে বুকের মধ্যে লাগল বনর। বলল, ছোট ছেলেটা আমাশায় ভুগছে ক'দিন ধরে। ওষুধ আনতে যাচ্ছি।

—কোন্ ডাক্তার দেখছে? এ প্রশ্নটাও স্বাভাবিক বলে মনে হল না তার।

বনলতা বলল, হাসপাতাল থেকে ওষুধ আনব। পরশু দেখিয়ে নিয়ে এসেছি।

—হুঁ। বাড়াবাড়ি নয় তো বিশেষ?

মাথার কাপড় ফেলা, হাত দোলাতে দোলাতে হন-হন করে সে হেঁটে চলল, কথার আর জবাব দিল না। কিন্তু মেজমেয়েটার প্রশ্ন তার মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে, পায়ের বুড়ো আঙুলটাও সেই সঙ্গে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

হাসপাতাল এখান থেকে কিছু দূরে। নটায় আবার আউটডোর বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পা চালিয়ে হেঁটে চ'ল সে। কিন্তু পা-ই কি চলতে চায়, পেরেকটা পায়ের নীচে বেজায় যন্ত্রণা শুরু করেছে।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন একজন, বনলতা বলল, আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা।

লোকটা রসিকতা করল একটু, ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, আমার ঘড়ি ব'লে নয়, সব খাঁটি ঘড়িতেই এখন পৌনে নটা।

ভালো। কোনো দিকে না চেয়ে সে হাঁটা দিল। একটু এগিয়ে দেখল আর চলা যায় না। রাস্তার পাশে গিয়ে চটি খুলে উবু হয়ে বসল, হাত দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করল পেরেক; কিন্তু ওঠে না দেখে এক টুকরো ইঁট নিয়ে ঠুকতে লাগল।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন বিড়ি ফুঁকছে। সে যেন তামাশা দেখছে ওপাশ থেকে। একটা বিড়ি ফেলে আর-একটা টাটকা বিড়ি বার করে সে সেটার মুখের দিকটায় ফুঁ দিচ্ছে।

নাঃ, হল না। কিন্তু পেরেকের ধারালো মুখ হয়তো একটু ভোঁতা হয়েছে। লাগছে, কিন্তু আগের চেয়ে কম।

বৃন্দাবন শুধু আলগোছে মন্তব্য করল, মুচি ছিল কিন্তু কাছেই।

বনলতা তার দিকে তাকাল একবার, বলল, থাক, ঠিক হয়ে গেছে।

আর কিছু বলা হল না বৃন্দাবনের, কৃতার্থ করা হল না নিজেকে। এখানে দাঁড়িয়েই আড়চোখে সে একবার তাকাল, তারপর ফিরে গেল।

খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে ধীরেন বলল, আজ ওষুধ দিল না বুঝি?

—না, দেরি হয়ে গেছে। একটু থেমে বলল, একটা ভার অন্তত নাও। হয় হাসপাতাল, নয় বাজার। আমি আর পারছিনে।

ধীরেন নির্লিপ্ত, ছোট-ছেলেকে কোলে ফেলে হাঁটু দোলাতে দোলাতে বলল, তুমি যা না পারবে তাই আমাকে করতে হবে?

—না। তা কেন, আমিও যা না পারব, তুমিও তা পের না। ছেলে যেন আমার একার।

বনলতা বসে পড়ে পায়ের আঙুলটা টিপতে লাগল।

কিন্তু তবু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই ধীরেনের। সে যেন কাজের সংসার থেকে ছুটি নিয়ে নিয়েছে একেবারে। কোনো আগ্রহ নেই, কোনো উৎকণ্ঠা নেই, কোনো তাড়া নেই, তাগাদা নেই। ঘুরন্ত লাট্টুর দম ফুরিয়ে গেলে সেটা যেমন পাক খেতে খেতে কাৎ হয়ে পড়ে যায়, ধীরেনের কাছে তার পৃথিবীটা যেন তেমনি নির্বেগ ও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠেলা দিলেও সে ওঠে না, নাড়া দিলেও তাই সে নড়তে চায় না।

কাল বিকেল পর্যন্ত যে ছিল পঁচিশ, আজ সকালে সে চট করে যেন পঁয়-তাল্লিশ হয়ে গেছে। এক রাতে এই বিশ বছরের ফারাক দেখেও কিছু জিজ্ঞাসা করে না ধীরেন।

কিন্তু মুদির দোকানের খদ্দেরদের চোখ ধীরেনের চোখের মত নিস্তেজ আর নির্জীব নয়। তারা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে, খুব ধকল গেছে বোধ হয় সারারাত। পাড়ার লোকেরা কি মরে আছে সবাই, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করে না কেন।

এটা সহানুভূতি হয়তো নয়; এটা ব্যঙ্গ বা তিরস্কার কিংবা ভৎর্সনা। এটা হয়তো কদর্য কোনো ইঙ্গিত।

পিঠময় চুল এলানোই ছিল, এলোখোঁপা পিঠের উপর ভেঙে পড়ার কোনো অবকাশ ঘটল না সেদিন। রুক্ষ কোঁকড়া চুলের অরণ্য, জয়কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পটে আঁকা ছবিটার মত ভয়ঙ্কর আর প্রচণ্ড দেখাচ্ছে আজ বনলতাকে। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, সারারাত সে সজাগ থেকে কেবল ধীরেনের অকাতর নাক-ডাকা শুনেছে। পাশের মাঠে ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে; কারো পায়ের শব্দ হতে পারে ভেবে উৎকণ্ঠায় কান খাড়া করে শুয়ে ছিল সে। তার উপর ছেলেটার সঙ্গে বারবার ঘর-বারও করতে হয়েছে তাকে। কি যে অসুখ করল, কতদিনে যে কমবে তার কোনো ঠিক নেই।

না, ও শব্দ পদশব্দ নয়; ভিজে মাটির উপর তাল পড়ছে। এক-একটা তালের দাম কত? শুয়ে শুয়ে অনেক্ষণ ধরে সে হিসেব করল। হাতের চুড়িগুলো গিয়েছে, গলার হারটাও গিয়েছে। সম্বলের শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে এবার। পাঁচটা তাল পড়ল এ পর্যন্ত। আস্তে আস্তে উঠে বনলতা বেরিয়ে গেল বারান্দায়; কোনো রকম শব্দ না করে হারিকেন জ্বালালো। আলো-হাতে তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে। বাইরে সাঁ সাঁ শব্দে বয়ে চলেছে বাতাস।

অন্ধকার ঘরে ছোটছেলেটা ডাকতে লাগল। সাড়া না পেয়ে সে কেঁদে উঠতেই ধীরেন লাফিয়ে উঠল, সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে হয়তো। দেশলাই জ্বেলে দেখল ঘরে বনলতা নেই।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল ধীরেনের। কি যেন সে ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, এমন সময় বারান্দায় শব্দ শুনে সে বেগে বাইরে এসে বনলতার হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় গিয়েছিলে, বল।

বনলতা কথা বলল না, বলতে পারল না, অনেকক্ষণ পরে বলল, হাত ছাড়। বুঝেছি। এতক্ষণে তোমার ঘুম ভেঙেছে।

ধীরেন হাঁপাতে হাপাতে বলল, ভেঙেছে অনেক আগে। সব আমি জানি।

পায়ের নীচ থেকে মাটি যেন সরে যেতে লাগল বনলতার। পাঁচজনে তাকে কি বলে, এ নিয়ে আর তার আক্ষেপ করার আর কিছু নেই তাহলে. সব আক্ষেপ তার ফুরিয়ে গেল।

হারিকেনের আলোয় ধীরেনকে বিকট আর বীভৎস দেখাচ্ছে, তার দিকে তাকাতে পারল না সে বেশিক্ষণ। আলো একেবারে কমিয়ে দিয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল।

ধীরেন পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, বনলতা ছেলেকে কোলে নিয়ে বাইরে গেল।

এর পর আর ঘুম আসে না। অন্ধকার ঘরে ধীরেনও জেগে রইল, মেঝের বিছানায় বনলতাও শুয়ে রইল সজাগ হয়ে। কিন্তু তার সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে; মাথার ভিতরটা তার ঝিমঝিম করছে। কোনো কৈফিয়ত সে দেয় নি, কোনো কৈফিয়ত সে দিতে পারবে না; কিন্তু ধীরেনের মাথায় হঠাৎ এ বুদ্ধি ঢুকল কী করে, এইটেই তার আশ্চর্য ঠেকছে। সে কি একটা একটা করে তাল গুনে গুনে তাকে বোঝাবে, আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক আছি। এত বড় অপমান কেন করল তাকে ধীরেন। বাইরের লোকের অপমানে তত ধার নেই, তত বিষ নেই, কিন্তু ধীরেনের কঠিন প্রশ্নটা তাকে কেবলই দংশন করতে লাগল—কোথায় গিয়েছিল, বল।

সকাল হবার আগেই তার উঠে পড়তে ইচ্ছে করল, কিন্তু সে উঠল না। বাইরে যখন প্রচুর আলো হয়েছে তখন সে উঠে পড়ল। সারা গা ব্যথা করছে,

মাথাটাও টনটন করছে তার। নিজেকে সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটা রাতে সে যে কুড়িটা বছর পার করে দিয়েছে মুদির দোকানের খদ্দেররা তা চট করে ধরে ফেলেছে। তাদের বুদ্ধি প্রখর, তাদের চোখ ধারালো।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ধীরেন তার সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। বনলতাও বসে রইল, হাসপাতালে যেতে সে পারবে না।

কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। বারান্দার এক কোণে পাঁচটা তাল পড়ে আছে, কেউ যেন তার ওয়ারিশ নেই। ধীরেন লক্ষ্য করেছে, কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না কাউকে। অনেকক্ষণ বাদে সে দিনুকে ডাকল, বলল, এগুলো কার জানিস ?

দিনু কিছু জানে না। সে তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় বনলতা ধমক দিয়ে উঠল, বলল, কিস্যু জানিনে আমি।

ধীরেনের হিসেবে কি তাহলে কিছু গোলমাল হয়ে গেল ? সে তার মনে মনে যোগ করল, বিয়োগ করল, গুণ করল, ভাগ করল ; কিন্তু কিছুতেই অঙ্ক যেন মেলে না।

আয়নায় গিয়ে মুখ দেখে বনলতা চমকে গেল। এ কি হাল হয়েছে তার চেহারার ? তার ভিতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাক, তবু এ হালে থাকতে সে রাজি না। চুল আঁচড়ে, মুখ পরিষ্কার করে, কাপড় বদলে সে নিজেকে মেরামত করে নিল।

এমন সময়, এ কে, মিহির ? হঠাৎ ! বিনা খবরে ?

—জন্ম মৃত্যু বিবাহ আর ক্যানভাসার, এরা কেউই খবর দিয়ে আসে না, বৌদি। এদের আসাটাই আচমকা। তারপর, কেমন আছ সবাই। বহুদিন বাদে দেখা হল। প্রায় তিন বছর। সেবার দেরাদুনে যাবার পথে তোমাদের এখানে হল্ট্ করেছিলাম, আর আজ এই। হাতের সুটকেস নামিয়ে রাখল মিহির।

—এবার কোথায় চললে ?

—এবার সাউথে, দক্ষিণে। ভাইজাগ, মানে তোমাদের বিশাখাপত্তম, মাদ্রাজ, পার্বতীপুরম, গোপালপুর—এইসব আর-কি। তারপর আছ কেমন সবাই। আর নতুন বাচ্চা-টাচ্চা? বড় কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে। দাদা কই?

বনলতা বলল, বসো। উনি ভিতরের বারান্দায় হয়তো। ছেলেরাও আছে, নিয়ে আসি।

ধীরেন গম্ভীর মুখ করে এসে বসল মিহিরের পাশে। দিনু আর মণ্টুও এসে দাঁড়াল।

আগাছার আলবালে জল না দিলেও যেমন সে সজীব হয়ে ওঠে, মণ্টুও হল তেমনি। হাসপাতালের ওষুধ বন্ধ হওয়াতেই সে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল।

মিহির দাদাকে প্রণাম করে বলল, দু'দিন আছি কিন্তু।

—বেশ তো। ধীরেন বনলতার মুখের দিকে চেয়ে ফেলল। চোখাচোখি হতেই বনলতা মুখ নামাল, কিছু জবাব দিল না।

ধীরেন বলল, পিসিমা আছেন কেমন? অঞ্জলির ম্যাট্রিক দেওয়ার কথা ছিল না এবার? কঙ্কর কত বড় হয়েছে রে?

বনলতা ছেলেদের বলল, তোমরা ব'সো কাকার কাছে, আমি আসি। কথা বলো ঠাকুরপো।

চটের থলেয় তাল ভরে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বনলতা চলে গেল। হাতে তার নেই একটা কানাকড়ি, অথচ এই অতিথির পরিচর্যা হওয়া তো দরকার। ধীরেন যা ভাবুক আর যা মনে করুক, বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে পড়তে হল বনলতাকে। বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে, রাস্তাঘাটে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে ক্রমশ। মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে এগচ্ছে। কিন্তু কোথায় চলেছে, তা বুঝি সে নিজেই জানে না। তার হাতের এ বোঝা দিয়ে 'কোনো কাজ হবে কিনা, কে বলবে। এ বোঝাকে তার মনে হচ্ছে

তার কলঙ্কের বোঝা। ধীরেনের মনের বিযাক্ত ক্লেদ বহন করে নিয়ে যেন সে চলেছে। না, এ দিয়ে কাজ নেই। বনলতা থলেটা রাস্তার ধারে ফেলে রেখে সোজা চলল বাজারের দিকে।

নতুন আলোয়, নতুন আসবাবে একটা নতুন দোকান খোলা হয়েছে এখানে। মস্ত সাইনবোর্ড—জয়কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, মতিঝিল ব্রাঞ্চ।

দু-একবার দ্বিধা হল, তবুও বনলতা এগলো, লোকটার মুখ যেন চেনা বলে ঠেকল তার। বলল, আট আনার সিঙাড়া আর আধ সের রসগোল্লা নেব।

বৃন্দাবন তার কর্মচারীর হাত থেকে দাঁড়ি-পাল্লা প্রায় কেড়ে নিল যেন, নিজেই ওজন করতে বসে গেল সে।

বনলতা দুবার ঢোক গিলে বলল, আমি কাছেই থাকি। দামটা কিন্তু দিতে পারছি নে আজ।

বৃন্দাবন ব্যস্ত হয়ে বলল, না দিলেন। মাল তো নিয়ে যান।

আশ্চর্য হয়ে গেল বনলতা, মুচকে হেসে কৃতজ্ঞতা জানাল মাত্র।

বৃন্দাবন তাকে বলল, আমি চিনি আপনাকে।

পিঠের এলোচুল দেখিয়ে চলে গেল বনলতা। দেয়ালের নতুন পটে নতুন ছবিটার চুল নতুন আলোর আভায় চকচক করতে লাগল শুধু। বৃন্দাবন বিড়ি ধরাল।

ভগবানে বিশ্বাস আছে কি না আছে, তার কোনো পরীক্ষা হয় নি বনলতার। কিন্তু সে তার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। বৃন্দাবনের চোখের দৃষ্টিটা তার মনে পড়ছে শুধু। লোকটা এক কথায় তার কথায় রাজি হয়ে গিয়ে তাকে রক্ষে করেছে বটে, কিন্তু ওভাবে সে তার দিকে চাইল কেন। অর্থ যে একেবারেই সে বোঝে নি এমন নয়, কিন্তু হঠাৎ এভাবে লোকটা তাকায় কেন।

বনলতা পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ধীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে বলল, জোগাড় করলে কী করে?

তেতে ছিল বনলতা, বলল, রুপো না থাকলে রূপ বেচতে হয়। ঘরে যাও।

মোক্ষম কামড় দিয়েছে বনলতা, একেবারে জখম করে দিয়েছে ধীরেনকে। ধীরেন আর কোনো কথা না বলে আহত সিংহের মত ঘাড় নীচু করে ঘরের ভিতর চলে গেল। এটা কি স্বীকৃতি বনলতার, সে কি পরোক্ষে তার মনের কথাটা বুঝিয়ে দিল ধীরেনকে।

মিহির বলল, দাদাকে যেন চিন্তিত দেখছি।

মেঝের হারিকেনটা দপ-দপ করে উঠল, হাওয়া ঢুকেছে নিশ্চয়। দিনু পলতে কমিয়ে দিতে গেল। ধীরেন উঠে এসে তার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, সব জিনিসেই হাত দাও কেন?

নিজেই সে মেরামত করল হারিকেন। তারপর মিহির জলযোগ সারল।

ঘরে এখন আর কেউ নেই। বনলতা গেছে রান্না চাপাতে। মিহির আর ধীরেন পাশাপাশি বসে।

মিহির মাথা নীচু করে বসে হাঁটু দুটো নাড়ছিল, আর কি যেন ভাবছিল। এবার তার যাত্রাটা যেন শুভ হয় নি। পথে এক জোড়া স্লিপার খোয়া গেল, আসাম-লিঙ্কের গাড়ীতে মাদ্রাজীটার সঙ্গে প্রায় মারামারি লেগেছিল আর কি, তারপর এখানে এসে দেখছে আবহাওয়া একেবারে নতুন। দেড় বছর আগে যেবার এসেছিল, তার থেকে এবারকার চালচলন একেবারে যেন বদলে গেছে অনেক। বৌদিও তত হাসিখুশি নয়, দাদাও গম্ভীর—বাচ্চাদেরও চেহারা রুক্ষ রুক্ষ।

মিহির বলল, তোমাকে কেমন মন-মরা দেখছি এবার।

ধীরেন নিশ্বাস ফেলে বলল, তোর বৌদিটা কেমন যেন হয়ে গেছে রে। বনছে না আর।

—সে কি? মিহির যেন চমকে উঠল, বৌদির আবার হল কি? ওর তো খুব সুনামই শুনি।

ধীরেন চাপা গলায় বলল, বাইরে থেকে অনেক কিছুই শোনা যায়। সব কি তার ঠিক, না সত্যি। কথায় বলে না, জুতো যার পায়ে সে-ই তার কামড়টা টের পায়।

মিহির চিন্তিত হল। তারও সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। এই মর্মান্তিক খবরটা পাবার জন্যেই কি তবে সে এল এখানে? হাওড়ায় নেমে আবার সে মাদ্রাজ মেল ধরে চলে গেলেই পারত। তাহলে দাদার এই গুরুগম্ভীর মুখও তাকে দেখতে হত না, বৌদির সম্বন্ধেও এসব কিছু শুনতে হত না তাকে। তার দাদার কোন্‌খানে যে বৌদি কামড়াচ্ছে, এইটেই তার জানার বড় ইচ্ছে হল। কিন্তু সে আর কিছু বলল না।

রান্নাঘর থেকে আওয়াজ আসছে। মণ্টুর কান্নার শব্দও আসছে মাঝে মাঝে, সেই সঙ্গে দিনুর গলাও শোনা যাচ্ছে একটু-আধটু। কিন্তু বৌদির কোনো সাড়া নেই। কিন্তু সে যে সেখানেই আছে, তা বোঝা যাচ্ছে তার খুন্তি নাড়ার শব্দে।

ধীরেন বলল, দেশ-বিদেশে ঘোরা যায়, এমন একটা চাকরি যদি পেতাম।

—ক্যান্‌ভাসিং?

ধীরেন বলল, কোনো ফার্মের রিপ্রেসেণ্টেটিভ আর কি। টু পাইস আছে বোধ হয় এ কাজে।

মিহির হাসল, বলল, বাইরে থেকে যা শোনা যায়, তার সবই কি ঠিক, না সত্যি?

ধীরেনও হাসল, কিন্তু হাসিটা বড় নিষ্প্রভ, বড় নিষ্প্রাণ। বনলতা তাকে যে মোক্ষম কামড়টা দিয়েছে, তার জ্বালা এখনো জুড়োয় নি। মাঝে মাঝেই সেই আঘাতটায় সে শিউরে শিউরে উঠছে। এত কথাও শিখেছে বনলতা—রুপো আর রূপ। রূপের অহঙ্কার বড়ই বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা—ধীরেন শক্ত হয়ে বসল।

চৌকিতে দু'ভায়ের শোবার ব্যবস্থা হল। মেঝেয় দু'ছেলেকে নিয়ে শুল বনলতা। নানা দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম হল না। এই অতিথি, দুদিন থাকবে বলেছে। কিভাবে যে চালাবে বনলতা, এই তার চিন্তা। ধীরেন তো নির্বিকার; তারও যে চিন্তা হয়েছে তার কোনো চিহ্ন তো দেখা যাচ্ছে না। বরাত-জোর বলতে হবে, তাই আজ চট করে ওই দোকানটায় ধার সে পেয়ে গেল। কিন্তু লোকটার কদর্য চাউনিটা সে ভুলতে পারছে না কিছুতে।

ট্রেনের ধকলে ক্লান্ত হয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে মিহির। কিন্তু তার পাশে তার দাদার চোখে ঘুম নাই। ধীরেন দু-একবার উঠে বসল, অন্ধকারেই পরখ করে দেখার চেষ্টা করল সবাই ঘুমিয়েছে কিনা। দুবার কাশল ধীরেন, কোনো সাড়া না পেয়ে অযথাই 'দুর্গা, দুর্গা, মাগো' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া না পেয়ে সে আস্তে নামল চৌকি থেকে, উঁকি দিয়ে দেখল ডান হাত মন্টুর গায়ের উপর দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে বনলতা। নিশ্চিন্ত হয়ে সে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারত, অথচ শুল না। ঘরে সে পায়চারি করল একটু, চৌকির কাছে দাঁড়িয়ে দেখল মিহির জেগে কি না। তার একটু বাদে খুব সন্তর্পণে চৌকিতে উঠল। চৌকিটা মড়মড় শব্দ করল একটু, থতমত খেয়ে গেল ধীরেন।

আবার সকাল হল। আবার আরম্ভ হল নতুন দিন। বনলতা সকালের কাজকর্ম সারল যথারীতি। ছেলেদের চোখমুখ ধুইয়ে দিয়ে চট করে চলে গেল মুদিখানায়। টুকিটাকি কিসব জিনিসপত্র এনে সে রান্নাঘরের কাজে হাত দিল।

এবার বৌদিকে যেন পাওয়াই যাচ্ছে না কাছে। কেবল রান্নাঘর আর উনুন নিয়েই ব্যস্ত। হাসিঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদ একেবারে নেই-ই যেন আর। আসলে এখানে সে এসেছে বৌদিরই টানে। বৌদির সঙ্গে ঠাট্টা-

তামাশা হাসি-মশকরা বরাবরই সে করে। বনলতা তো প্রাণ খুলেই তাদের সঙ্গে মিলত মিশত। কিন্তু এবার এত আলগা কেন, এইটেই ভারি খারাপ লাগছিল মিহিরের। তাই দুদিন থাকার আগ্রহ আর তার নেই। আজ রাত এগারোটায় যে ট্রেন, সেই ট্রেনেই সে চলে যাবে ঠিক করল।

ভিতরে গিয়ে বৌদির পাশে বসে বলল, আজই পালাবো বৌদি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটা তাগাদার কাজের কথা।

বনলতা বলল, এতই যদি তাড়া, তবে আসা কেন? দাদা কোথায়? তাকে বলেছ?

—সকাল থেকেই তো দেখছি, তিনি কেন যেন ছটফট করছেন। হুট করে বেরিয়ে গেলেন দু বার, হুট করে ফিরে এলেন, আবার বেরিয়েছেন।

বনলতা মুচকে হেসে বলল, ঘর থেকে বেরিয়েছেন তাহলে?

—তার মানে?

—মানে আর কি? কোথাও বেরন না তো! একেবারে জড়ভরত হয়ে গেছেন। ঘটি কাৎ করে হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বনলতা বলল, খুব রেগেছ বোধ হয় ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে বসে একটু কথাও বলতে পারিনি। আমাকে তুমি একেবারে অন্যরকম দেখছ, তাই না?

মেঝেয় জল দিয়ে নিজের নাম আঁকছিল আঙুল দিয়ে, কোনো জবাব দিল না মিহির। একটু বাদে বলল, এমন হয়ে গেলে কেন তোমরা?

ধীরেনের পায়ের শব্দ পেয়ে মিহির উঠে দাঁড়াল, বলল, একটু বাজারের দিকে যাব। ছেলেদুটোর জন্যে একটু মিষ্টি আর আমাদের সবার জন্যে একটা ইলিশ নিয়ে আসি।

বনলতা আম্‌তা আম্‌তা করে বাধা দিল, বলল, আবার ওসব কেন? বেড়াতে এলেই খরচ করতে হবে।

সে কথায় কান না করে মিহির ঘরে চলে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর বেরোয় না। সারা ঘর মিহির তছনছ করে কী যেন খুঁজছে। শেষবেশ

সে গিয়ে স্থির হয়ে বসল চৌকিতে। ধীরেন কোনো সাড়াশব্দ করছে না, আড়চোখে এক একবার চেয়ে দেখছে মাত্র। হাঁটু দুটো বুকের মধ্যে জড়ো করে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

অনেকক্ষণ মিহির বেরল না দেখে একটা কাজের অছিলা নিয়ে ঘরে গিয়েই বনলতা বলল, একি, এখানে চুপচাপ বসে যে।

মিহির বলল, কিছু না। এমনি বসে আছি, কিছু ভালো লাগছে না।

—তবে রান্নাঘরে এস। গল্প করবে।

ধীরেন একবার ফিরে তাকাল মাত্র, কোনো মন্তব্য করল না।

মিহির বলল, থাক্। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, কিন্তু যাবে কোথায় ?

—কি, জিনিসটা কি ঠাকুরপো ?

—মানিব্যাগটা।

ধীরেন আরও একটু শক্ত হয়ে বসে বলল, রাস্তায় কোথায় ফেলেছ, দ্যাখো।

মিহির প্রতিবাদ করল না, ধীরে ধীরে শুধু বলল, রাস্তায় তো আর বেরই নি। চিন্তায় পড়ে গেলাম।

—ছিল কত ? উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল বনলতা।

—বেশি না। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মত হবে। কিন্তু কথা তো তা নয়। ভাইজাগ পর্যন্ত যাই কী করে ? টিকিটের দামটাই ছিল প্রায়। বিমর্ষ হয়ে বসে রইল মিহির।

বনলতার মনে কি বিষ ঢুকতে নেই ? ধীরেনের উপর রুষ্ট হতে কি সেও পারে না ? একবার সে তাকাল তার দিকে কঠিন চোখে। কথা বলছে না পরশু রাত থেকে, তাই কিছু বলল না।

মিহিরকে রান্নার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিঁড়ি পেতে বসতে দিল বনলতা। ভয়ানক লজ্জায় পড়ে গেছে সে। কি যে বলবে, কি যে কৈফিয়ত দেবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। তবু বলল, কী যে করি এখন।

চট করে উঠে বনলতা একবার ঘরে গেল। ধীরেন থতমত খেয়ে ভীত চোখে তাকাল তার দিকে, কিছু বলতে পারল না। বনলতা বলল, যাও, জোগাড় করে নিয়ে এস টাকা। যদি ইজ্জৎ মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে চাও।

—আমি কোথায় পাব? আমাকে চেনেই বা কে, যে, অত টাকা ধার দেবে। ধীরেন ঠিক তেমনি নির্লিপ্ত হয়ে বসে রইল।

বনলতা ব্যাকুল হয়ে বলল, মান-মর্যাদা জ্ঞান তো গেছেই, আরও অনেক কিছু গেছে তোমার।

এ ইঙ্গিতটাও বুঝল ধীরেন। কিন্তু কোনো জবাব দিল না।

বনলতা বলল, তবে আমি বেরোই।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ পরিষ্কার করল, চুল ফাঁপিয়ে নিল, বডিজ পরল, ব্লাউজ পরল, পেঁচিয়ে পরল শাড়ি। ধীরেনের দিকে একটা কঠিন কটাক্ষ করে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। দেখা যাক্।

মিহির বলল, চললে কোথায় বৌদি?

—বাজারে।

—সঙ্গে আসব?

—উঁহু। ছেলেদের নিয়ে গল্প কর। আমি এলাম বলে।

মিহির উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাদাও তো যেতে পারেন। তুমি মেয়েমানুষ, বাজারে যাবে এই ভর-দুপুরে?

—তোমার দাদা কোথাও যান্ না। একেবারে ঘর-কুনো। সারাদিন ঐভাবে বসে।

মিহির আকাশ-পাতাল কি যেন ভেবে নিল এক মুহূর্তে, বলল, দাদার বুঝি চাকরি নেই?

এ কথার জবাব না দিয়ে বনলতা হন্‌হন্ করে হেঁটে চলল। টাটা রোদে মুখের পাউডার তার ঘেমে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম শুষিয়ে নিল।

মণ্ডলদের সেজমেয়ে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, এত সেজেগুজে কোথায় চললে, লতা ?

বনলতা তার দিকে না তাকিয়ে বলল, অভিসারে।

অভিসারে তো বটেই, সে চলেছে জয়কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। লোকটার কাছ থেকে কিছু যদি পাওয়া যায়, এটুকু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

বৃন্দাবন সন্দেশের পরাত নিয়ে বসে সন্দেশ গুনতি করছিল, চোখ তুলে চাইতেই—এ কি, সম্মুখে সশরীরে তার মনের মানুষ হাজির।

মুচকে হেসে বনলতা বলল, বড় ঠেকায় পড়ে এসেছি। কথা রাখবে বল।

বৃন্দাবন চারদিকে চেয়ে দেখল, কেউ নেই। বলল, কি কথা।

ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল বনলতা, বলল, শোধ দেব, শোধ দেব। আজ আবার কিছু নিতে এসেছি। দিতে হবে কিন্তু এক্ষুনি।

ঘরে ফিরে দেখে ধীরেন সিগারেট টানছে। বনলতাকে দেখেই টুকরোটা ফেলে দিল জানলা দিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জানলা দিয়ে। বনলতা বলল, বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিলে বুঝি ? অবস্থা ফিরেছে।

ধীরেন কথা বলতে পারল না। বনলতা তার হাতে কি-যেন গুঁজে দিয়ে বলল, মান রাখতে চাও তো ঠাকুরপোকে নিজে গিয়ে দাও। বল, ব্যাগটা পেলে পরে পাঠিয়ে দেব।

বৃন্দাবন তখন তার দোকানে বসে শিশ দিয়ে গান গাইছে।

দাগ

—তোমাদের ও-সব রাজনীতির কথা ব'লো না আমাকে। ঘাসে একটা দাগ পড়ল না, আর এদিকে বলছ—দু'ভাগ হয়ে গেল দেশটা। ভাগ-টাগ সব ঝুট, আসলে ফারাক হয় নি কিস্‌সু। মোদ্দা কথা শুনে রাখো আমার কাছ থেকে।

সীমান্তের সরাইখানা। দূর থেকে পদ্মার অক্লান্ত গর্জন সরাইখানার বাতার বেড়ায় ঘা খেয়ে অনবরত ফিরে যাচ্ছে। শুধু রাজনীতি কেন—ধর্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, সাম্যবাদ, দাম্পত্য-কলহ— সর্ব বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয় এখানে। তেলকলের মজুর, রেলকুলী, মালবাবু, তারবাবু, ছোটদারোগা, জমাদার, আর্দালী থেকে আরম্ভ ক'রে পেয়াদা বরকন্দাজ ও বামন-পুরুত সবাই এখানে এসে মৌতাত করে থাকে। এর নাম তাই স্বর্গধাম।

মাটির খুড়িতে চুমুক দিতে দিতে নটবর বলল, ঘাসে দাগ পড়েনি কি রকম। পষ্ট দাগ স্বচক্ষে দেখেছি আমি। কাল দেখাব তোদের।

—দেখবো। বিজ্ঞের মত বলল হরিহর।

খুড়িতে আর-একটা চুমুক দিয়ে নটবর বলল, তোরা সব পাঁড় মাতাল। চোখে রং তোদের লেগেই আছে। ঘাসের দাগ দেখবি কি করে?

হরিহর এ-কথায় আপত্তি করল না। সে যেন খুশি হল। যাক, আজ তবে মাতাল ব'লে কদর দেখাল নটবর।

নটবর বলে, আগে সে নাকি খুব টানতে পারত, ভালোও লাগত। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বিয়ে ক'রেই একদম ছেড়ে দিয়েছে। আর ভালো লাগে না। তার বৌ নাকি এসব খাওয়া পছন্দও করেনা। খুড়িটা মুখের উপর উপুড় করে দিয়ে সে বলল।

মানিক চোখ লাল করে মুচকি মুচকি হাসছিল, বলল কালকেও তোকে—

নটবর বলল, উঃ, সে কত দিন হয়ে গেল। সে কি আজ ?

যা নিয়েই আলোচনা করুক, তার মধ্যে বৌ-কে একবার টেনে আনবেই নটবর। এই স্বর্গধামে নটবরের বৌকে চেনে না এমন লোক কেউ নেই। রেলকুলীর শেড থেকে আরম্ভ করে পাটকলের ইয়ার্ড, ফাঁড়ীর বটগাছতলা থেকে জমিদার বাড়ীর দেউরী—সর্বত্র নটবরের বৌ-এর কাহিনী ছড়ানো।

কাহিনী যখন বলে নটবর, তখম মন যেন তার মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সে আবার গুন গুন করে গান গায়। গানের কলি বোঝা যায় না একটাও।

লোকটার গলাও বড় মিষ্টি। গান জানেনা, কিন্তু শিখলে গাইতে পারত। গান না জেনেও যখন গায়, তখন সবাই কান পেতেই শোনে। এই কান পেতে শোনা দেখে নটবর দ্বিগুণ উৎসাহে গাইবার পাত্র নয়। সরাইখানা যখন তার গানের তানে ও পদ্মার গুরুগর্জনে মিশে সত্যিকারের স্বর্গধাম হয়ে উঠি-উঠি করে, অমনি নটবর মাঝ-পথে থেমে গিয়ে বলে, একটা ব্যবসা করতে হবে। বড় সড় কিছুনা—এই ফল-ফুলুড়ির। পদ্মার ওপার থেকে ফেরিতে মাল এনে এপারের টাটকা-বাজারে চড়া দামে ছাড়তে হবে।

—ব্যবসার অভ্যাস-টভ্যাস আছে ?

নটবর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, বলে, আমি কেমন পাকা ব্যবসাদার জানিস্‌নে কেউ। যুদ্ধে যাবার আগে আমার হাইড-স্কীনের ব্যবসা ছিল কানপুরে একচেটে। কী কুক্ষনে সেপাই হলাম—সব বরবাদ হয়ে গেলো।

হো-হো হাসিতে স্বর্গধাম ফেটে পড়ে। হাসির শেষে সবাই বলে, হাউড-স্কীনটা কী ?

—চামড়া, হে, চামড়া।

দেড়-দু'মাস হবে, নটবর এই সরাইখানায় যাতায়াত আরম্ভ করেছে। কিন্তু এরি মধ্যে সে স্বর্গধামের পাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে! সন্ধে লাগার সঙ্গে

সঙ্গে তার এখানে আসা চাই-ই। একমিনিট আসতে যদি কোনো দিন দেরি হয়, অমনি সবাই বলাবলি শুরু করে, লোকটা এখনো আসে না কেন রে?

মালবাবু তারবাবু ও দারোগাবাবুদের কুঠুরি আলাদা। বাতাস ঝাঁপ দিয়ে একটা পার্টিশান করা। ও-পাশে ব'সে তাঁরাও নটবরের কথা শুনে উপভোগ করেন, কিন্তু মন্তব্য করেন না। বেহুঁশ হয়ে গেলেও এটুকু হুঁশ তাঁদের আছে। এ-তল্লাট থেকে তাঁরা নিজেদেরকে পার্টিশান করে রাখেন। নীল কোর্তা প'রে দু'চারটে রেলকুলী ও দু'একজন চৌকীদার তখন নটবরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুড়ি চুষছে। ফাঁক দিয়ে তাঁরা দেখেন শুধু।

নটবর গান গায়—

বাঁশি ডাক দিয়া ডাকাতি করে
কুলবতীর কুল হরে
এমন সর্বনাইশা বাঁশের বাঁশি
কেন বাজায় প্রাণকানাই।
সই, সেই অবধি কলঙ্কিনী রাই।

গান থামলে হরিহর বলল, বেড়ে। বৌ জানে-টানে?

নটবর উৎসাহিত হ'ল, বলল, জানে-টানে মানে কি! যদি তার গান শুনিস্ তবে—

তবে যে কী হবে তা আর বলল না নটবর। লোকটার সব কথাই সবাই বিশ্বাস করে, এমন নয়। কিন্তু তার কথা শুনতে ভালো লাগে সকলের। কথা বলতে জানে বটে লোকটা। যখন সেপাই ছিল তখন কি-ভাবে লড়াই করেছে, তার গল্পও যে প্রায়ই করে। আফ্রিকার মরুভূমিতে তারা ঘাঁটি নিয়েছে, ওদিক থেকে তব্রুক দখল করার জন্যে হুহু করে ছুটে আসছে জার্মান আর্মি। ওরা তখন নাকি বেপরোয়া। নটবরের কাজ ছিল এনিমির ঘাঁটির কাছ-বরাবর গিয়ে আগাম খবর নিয়ে আসা। কতদিন সে কানের কাছ দিয়ে বেঁচে গেছে। সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে দুমদাম বোমা পড়েছে, তার

মধ্যে সে মরুভূমির বালুর উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটিয়ে চলেছে তার মোটর-বাইক। এ কাজে রোমাঞ্চ আছে, এ কাজে লাইফ আছে। সাদা-মাটা মানুষ হলে অমন কাজ করতে কি সে পারত! হুইস্কি আর ব্রাণ্ডি খেয়ে তখন সে বুঁদ হয়ে থাকতো। না, বেহুঁশ ঠিক বলা চলেনা। হুঁশ না থাকলে অমন দায়িত্বের কাজ কি করা যায়।

মানিক চোখ লাল করে গালে হাত দিয়ে ব'সে ব'সে শুনছিলো। এবার একটা চুমুক দিয়ে বলল, স্রেফ গাঁজা।

নটবর চটল না, ধীর ভাবে বলল, মেজর বাগচী সাক্ষী আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।

—তিনি কে?

আমাদের ইউনিটের কামাণ্ডার ছিলেন। এখন রাঁচীতে পোস্টেড্ আছেন। খুব মাইডিয়ার লোক। দারুণ টানতে পারেন। আমার বৌ-কে দেখে ভা-রী খুশি। বললেন, যে এনার্জি নিয়ে লড়াই করেছ, সেই এনার্জি চাই এই নতুন জীবনে। আমি বললাম, শিয়োর।

মুচকি মুচকি হাসলো মানিক আর হরিহর। পার্টিশানের উপরে তারবাবু কান পেতে শুনছিলেন, বললেন, লোকটা করে কি?

মালবাবু বললেন, মাল টানে। গুডস্ নয়, আই মিন্ ওয়াইন্।

নটবর কোথায় থাকে আর কি করে—একথা জানবার আগ্রহই নেই কারো। এই সীমান্তের সরাইখানায় তার আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত না হলেও আকস্মিক। সীমান্তে তিন মাইল তফাতে তফাতে ঘাঁটি বসেছে। জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এইসব ঘাঁটি সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠবে—তার নমুনা দেখা যায় বেশ স্পষ্ট। পদ্মার ওপার থেকে ফেরি নৌকারা এলে তাদের তল্লাসী করা হয়। ফল-ফুলুড়ির ঝাঁকাও বিনা তল্লাসীতে ছেড়ে দেওয়া হয় না। এপারের নৌকো ওপারে গেলেও তাদের এমনি ভাবেই পরীক্ষা করা হয়।

নদীটা যেমনকার তেমনি ব'য়ে চলেছে। তার ঘোলাজল ঘোলাই আছে, মেঘনার জলের মতো কাল্‌চে হয়ে যায়নি। তবু কেন এই ফারাক, কেন এই হাঙ্গামা আর হুজ্জুৎ—তা যেন বুঝে পায়না কেউ। ঘাসেও দাগ পড়েনি একটা, অথচ বুনো-ঘাসের এপারটা আমার, ওপারটা তোমার—এর মানে কি? কিন্তু নটবর নাকি স্পষ্ট দেখেছে দাগ। রোজই অবশ্য বলে, কাল দেখাব তোদের। কিন্তু তার কাল আর আজ পর্যন্ত এলো না।

দূরে তেল-কলে সিটি বাজে। স্বর্গধাম থেকে তফাতে নদীর কিনারে পঞ্চবটী— মহাশ্মশান। তীব্র হুইস্‌লে মহাশ্মশানের শান্তি সচকিত হয়ে ওঠে। গাছের ডালে ডালে কিচমিচ ক'রে ওঠে পাখিরা। নটবর ব'সে থাকে অদূরে। এটা তার দিনের আশ্রয়। সন্ধ্যায় স্বর্গধামে সে স্বর্গসুখ ভোগ করে, আর দিনের আলোয় এখানে ব'সে থাকে স্বর্গসুখের আশায়। তার জীবনটা ছারখার করে দিয়ে গেল অচেনা ওই মেয়েটা। আশ্চর্য মেয়ে বলতে হবে তাকে।

নীল-কোর্তা তার পরনে। কোথা থেকে জোগাড় করেছে, বলা শক্ত। এই একটি জামা ও প্যাণ্ট পরে সে কাটিয়ে দিচ্ছে অনেকদিন।

তারবাবু মালবাবু টালিবাবু ইত্যাদি সবাই মিলে স্টেশনে ব'সে আলাপ করছিলেন। তারবাবু বললেন, গোয়েন্দা নয় তো?

মালবাবু বললেন, ছোটদারোগাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

তারবাবু বললেন, অত সোজা নয় হে কালীপদ। জিজ্ঞেস করলেই চট্‌ ক'রে বলে দেবে।

—ঝোঁকের মাথায় যদি বলে, এই আর কি! লোকটা কিন্তু খুব মিশুকে! দোষের মধ্যে বাজে বকে।

—যুদ্ধ তো মানুষকে মানুষকে রাখেনা। হাড়গোড় গুঁড়ো ক'রে ছাতু করে দেয় একেবারে। টালিবাবু মন্তব্য করলেন, বোমা আর বারুদে—

কালীপদ বললেন, ওর যুদ্ধে যাবার কথা বিশ্বাস করেছ তাহলে দেখছি। তোমাদের বয়স পেকেছে, বুদ্ধি পাকেনি আজো। লোকটা ডাহা লায়ার।

টালিবাবু বললেন, কালীপদ্দার এ-কথা মানতে রাজি না। রায় একটা দিলেই তো হলনা। প্রমাণ করুন, সব কথা ওর মিথ্যে।

একটা কুৎসিত উপমা দিতে যাচ্ছিলেন মালবাবু। কিন্তু থেমে গেলেন। বললেন, একদিন ছুটি নিয়ে ওকে ফলো করব। দেখি শালা সারাদিন কী করে।

সেদিন সন্ধ্যায় নটবর স্বর্গধামে এসে পৌছল অনেক দেরিতে। কৈফিয়ত কেউ চায়নি, কিন্তু নটবর বলতে লাগল, সাংঘাতিক দেরি হ'য়ে গেল আজ। কিস্তে ছাড়বেনা আজ, কাল মুখে গন্ধ পেয়েছে। আজ তাই বাড়িতে বন্দী রাখার ইচ্ছে ছিল আর-কি।

—ঘর কদ্দূর? জিজ্ঞেস করল মানিক।

—কোশ তিন তো হবেই। এখান থেকে চিংমারীই তো চার মাইল পথ। তারপর ঝলমলের সাঁকো, তারও ওপারে।

নটবর বসল, বলল, আজ তোদের খাওয়া দেখবো শুধু। গা ছুঁইয়ে প্রমিস্ করিয়ে নিয়েছে আজ।

হরিহর বলল, মেয়ে-মানষের গা ছুঁয়েছিস্, মরদেরই কাজ করেছিস্। তাতে খাওয়া বন্ধ হবে কেন। দে, মানিক এগিয়ে দে ওকে।

আপত্তি যখন কেউ শুনবেইনা, অগত্যা তখন রাজিই যেন হয়ে যেতে হল তাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন সে মুখ বিকৃত ক'রে ক'রে খেতে আরম্ভ করল। খেতে আরম্ভ সে করল বটে, কিন্তু খাওয়া তার থামতে চায় না কিছুতে। নটবর শেষে বেশ বেহুঁশ হ'য়ে গেল।

লোকটা বেহুঁশ নাকি হয় না? আফ্রিকার মরুভূমিতে এ নাকি আগাম খবর নিয়ে এসেছে বিস্তর। আজ তার এই অবস্থা দেখে মানিক হরিহর হো-হো করে হাসতে লাগল। এই উৎকট হাসির শব্দে পার্টিশন যেন ভেঙে গেল। মালবাবু মুখ বার ক'রে বললেন, ব্যাপার কি হে।

ব্যাপার নাকি গুরুতর। জীবনে যে হুঁশ হারায়নি কোনোদিন, আজ সে বেহুঁশ হয়ে গেছে। তাই। আনন্দ করছে তারা।

ছোটদারোগাও উঁকি দিলেন। ছোটদারোগাকে এগিয়ে আসতে দেখে মালবাবু উৎসাহে ব'লে উঠলেন, স্পাই। আপনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন ওকে।

কিছু না ব'লে ছোটদারোগা পার্টিশনের ওপারে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

মালবাবু উৎসাহে বলে উঠলেন, চিনতে পারলেন না। ও বোধ হয় গোয়েন্দা। কি বলেন, ঠিক না?

—কি জানি। হতেও পারে।

মালবাবু টালিবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। নির্ঘাৎ ধ'রে ফেলেছেন তিনি, আর পার পাবার জো নেই নটবরের। এবার একদিন হাতে-নাতে ধ'রে ফেলতে হবে তা'কে। একদিন ফলো করবেনই।

দুদিন বাদে মালবাবু সত্যিই একদিন বেরোলেন। টালিবাবুর মন্তব্যের পর থেকে তাঁর যেন রোখ চেপে গেছে। মালবাবু তার পিছু পিছু চলতে চলতে চিলমারী পেরিয়ে সাঁকোয় উঠলেন। দূর থেকে দেখলেন নটবর নদীর ঢালুতে নামছে, সেখান থেকে নদীর পার ভেঙে উঠতে লাগল পঞ্চবটীর দিকে। ওদিকে তো লোকালয় নেই, তবু ওদিকে নটবর কেন গেল বুঝতে পারলেন না তিনি। একটু পরেই পঞ্চবটীর বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল নটবর।

গুটিগুটি পায়ে চললেন কালীপদ তরফদার—দিঘরা স্টেশনের মালবাবু। তিনিও পঞ্চবটীতে উঠলেন। গাছের আড়াল থেকে দেখলেন, নটবর নীল প্যাণ্ট পরে জোড়াসন হয়ে মাটির মধ্যে বসে আছে। চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগোলেন কালীপদ। নটবরের পিছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, একা এখানে বসে যে?

নটবর চমকে উঠল। মালবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

—দোকলা পাব কোথায়, মালবাবু! আমি একা, আমি ফাঁকা।

—তার মানে। পাশে ঘনা হয়ে বসলেন মালবাবু, বললেন, কথাটা ঠিক যেন বুঝতে পারলাম না।

নটবর বলল, বোঝা শক্ত। বুঝবেন কি করে আপনারা!

—বললেই বুঝতে পারব।

নটবব বলে গেল। পদ্মার ওপারে থাকতো একটি মেয়ে, তার নাম চামেলী। চামেলীর সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় পাকাপাকি, এমন সময় দেশ দু'ভাগ হ'য়ে গেল। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল, এদিক সেদিক। তখন সে-ও পালালো চামেনীকে নিয়ে। কিন্তু ওই পদ্মা, ওই পদ্মায় উলটে গেলো নৌকা। ডুবে গেল চামেলী। তারপর তাকে উদ্ধার সে করেছিল। তাকে পুড়িয়ে সে ফেলছে। কিন্তু কেন যে মায়া কাটছেনা, তা বুঝতেই পারছে না সে। তাই রোজ তাকে বসে থাকতে হচ্ছে এখানে। এ-জায়গা সে ছাড়তে পারছে না।

মালবাবু বললেন, এত বৌ-এর গল্প বলতে, সব বুঝি ঝুট!—

নটবর বললো, একটা কথাও মিথ্যে নয়। ও বেঁচে থাকলে নিশ্চয় আমার স্বভাব বদলে দিত। হলপ করে একথা বলতে পারি মালবাবু, বিশ্বাস করুন আমাকে। ও থাকলে শুঁড়িখানায় আমাকে কিছুতে আপনারা পেতেন না।

বিরক্ত হয়ে মালবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, যত সব—

ঢালু পথে নেমে ঝলমলের সাঁকো পার হয়ে হন-হন ক'রে চ'লে গেলেন তিনি দিঘরার দিকে।

মহিমের ফ্লুট

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন গ্র্যাণ্ড অপেরার একজন আর্টিস্ট। আমাদের সঙ্গে তখন একজন কাজে বহাল ছিল, তার নামটা আজো মনে আছে— মহিম।

আমি আর্টিস্ট ছিলাম বটে, কিন্তু স্টেজে নামতাম খুব কম। অভিনয় আমার ধাতে পোষাত না, এখনো পোষায় না। খুব ঠেকে গেলে দু-একবার অবশ্য নামতেই হত। একবার নেমেছিলাম সেপাই হয়ে, কেবল তলোয়ার ঘুরিয়ে বীরের ভঙ্গি দেখানোই ছিল একটা সিনের ছোট একটা কাজ; আর একবার নেমেছিলাম গিরিশের প্রফুল্ল নাটকে কী-একটা যেন ছোট ভূমিকায়। আমার আসল যা কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে সিন-পেন্টিং। গ্র্যাণ্ড অপেরার সত্যিকারের আর্টিস্ট ছিলাম আমি একাই; আর যারা ছিল তারা নামেই আর্টিস্ট, আসলে তারা অভিনেতা— যাকে বলে নট-নটী।

মহিম বাজাত ফ্লুট। উঃ, কী তার সুর, কী তার দম, কি তার আমেজ। মহিমের ফ্লুট যে শুনেছে সে আর ভুলতে পারে নি।

এখনকার মতন তখন রঙ্গমঞ্চের এত আদবকায়দা হয় নি। পায়ের কাছে জ্বলত গ্যাসের ফুট-লাইট; আর উইংসের আড়ালে বসানো থাকত খুব তেজী আলোর ডে-লাইট। প্রত্যেক সিনের পর দু-মিনিট আন্দাজ কনসার্ট বাজত। এক-এক অঙ্কের পর প্রায় পনের মিনিট করে। আসলে, বলতে গেলে, এই কনসার্টই ছিল গ্র্যাণ্ড অপেরার একটা মস্ত আকর্ষণ। আমাদের কনসার্টের নাম ছিল বাজারে খুব। একে সবাই চিনত এক নামে— মহিমের ফ্লুট। আমাদের থিয়েটারের হিরোইনও খুব নাম করেছিল সেকালে। এখন তার নাম কেউ করেও না, আমরাও প্রায় ভুলে গিয়েছি। তার নাম ছিল লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ছিল আবার দুটো। এর নামের পাশে তাই ব্র্যাকেটে লিখে দেওয়া হত— ছোট। কী তার গানের গলা, আর কী তার পায়ের নাচ।

কনসার্ট এংকোর পেয়েছে, কেউ শুনেছ কোথাও? কিন্তু এংকোর আদায় করেছিল আমাদের মহিম। সেবার প্লে হচ্ছে জনা, জনার ভূমিকায় নেমেছে ছোটলক্ষ্মী। শহর সরগরম। আজকাল তোমরা যাকে বল হাউস-ফুল, তার চেয়েও বেশি ভিড়। তখন বসার জায়গা ভরতি হয়ে গেলে বাড়তি চেয়ার দেওয়া হত; তাতেও না কুলালে লোকে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্লে দেখত। তখন সেই অবস্থা। এমনি একদিন দ্বিতীয় অঙ্কের পর ড্রপ পড়েছে, কনসার্ট উঠেছে বেজে। মহিমের ফ্লুট সব সুর ছাপিয়ে হাউস মাতিয়ে তুলেছে। পনের কি বিশ মিনিট বেজে চলেছে কনসার্ট। তারপর যেই কনসার্ট থেমেছে, অমনি হাউস-সুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল,— এংকোর, এংকোর। ড্রপ উঠিউঠি করছিল, তোলা হল না। আবার দশ মিনিট আন্দাজ কনসার্ট বাজিয়ে শোনানো হল। লোকে এত আগ্রহে জনা দেখতে এসেছে, কিন্তু জনার কথা ভুলে গিয়ে তারা মহিমের ফ্লুটকে দিল এংকোর।

এমন যে বাজিয়ে মহিম, তার না ছিল চাল, না ছিল চটক, তাই না ছিল চাল না ছিল চুলো।

বললে খারাপ শোনাবে, কিন্তু তবুও সাচ্চা কথাটা বলেই ফেলি। গ্র্যাণ্ড অপেরার আমরা সবাই ছিলাম এক-এক জন পয়লা নম্বরের লোচ্চা। কী না করেছি জীবনে? তার ফল ভুগছি এই শেষ বয়সে। যাক সে কথা। আমরা সবাই দল বেঁধে লুচ্চামি করতাম, তার মধ্যে দেখতাম মহিম একলা একটি কোণ দখল ক'রে চুপচাপ বসে আছে। সাতে-পাঁচে ছিল না সে। তাছাড়া কি জান? তার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতও না কোনো লোক, মানে, মেয়েলোক। একেবারে বদখত চেহারা। লম্বা লম্বা গোঁফ বেঁকে গিয়ে ঢুকে পড়ত মুখের মধ্যে। কালো চিমড়ে চেহারা। তার জন্যে মায়া হত।

মায়া তো হত, কিন্তু তার মধ্যেও তার জন্যে টান ছিল আমাদের সকলের। তাকে সমীহও করতাম আমরা। সে তার অন্য কোনো গুণের জন্যে নয়— তার ওই ফ্লুট বাজানোর কায়দা দেখে। লোকটা কোথা থেকে যে পেল এই দাম, আর কোথা থেকে পেল এই সুর— আমরা ভেবেই তার কুলকিনারা করতে পারতাম না।

মহিমের কথা যদি একবার বলতে আরম্ভ করি তাহলে আর শেষ করা যায় না। কত বছর কেটে গেছে, কিন্তু তার কথা কেন-যেন ভোলাই যায় না। আরও, তার ফ্লুট আমাদের কানের মধ্যে বেজে চলেছে একটানা। বয়স হয়ে গিয়েছে, অল্পেই ঝিম এসে যায় আজকাল। সেই তন্দ্রার মধ্যে আজও শুনি মহিমের ফ্লুট। কী তার মিষ্টি আওয়াজ। সেদিন, জান, এক কাণ্ড করে বসেছিলাম। ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম এংকোর ব'লে।

নিজের গলার শব্দে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। অমনি দরজার শব্দ শুনলাম। কে যেন ডাকে।

উঠে গিয়ে খিল খুলেই দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক অপ্সরী। বাড়িয়ে বলছি নে। গ্র্যাণ্ড অপেরার দৌলতে অনেক সুন্দরী দেখেছি, অনেক রূপ দেখেছি। কিন্তু এমনটি দেখিনি কখনো। বয়স হয়েছে তার, বার্ধক্যে চুল পেকেছে। কিন্তু রূপ তবু যেন ঠিকরে বা'র হচ্ছে সারা শরীর দিয়ে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমার নাম ক'রে যে, আমি গ্র্যাণ্ড অপেরার সেই আর্টিস্ট কি না। চমকে গেলাম, বললাম, তুমি কে?

কি বলল জানো? বলল, সে মহিমের স্ত্রী। চারদিন আগে মহিম নাকি গত হয়েছে। মহিমের পুরনো বন্ধুদের সে খোঁজ করে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ঘটনাটা কিছু না। মহিম তার ফ্লুটের দম পেত কোথা থেকে, তা যেন আমার কাছে সেইদিন ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে গেল। বল, পরিষ্কার হল না? বিশ্বাস যদি না করবে, তাহলে ঘাঁটাতে এলে কেন?

কপাল

আজ অপূর্বকৃষ্ণ মারা যাচ্ছেন।

অনেকদিন বাঁচলেন তিনি। আশি বছর।

কিন্তু এই দীর্ঘ আশি বছরের মধ্যে তিনি একটা দিনও আক্ষেপ করলেন না। সারাটা জীবন বাঁচার মত বাঁচতে পারলে আক্ষেপ করার সুযোগ অবশ্য ঘটে না।

কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণকে যাঁরা জানেন, তাঁরা দেখছেন যে, তাঁর জীবনটাই অপূর্ব। তিনি যেভাবে বেঁচেছেন, তাকে বাঁচার মত বাঁচা বলা যায় না।

তিনি নাকি দান করেই ফতুর। আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়স সত্তর হবে। গায়ের রং যতটা কালো, মাথার চুল ও গালের দাড়ি সেই অনুপাতে সাদা। সেদিন ছিল শীতের সকাল। বারান্দার কোণে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে, সেই রোদের লোভে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম, খাকি রঙের ফুল-হাতা উলের একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে তিনি এসে ওপাশে দাঁড়ালেন। রাস্তার ওপাশে নয়, রোদের ওপাশে—যাতে রোদ আড়াল না হয়।

বললেন, অনেকটা গায়ে পড়েই তিনি বললেন, বাবুমশায় শীত ধরেছে বুঝি?

ভাষাটা ব্যঙ্গের মত শোনাল, কিন্তু গলার স্বরে কোনো ব্যঙ্গ ঠেকল না। প্রথমে জবাব দিলাম না।

ফের বললেন, অঘ্রাণেই শীতের এই ধার, পৌষ মাস তো পড়েই আছে।

কথার জবাব না পেয়েও তাঁর উৎসাহ কমল না। দু পা এগিয়ে রোদের এপাশে চলে এলেন।

বেঁটে আর খাটো লোকটা। কিন্তু বেশ মজবুত।

কাছে সরে আসায় তাঁর আপাদমস্তক দেখার একটু সুবিধেই যেন হল। দেখলাম, মুখভরা সাদা দাড়ির ভিতর থেকে দুটো চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে, সে চোখ দুটো বেশ ঘোলাটে।

উলের জামার জায়গায় জায়গায় পোকায় কাটা।

একটু থেমে বললেন, চাউলের কী দর। অগ্রহায়ণ মাস, হায়ণের সাক্ষাৎ নাই।

কথার মানে বোঝা গেল না। বললাম, কিসের কথা বলছেন ?

—কই কি আর! কই বহুব্রীহির কথা। আমাদের বাল্যের কথা স্মরণ হয়।

এই কঠিন সাধুভাষা শুনে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হল। বললাম, থাকা হয় কোথায় ?

—পাশেই। আপনার ঘরের ঠিক কিনারে। আমি বাসুর ঠাকুরদা। বাসুকে চেনেন না ?

বললাম, নাম শুনেছি। দেখছিও বোধ হয়। আপনিই তার ঠাকুরদা বুঝি ? আপনার কথাই তাহলে ও খুব বলে।

—মিথ্যা কথা। আমার কথা নাতিরা একটুও বলে না। ওসব আপনার বানানো। মিছে কথা।

অপ্রতিভই হলাম একটু। বাসু ছেলেটাকে চিনি, অবশ্য বাসু বলে যাকে মনে হচ্ছে, সে যদি সত্যি বাসু হয়। ছেলেটার মুখে তার ঠাকুরদার গল্প মাঝে-মাঝে শুনেছি বলেই যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু যা শুনেছি, তা যদি ঠাকুরদাকে বলি, তাহলে তিনি উল্লসিত হবেন না নিশ্চয়ই। বাসুরা বেশি কিছু বলে না অবশ্য। তাদের মোট বক্তব্য এই— তাদের ঠাকুরদা একজন ডাহা আহাম্মক।

আহাম্মকই হবেন তাহলে অপূর্বকৃষ্ণ। তাই হয়তো আজ তিনি মারা যাচ্ছেন। এই আশি বছর বয়সে তাঁর জীবন আজ শেষ হচ্ছে। শেষ দেখা

দেবার জন্যে দলে দলে লোক আসছে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি দেখে। এরা সবাই নাকি তাঁর আত্মীয়। আজ বাসুরা এখানে নেই—তারা এক বছর আগে তাদের বাপের সঙ্গে বদ্‌লি হয়ে বাঁকুড়া গেছে।

মৃত্যুশয্যায় একা-একা পড়ে থেকে এত লোককে অভ্যর্থনা করা খুবই কঠিন কাজ। অপূর্বকৃষ্ণ এ কাজ বেশ স্বচ্ছন্দে করছেন। জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে এসে শেষমুহূর্তে মোক্ষম হোঁচট খাওয়ার মানুষ তিনি নন, এই দশ বছরের পরিচয়ে সেটুকু ঠাহর করতে পেরেছি।

দশটা বছর খুব একটা লম্বা সময় নয়। দেখতে দেখতে কেটে যায়। গত দশ বছর আমার অপূর্বকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে কেটে গেল। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক শরৎ হোক— সেই খাকি রঙের ফুল-হাতা জামা গায়ে দিয়ে গুটি-গুটি পায়ে তিনি প্রত্যহ বিকেলে এসে আমার দাওয়ায় বসতেন। রোজ এভাবে আমাকে আটকে রাখায় বিরক্ত লাগত একটু-আধটু। কিন্তু তবু কোনোদিন ধৈর্য হারাইনি। এক মনে শুনে গিয়েছি তাঁর কথা। আজ তিনি মারা যাচ্ছেন। আজ তাই বারান্দাটা কেমন ফাঁকা ঠেকছে।

—আমার একটা মাত্র শখ ছিল শিকার করা। হাতি-গণ্ডার নয়— পাখি। আরও একটা যেটা ছিল, সেটা শখ নয়, সুখ।

—সেটা কি ?

—আপনারা যাকে বলেন বিশ্বপ্রেম। আত্মীয়-বন্ধু—সকলকে নিজের বলে ভাবা। তালাইমারীতে জমি ছিল পাঁচ একর, যেমন ধান হত, তেমনি হত সরষে। নশিপুরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়, সেখানে আমার নিবাস। বাপের এক বেটা আমি। বাপ মরলে লাট বনে গেলাম। তালাই-মারী, আবদুলপুর, বীরকুৎসা— পাশাপাশি এই তিন গাঁ ; সেখানকার আমি ছিলেম রাজা।

মহামহিমান্বিত সেই প্রাক্তন সম্রাট্ আমার দাওয়ায় বসে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে আমাকে সম্বোধন করছেন বাবুমশায় বলে।

—আপনার সে রাজত্ব কোথায়?

—বেঁটে দিয়েছি। যা ছিল একার ভোগ, তাকে করে দিয়েছি দশের ভাগ। এটার কথাই বলছিলাম, এটা আমার সুখ।

—আজ সে আরাম কেমন লাগছে?

—বেশ। ভালোই। কিন্তু বুঝে পাই নে, দুনিয়াটা সত্যিই বেইমান কি না।

—কক্‌খনো না।

—হবে।

এটা আক্ষেপ হয়তো নয়, এটা অবিশ্বাস। পৃথিবীটা বেইমান হলেও তাঁর যেন কিছু বলার নেই। বেইমান কি না— কেবল এইটুকুই যেন তাঁর জানার ইচ্ছে।

—একদিন আপনার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে হবে।

কথা তো প্রত্যহই হচ্ছে! হারিকেনের আলো তাঁর সাদা চুল ও দাড়ির উপর পড়ে চোখ দুটোকে আরও যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। ভাবছিলাম, ইনিই কি তবে সেই নশিপুরের রাজা। তাঁর রাজ্যের কথা তাঁর যেমন স্মরণ হয়, আমার বাল্যের কথা আমারও তেমনি স্মরণ হল। সমস্ত স্মৃতিকে আরও মন্থন করে আরও অমৃত ও হলাহল পেতে লাগলাম যেন। তাঁর শখের ও সুখের কথা তিনি বলেছেন। সে-শখ আর সে-সুখ সম্বন্ধে আমরাও যেন শুনেছি অনেক।

ভুজঙ্গডাঙার পাঁচ সনের বন্যার কথা আজ হয়তো বেশি লোকের মনে নেই। সেই বন্যার সঙ্গে আরও একটা প্রবল বন্যা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। ভাবের ঘোরে লোকে তার আখ্যা দিয়েছিল প্রাণের বন্যা। নশিপুরের রাজা তাঁর প্রাণকে সেই বন্যার মত তোড়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন নাকি। সেটা তো একটা

কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে-রাজার নাম ছিল হরিয়াল। বাসুর ঠাকুরদা লোকটা তবে কে? একদিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলার আগ্রহ আছে লোকটার। কী কথা বলার জন্যে তাঁর প্রাণ ছটফট করে উঠেছে, তা জানার জন্যে আমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

কেরোসিনের লাল তেলে বড় ধোঁয়া হয়। হারিকেনের চিমনিতে কালি পড়ে গেছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। পলতেটা কেটে সমান করা দরকার। আবছা আলোয় বাসুর ঠাকুরদাকে হঠাৎ যেন মনে হল কালোপাথরে কোঁদা প্রাগৈতিহাসিক আমলের কোনো একটা কঠিন মূর্তির ভগ্নাবশেষ।

বললাম, একদিন ভালো করে কথা বলব আপনার সঙ্গে। কবে সময় হবে, বলুন।

—সময়? একদিন বলে ফেললেই হল।

—আজ?

—না, আজ না।

পরদিন থেকে দেখি, বাসুর ঠাকুরদা নেই। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারে না। কবে আসবেন, তাও কেউ জানে না। একটা কথা বলার আশ্বাস দিয়ে এভাবে উধাও হবার মানে বোঝা গেল না। ইচ্ছে হতে লাগল, একবার খুঁজতে বেরোই। কিন্তু পাগলের পিছন-পিছন পাগলামি করে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহ হবার কথা নয়।

—এই বাসু, শোন্।

বাসুকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, বুড়োটা কই রে?

—বাবা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজ করবে না, কর্ম করবে না, কেবল শুয়ে থাকবে। মাকে আবার ধমক দেয়।

—মা করেছিলেন কি?

—কে জানে!

বাসু ছুটে পালিয়ে গেল।

পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে লোকটার।

আজকের লোক সে নয়। ছেলের প্রহারের চোটে কতদূর সে চলে যেতে পারে, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কেবলই যেন মনে হচ্ছিল, ফিরে সে আসবে। টাটকা অভিমানে হয়তো কোথাও গিয়ে হাজির হয়েছে, ছেলের টানে আবার ফিরে তাকে আসতেই হবে।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন। চতুর্থ দিন গভীর রাত্রে কে-যেন আমাকে ডাকল। ডাক শুনে ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু চট করে সাড়া দিলাম না। কান পেতে শুয়ে রইলাম। আবার ডাক শুনলাম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, কে ?

—আমি অপূর্বকৃষ্ণ।

অপূর্ব কৃষ্ণই বটে। যেমন কালো, তেমনি অদ্ভুত। এতটা বয়স হয়েছে, কিন্তু সে অনুপাতে বার্ধক্য যেন আসে নি। উঠে গিয়ে দরজা খুলে বললাম, হঠাৎ ?

—এসে পড়লাম। যাই কোথায়, কন্ ?

—আসুন। তারপর, এত রাত্রে ?

কোনো জবাব না দিয়ে জলচৌকিটার উপর বসে পড়লেন, বললেন, একটু ঘুমুবো।

—বিছানা-বালিশ—

—কিচ্ছু দরকার হবে না। আলো কমিয়ে দিচ্ছি, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আমিও একটু ঝিমিয়ে নিই।

বিব্রত হয়ে পড়লাম। অপূর্বকৃষ্ণ আমাকে যেন আদেশ করলেন এবার। বললেন, শুয়ে পড়ুন আপনি।

শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু ঘুম আর এল না। একটা জীবন্ত মানুষ অদূরে জলচৌকির উপর বসে ঝিমুচ্ছে, আর আমি চৌকির উপর টান হয়ে শুয়ে

আছি। এই অবস্থাটাই ঘুম না পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তার উপর, যিনি ও-ভাবে এখানে বসে আছেন, তিনি যে এককালের কোনো-এক দেশের একজন রাজা !

শুয়ে শুয়ে রাজার মুখ দেখছিলাম। সে মুখের উপর লোকালয়ের কোনো চিহ্ন মাত্র যেন নেই, একটা নিছক শ্মশানের কঙ্কাল পড়ে আছে। হারিকেনটা দপ্‌দপ্ করে কাঁপতে লাগল। ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। এই ঘরে আরও একজনের প্রাণ শেষ হয়ে যাবার জন্যে অমনি যেন দপ্‌দপ্ করছে বলে মনে হতে লাগল আমার। একটু চোখ বুজেছিলাম, চেয়ে দেখি আলোটা নিভে গেছে। অপূর্বকৃষ্ণকেও দেখা যাচ্ছে না আর। কান পেতে শুয়ে আছি, নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন একটু একটু।

চারদিক নিঝুম। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। চোখ বুজে বুজে আমি অপূর্বকৃষ্ণের চেহারাটা স্মরণ করছি। মনে হচ্ছে—হারিকেনটার মত ও-ও যদি ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বাসুর বাবা আর ওকে মারতে পারবে না। লোকটা বেঁচে যাবে তাহলে।

—ঘুমলেন নাকি ?

হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম।

ঢোক গিলে বললাম, ভোর হতে হয়তো আর বাকী নেই, তাই ভাবছি, আর ঘুমিয়ে কাজ কি ? কোথায় ছিলেন, এ ক'দিন ?

—নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় নয়। কয়েকটা দিন এদিক-ওদিক ঘুরে এলাম।

—বয়স হয়েছে, এখন আর এদিক-ওদিক না ঘোরাই ভালো।

অন্ধকারে কেউ কারো মুখের ভাব দেখতে পাচ্ছিনে, দুজনের পক্ষেই এটা যেন মস্ত সুবিধে। বললাম, বাসু বলছিল, কি নাকি গণ্ডগোল হয়েছিল বাসায়—

—ছেলেমানুষের কথায় কান দিতে নেই। কতটুকু বোঝে ও ? ওর বাপটা একটু রাগী-গোছের, চট করেই চটে যায়। এই আর-কি।

আবার ঘরময় স্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনেই চুপচাপ রয়ে গেলাম। কে আগে কথা তুলবে, দু'জনেই যেন তাই ভাবছি। আমি বেশি কিছু ভাবছিনে। আমি ভাবছি কেবল ওই লোকটার কথা। লোকটা এবার খতম হয়ে যায় না কেন, অনবরতই তাই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ তাঁর গলা বেজে উঠল। অদ্ভুত আর ভৌতিক সে আওয়াজ। বললেন, ভুজঙ্গডাঙ্গার নাম শুনেছেন?

—ভুজঙ্গডাঙ্গা? প্রতিধ্বনি করে উঠলাম, বললাম, শুনেছি। কেন বলুন তো?

—সেই ভুজঙ্গডাঙ্গার কালভুজঙ্গ ওই বিপিন— বাসুর বাপ। বন্যায় ভেসে গেল সারা গাঁ, সেই বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি।

উঠে বসলাম, বললাম, তারপর?

—তারপর কিছু না। ভেসে যাচ্ছিল, টেনে তুলে নিয়ে এলাম। আমার ছেলে ও নয়। ছেলে কখনো বুড়ো বাপকে—

বুঝলাম।

—তারপর তাকে গড়ে-পিটে মানুষ করলাম, বিয়ে দিলাম। আমার বাপের এক বেটা আমি, আমারও ও এক বেটা— এই আমি ভাবতাম। কিন্তু বড় বেইমান হয়ে গেল। কেন আমি ওর জন্যে সব পুঁজি করে রাখলাম না, আজ কেন ওকে এই বস্তীতে এনে ঘর পাততে হল, এই ওর রাগ। লোকে আমাকে ভালোবেসে বলত হরিয়াল, বিপিন তা বাঁকা ক'রে বলে—ঘোড়েল। পাখি শিকার করে আর কিছু পাই না-পাই, খেতাব জুটেছিল একটা।

—বাসু তবে আপনার সত্যিকারের নাতি নয়?

অপূর্বকৃষ্ণ জবাব দিলেন না।

অন্ধকার ঘরের সেই অপূর্ব জীব অপূর্বকৃষ্ণ আজ মারা যাচ্ছেন। রাস্তায় কল-কোলাহলের আজ অন্ত নেই।

ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসি, লোকটা হাসছে না কাঁদছে। বিপিনরা গত বছর চলে গেছে বাঁকুড়া। লোকটার তদারক-তদ্বির করছে কে—জানার আগ্রহ হতে লাগল খুব।

গুটিগুটি পায়ে বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ালাম। দশ বছর আগে এক শীতের সকালে এইখানে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বাবুমশায় বলে সম্বোধন করেছিল ওই লোকটা। আজ তার মৃত্যুর দিনে সেই রাস্তা আনন্দ-কোলাহলে সরগরম হয়ে উঠেছে।

—লোকটা যেমন ছিল বেকুব, তেমনি বেইমান।

—পক্ষপাত ছিল ভয়ানক। দাতাকর্ণ না হাতি, দান করত লোক বেছে।

—অনেক আগে মরলে এই কষ্টটা পেত না।

—পাপের ফল তো আছেই। টাকা ওড়াবার পরিণাম তো আছে একটা।

—কেউ ওড়ায় বদ্‌খেয়ালে, কেউ ওড়ায় খামখেয়ালে। সারা জন্ম যে রাজপ্রাসাদে কাটাতে পারত, আজ সে নর্দমার পাশে খড়ের ঘরে শুয়ে খাবি খাচ্ছে। ছোঃ।

—এতই উচাটন মন যে, একটা বিয়ে করার ফুরসৎ পেল না।

—সে কি কথা ? বিপিনটা তবে কে ?

শেষ মুহূর্তের এই শুভাশিস্ গ্রহণ করে অপূর্বকৃষ্ণ যখন সত্যিই মারা গেলেন, তখন ভিড় পাতলা হয়ে গেছে।

নালাটা পার হয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে উঁকি দিলাম। একটা বিরাট হরিয়াল ঘায়েল হয়ে পড়ে আছে একা। শিকারীরা সব হাওয়া হয়ে গেছে।

কচ ও কেটি

শুর্পা স্টেশনে ললিত এ. এস. এম. হয়ে যেদিন যাত্রা করল, তারপর আজ পাঁচ বছর কেটে গেছে। এ ক'টা বছর আমাদের আর দেখা হয়নি, কিন্তু চিঠি মারফত যোগাযোগ বজায় রেখে আসছি।

ললিতকে আমরা ক্ল্যারিয়োনেট্ ব'লে ডাকতাম। কেউ কেউ আবার ওকে বলত কুকুর।

এর কারণ ললিতের টান ছিল ছ'টি পদার্থের উপর। সে ছটি হচ্ছে ক্ল্যারিয়োনেট্ আর কুকুর। এখন নাকি ও আবার বিয়ে ক'রেছে, বৌয়ের নাম নাকি কণিকা। ললিতের জীবনটা যেন ক দ্বারা কর্কশ হয়ে উঠেছে ব'লে ঠেকে।

ক্ল্যারিয়োনেট্ কুকুর আর কণিকা।

কিন্তু ইদানীং তার চিঠিতে ক্ল্যারিয়োনেট আর পাইনে, কেবল কুকুর আর কণিকার কথায় ঠাসা। তার মধ্যে অবশ্য কুকুরেরই প্রাধান্য চোখে পড়ে।

একটা চিঠি পেলাম। আমাকে যেতে লিখেছে। কণিকার নাকি অনুরোধ। তার স্বামীর এত অন্তরঙ্গ বন্ধু আমি, আমাকে তাই নাকি দেখতে চায়। তাছাড়াও আমার নাকি যাওয়া দরকার তার পোষা এক জোড়া কুকুর দেখার জন্যেই বিশেষত।

কিন্তু আমার দিক থেকে আগ্রহটা অবশ্য এল কণিকাকে দেখার জন্যেই প্রধানত, অছিলা অবশ্য রইল কুকুর।

স্টেশনে ললিত ছিল। আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়েই সে বলল, বাব্বা, তুমিও তো কুকুরের কম ভক্ত নও হে। এতদিন এতভাবে সেধে কাজ হলনা, আর আজ!

বললাম, চল্। বিয়ে করলি, জানালি নে—আবার কথা বলিস্!

বলল, সে এক রোমান্টিক ব্যাপার, পরে শুনিস্।

রোমান্টিক ব্যাপারের গল্পটা আর শোনা হলনা। চোখের সামনে সর্বদার জন্যে রোমান্টিক ব্যাপার দেখতে লাগলাম। ললিত ও কণিকা অবশ্য এ-ব্যাপারের নায়ক-নায়িকা নয়। এর নায়ক কচ ও নায়িকা কেটি।

ললিত বলল, ত্যাখ, ভালোবাসা জিনিসটা শুধু মানুষের একচেটে ব্যবসা নয়, জন্তু-জানোয়ারও এর বেসাতি একটু-আধটু জানে।

বললাম, এ-দুটি রসিক-রসিকাকে জোগাড় করলি কোত্থেকে।

—একটা কিনে এনেছি কটক থেকে—ওই কচকে। আর মাদীটা কিনেছি কাঁথীর এক ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসিছিলেন, তাঁর কাছ থেকে।

বললাম, ক ছাড়া আর কথা নেই দেখছি। ক দিয়ে জীবনটা তুই কর্কশ করে তুললি-যে।

—কর্কশ! ললিত হো হো করে হেসে উঠল, এত রসের প্লাবন, তবু বলছিস কর্কশ? ক্রেঙ্কারেও ক আছে, কাকলীতেও ক আছে। আমার জীবন খুবই কোমলতায় জড়ানো, জীবন। তার প্রমাণ তো দেখছিস।

—তা দেখছি বটে। কচ ও কেটির মিশ্রযোগ, আর তার সঙ্গে কণিকা দেবীর সরল কৌতুক। কি বলেন, বৌদি?

কণিকা দেবী সলজ্জ হাসলেন।

বললাম, তোর ক্ল্যারিয়োনেটের কি খবর, ললিত?

—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। লাঙ্সে নাকি জোর লাগে, তাই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছি। ব'লে ললিত হাসল।

কণিকা দেবী মাথা নীচু করলেন।

কচ ও কেটির বাক্যহীন রসালাপ ও ছন্দোহীন ছুটোছুটি দেখতে দেখতে মনে সংকল্প এল-যে গুর্পা স্টেশনের এ. এস. এম.-এর অতিথি হিসেবে আরো

ক'টা দিন এখানে থেকে গেলে মন্দ হয় না। জায়গাটা নির্জন ছাড়া আর কোনো দোষে দোষী নয়। মাঝে মাঝে বিনা-পয়সায়—অবশ্য ললিতের খাতিরে—গঝাণ্ডি ও গয়ায় যাতায়াত তো করা যাবে। অতএব থেকে গেলাম।

দিনের বেশির ভাগ সময় কচ ও কেটির রঙ্গ দেখেই কাটতে লাগল। এই দু'টি কুকুর-কুকুরী সর্বদা একটি অপরের ছায়ার মত কখনো মাঠের মাঝে, কখনো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কখনো বা রেললাইনের কাঠের তক্তার উপর দাপাদাপি ক'রে ঘুরে বেড়ায়। কখনো দেখি বহু দূরে লাইনের পাশের তারের বেড়ার গা ঘেঁষে দু'টিতে পাশাপাশি আকাশের দিকে মুখ তুলে ব'সে আছে।

ললিত বলে, ওটা ওদের সঙ্গীতসাধনা। প্রাণের নীরব গান।

হেসে বললাম, কুকুর দু'টোকে বলিহারি দিতে ইচ্ছে করছে। তোকেও কবি করে তুলেছে দেখছি।

গর্বের সুরে ললিত বলে, তা বটে।

ললিত তার কুকুরদের জন্যে ঘর বানিয়েছে খাসা। তার বাসার সামনে ছোট বাগান, বাগানের পাশে কেরোসিন কাঠ দিয়ে বানানো চমৎকার একটি ঘর। এটা নাকি ওদের শাশ্বত বাসরঘর, ললিত বলে।

মাঝে মাঝে ললিত আমার দিবানিদ্রা ভেঙে দেয়, ডেকে বলে, আয়। কুকুরের ঘরে আড়ি পাতি। বেশ লাগে কিন্তু।

ললিতের মাথা খারাপ। সেই ছোঁয়াচে আমারও মাথা খারাপ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে গিয়ে কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখি, কচ ও কেটি জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করছে।

ললিত ফিস্-ফিস্ ক'রে বলল, আস্তে নিশ্বাস ফ্যাল, টের পাবে। ওরা ঘুমোয় নি, জেগে আছে।

দু'জনে বারান্দায় ফিরে আসি। ললিত ডাকে, কেটি—কেটি।

সাড়া নেই।

ললিত আবার ডাকে, কেটি—ই।

কেটি বেরিয়ে আসে, তার পিছে পিছে আসে কচ।

ললিত হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

কুকুর দু'টো যেন অপ্রতিভ হয়ে যায়। ললিত ডাকে—কাম্ হিয়ার।

লেজ নাড়তে নাড়তে দু'টোতে মিলে বারান্দায় উঠে আসে।

ললিত একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে—গো!

দু'টোতে ছুটে চ'লে যায়, আর ফেরে না।

এই লাইনটা সর্বদাই ব্যস্ত। প্যাসেঞ্জার ট্রেন তত নয়, যত মালগাড়ি। বিকেলের দিকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা ইজিচেয়ার নিয়ে এসে গাড়ির সশব্দ যাতায়াত দেখে সময় কাটাই। আর মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দূরে কিংবা কাছে কচ ও কেটির ছুটোছুটি।

সেদিন কচ ও কেটি লাইনের উপর জড়াজড়ি মারামারি ও কামড়াকামড়ি করছে। লাইন ক্লিয়ার দিয়ে ললিত পাশে এসে বসল। কিছুক্ষণ পরে রেললাইনে গুমগুম শব্দ বেজে উঠল, এবং অনতিবিলম্বে এসে গেল মালগাড়ি। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ললিত হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, তার 'হায় হায়' শব্দ চাপা দিয়ে মালগাড়ি মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে গেল।

দু'জনে ছুটে গেলাম। লাইন রক্তময়। কেটি-টা কাটা প'ড়ে দু'খানা হয়ে গেছে। কচ ইতিমধ্যে কেটির গা থেকে রক্ত চাটতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। কচের যেন তেমন বিশেষ কিছু হয়নি, কিন্তু ললিত বড় মুষড়ে পড়েছে।

বললাম, জাহান্নমে যাক। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

ললিত বলল, ইস্, একেবারে দু'খানা হয়ে গেল!—বলেই সে কচ-কে একটা লাথি দিল। কচ কিন্তু লাথি হজম ক'রে নির্বিবাদে কেটির গা চাটতে লাগল।

বললাম, রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ওকে এখন নড়ানো শক্ত।

ললিত বলল, এটাও যে কাটা পড়বে।—ব'লে সে কচকে ধ'রে টানতে লাগল। কচ অনড়। ললিত তবু টানতে লাগল। হঠাৎ কচ দাঁত বার ক'রে ললিতকে প্রায় কামড়াতে উদ্যত হল।

রেগে ললিত বলল, মরুক্। জাতে তো কুকুর, স্বভাব বদলাবে কী ক'রে?

পড়ে রইল ছিন্নবিচ্ছিন্ন কেটি ও রক্তলোলুপ কচ, আমরা ফিরে এলাম। ললিতের যেন পুত্রশোক হয়েছে, সে তেমনি ভাবে হাহাকার করতে লাগল।

এই মৃত্যুসংবাদ শুনে কণিকা দেবীকে বিশেষ ব্যথিত হতে দেখলাম না।

কিছুক্ষণ বাদে আবার রেললাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বিকেল শেষ হয়ে গোধূলির সূচনা দেখা দিয়েছে। দেখলাম, কচ সামনের দু'পা দিয়ে কেটির শব চেপে ধ'রে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মাংস খাচ্ছে। কী বীভৎস এই দৃশ্য! ক্রমে ক্রমে তার সমস্ত মাংস খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন সে চিবতে লাগল কেটির হাড়। হাড়ে যতই কামড় লাগে, কচের ঠোঁট আর দাঁতের মাড়ি কেটে ততই রক্ত বা'র হয়। এবার চলল নিজের রক্ত শোষণের পালা। তারপর কচ হয়রান হয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত, আর সে চুপচাপ ব'সে আছে। এতটুকু শব্দ করছে না। কাছেই-যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ধীরে ধীরে রেললাইন অন্ধকার হয়ে গেল। কচকে আর দেখা গেল না। অন্ধকারের মধ্য থেকে ললিত বলে উঠল, ওরও মৃত্যু আজ লেখা আছে। নাইন ডাউন এসে পড়বে।

বললাম, ডাক না!

ললিত ডাকল, কচ, এই কচ।

অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ করুণ আর্তনাদে কচ সাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সে সাড়া মুহূর্তের মধ্যেই শুব্ধ হয়ে গেল।

সারারাত সে কোথায় কাটাল কে জানে। পরদিন সকালে দেখি কচ

ফিরে এসেছে। অপরাধীর মত গুটিগুটি পায়ে সে তার ঘরে ঢুকল। মুখে তখনও রক্ত ঝরছে।

বললাম, শালা সারারাত হাড় চিবিয়েছে। এমন রাক্ষুসে ক্ষিদে ও কোথায়-যে লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ পাওয়া যায়, আর পায়ের নখ দিয়ে কাঠ আঁচড়াবার শব্দ। এ ছাড়া কিছু না। ললিত একবার কচের ঘরে আড়ি পাতবারও প্রস্তাব করল না, আমার নিজেরও দেখার তেমন আগ্রহ হল না।

সেদিন মাঝরাতে ভীষণ আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। কচের গলার শব্দ। পাশের ঘর থেকে ললিত উঠে এসে বলল, জীবন, চল তো দেখি ওটা অমন চেঁচাচ্ছে কেন ?

বললাম, দ্যুৎ। শুয়ে পড় গিয়ে। মুখের ঘা হয়তো টাটিয়ে উঠেছে।

সকালে কচের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি কচ ঘুমিয়ে। পরে জানা গেল, আর সে জাগবে না।

বললাম, মরবে ছাড়া কি ? কুকুরের মাংস কি কুকুরের সয় ?

কয়েকদিন বাদে আমরা প্রেমতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতে বসে গেলাম। গবেষণায় ঠিক হল, কচের ওটা রাক্ষুসে ক্ষিদে নয়, রাক্ষুসে প্রেম। কেটিকে সে সশরীর গিলে ফেলল প্রেমেরই প্রেরণায়।

মাঝখান থেকে কণিকা দেবী মন্তব্য করে উঠলেন, হ্যাঁ, ভালোবাসা ! পুরুষরা আবার ভালোবাসতে জানে নাকি !

মধু গাঙুলি

রোজ বিকেলে শুদ্ধ মালোপাড়া চমকে ওঠে। গলাটা দারুণ কর্কশ, আর তার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর। এতটুকু রস-কষ নেই। সেই গলায় সে হাঁকে বেলফুল। চেহারাটাও গলারই অনুপাতে নির্দয়। ফিরি করে বেলফুল, কিন্তু লোকটাকে দেখে মনে হয় একটা আসল কসাই।

তার বেসাতি দেখে হাসি পায়। যার ফিরি করার কথা পাঁঠার হাড়, অন্তত চেহারা আর গলার সঙ্গে যা অন্তত কিছুটা খাপ খায়, সে কি না হেঁকে বেড়ায় বেলফুল। হাতে কয়েকটা মালা ঝুলিয়ে, ঝুড়িতে খুচরো ফুল নিয়ে সে হাঁকে।

বেলফুলের ঠাণ্ডা গন্ধটাও ঝাঁঝালো হয়ে ওঠার কথা। সংসর্গের সঙ্গে তাহলে সংগতি কিছুটা অন্তত থাকে।

দুপুরের ঘুমটা বিকেলের দিকে পাৎলা হয়ে আসে, তখন আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় ঘুমের আমেজ উপভোগ করি। এমন সময়—ওই গলা।

একদিন উঠে পড়লাম লাফ দিয়ে, বারান্দায় বেরিয়ে ধমক দেওয়ার মত করে ডাকলাম, এই, এই, এদিকে এস, ইধার আও।

লোকটা কাছে এল। তার হাতের ফুলের দিকে না তাকিয়ে তাকালাম তার মুখের দিকে। রোদের আঁচে মুখের চামড়া ভাজা-ভাজা, খোঁচাখোঁচা দাড়িতে মুখের অনেকটা জায়গা ঢাকা; চোখ-দুটো রক্তজবার মত, চাউনিটাও খুব তেরিয়া।

বলল, লেবেন তো লিন।

আমিও তেতে গেলাম, বললাম, লেব না, তবে কি তোমার মুখ দেখার জন্য ডেকেছি?

উলটো চাপ দিয়ে বললাম, হাঁ করে তো আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ, দর বল।

দরাদরি করে ভাগিয়ে দিলাম লোকটাকে।

দর সুবিধেরই, কিন্তু ওকে সুবিধের মনে হল না। হাঁকই কেবল রুক্ষ নয়, তার বলার ধরনও বড় কাটা-কাটা। তার চোখের দিকে চেয়ে বলে দিলাম, এ ফুল পছন্দ হল না, লাল ফুল কিছু আছে—রক্তজবা?

আমার ব্যঙ্গটা বুঝে থাকবে, বলল, লাল নেই, হলদে আনতে পারি—সরষে ফুল।

ওর মেজাজ দেখে চোখে সরষে ফুলই দেখলাম মনে হল।

লোকটার গলার স্বর শুনে বিরক্ত হয়েছিলাম, ওর চেহারা দেখেও ওকে পছন্দ হয় নি; কিন্তু মেজাজ দেখে ওর সঙ্গে আলাপ করার লোভ হল। যার মেজাজ এমন গরম, সে অমন নরম ফুলের বেসাতি করে কেন—তা জানবার আগ্রহ হল।

পরদিন হাঁক শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, এই, ইধার আও।

আমার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু ইধার না এসে উধার চলে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে গলার স্বর মোলায়েম করে নিলাম। বললাম, এই শোনো, শোনো। এদিকে এস একবার।

ফুলের দরদস্তুর ঠিক করে কয়েকটা বেলকুঁড়ির মালা কিনলাম। দাম চুকিয়ে দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম, দেশ কোথায়?

—চিকোলি। নাগপুর।

—এখানে থাক কোথায়?

—পবা।

সাহেববাজারের কাছাকাছি থাকি আমি। এখান থেকে পবা অনেকটা দূর। খুব কম ক'রে মাইল চার। বড় বড় মোটা মোটা পাথর-বসানো

রাস্তা সটান চলে গেছে রেল-ইস্টিশানের দিকে। সেই বড় রাস্তা থেকে শরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণে—এ রাস্তাটার শেষ কোথায় জানি নে। কিন্তু পবা অনেকটা দূরে এই রাস্তারই ধারে একটা গ্রাম, এটুকু জানি। লোকটা নাকি সেখানে ডেরা বেঁধে আছে অনেকদিন হল। আগে সে বিক্রি করত আনাজ। সাহেববাজারের দিকে নাকি আসত কালে-ভদ্রে, সে যেত নওহাটায়, কখনো-কখনো বা শিবপুরের হাটে। নিজের যা খেত ছিল সেই খেতে সে ফলাত ফসল। কিন্তু দিন নাকি সমান যায় না, জোত-জমি কিছু হাতছাড়া হয়ে. যায়, একা আর পেরে ওঠে না শাক-সব্জি ফলফুলুড়ির তদ্বির করতে। এখন তাই ছোট একটুকরো জমিতে বানিয়েছে একটা বাগিচা। জরু? না, সেসব খতম হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন সে ফুলের কারবার করে, এতে মেহনত কম। এসব তো আর হাটে বেচা চলে না, শহুরে মানুষেই এসব কেনে। তাই পবা থেকে চার মাইল রাস্তা হেঁটে সে এসে যায় সাহেববাজারে, মালোপাড়ায়, রানীবাজারে, ঘোড়ামারায়। সম্বল তার এখন একটা বাগিচা, আর—

বাধা দিয়ে বললাম, নাম কি কর্তার?

—মধু। মধু গাউলি।

এতক্ষণে মনের কথাটা খুলে বললাম। বললাম, ফুল ফিরি করার গলা নেই তোমার। তোমার গলাটা বিশ্রী।

মধু গাউলি হাসল। সে হাসিটায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম বেলফুলের মত ধবধবে দুই সারি দাঁত।

আমি এখানকার আদালতের উকিল। কোর্টে রোজ যাই নে। গিয়ে লাভ নেই। পোষায় না। আদালতে একথা বলতে পারি নে, কিন্তু এখানে কথাটা অকপটে বলা চলে। মক্কেল আমার নেই আদপে। টমটম ভাড়া দিয়ে রোজ-রোজ যাওয়ার মানে হয় না। যেদিন না যাই, সেই দিনটাই লাভ—গাড়িভাড়াটা বেঁচে যায়।

মালোপাড়ায় মধুর সেই ভয়ংকর গলাটা কিছুদিন থেকে আর শোনা যায় না। আমার কথাটা তা হলে হয়তো সে বুঝেছে। প্রায় রোজই আমাকে সে কিছু খুচরো ফুল আর দু-একটা মালা দিয়ে যায়। হাঁক দেয় না, বারান্দায় উঠে জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে বলে, আছেন নাকি ?

দরজা খুলে ওর হাত থেকে মালা নিয়ে নিঃশব্দেই দাম চুকিয়ে দিই। এক-একদিন দুর্ভাবনায় যে না পড়ি, এমন নয়। বাড়িতে শুয়ে থাকি হয়তো টমটম-ভাড়ার পয়সা বাঁচাবার জন্যে, হয়তো কোনো দিন নগদ পয়সাও থাকে না। কিন্তু মধুর জন্যে কিছু পয়সা মজুত রাখতেই হয়। ঘরে শুয়ে সাশ্রয় করার মতলব বানচাল হয়ে গেল। গাড়িভাড়ার পয়সাটা মধু এসে রোজ নিয়ে যায়। ফুলের বিলাসিতা করতে গিয়ে আখেরের কথা ভাবি, আর শঙ্কিত হয়ে উঠি। এইভাবেই যদি গড়িয়ে গড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিই তাহলে জীবনে দানা বাঁধবে কী করে ? ফুলের বিলাস পরিহার করে কাছারিটা রোজ একবার ছুঁয়ে আসাই দরকার। আজকে সাশ্রয় করতে গেলে আগামী কাল নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে যে হয়, এ কথা তো জানাই।

তাই ছেঁড়া শার্টের উপর আলপাকার চকচকে কালো কোট চাপিয়ে বোঁটার ডগায় চুন নিয়ে পান চিবতে চিবতে বেরিয়ে পড়লাম। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার আগ্রহ আমার মধ্যে তাহলে এসেছে—নিজেকে এইভাবে বুঝ দিলাম ঘটে, কিন্তু আসলে এ যে মধু গাউলির হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে পলায়ন—তা আমি নিজেও বুঝতে পারলাম।

জানি নে, লোকটা এসে এর মধ্যে ঘুরে গিয়েছে কি না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যের দিকে আদালত থেকে ফিরে এসে দেখি, জানালার পাশে চেয়ারে দুটি মালা পড়ে আছে। এ যে মধুর কাণ্ড, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার সঙ্গে দেখা না করে তাকে দাম দেওয়া যায় কী করে তাই ভাবছিলাম।

কথায় বলে, লেগে থাকলে মেগে খায় না। নিয়মিতভাবে দিন কয়েক কোর্টে হাজিরা দেওয়ায় কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে গেল। টাকা পাওয়া মাত্র

মেজাজ দরাজ রকম হয়ে গেল, একটা টমটম ভাড়া করে ছুটলাম পবার দিকে। মধু অছিলা মাত্র, এই সুযোগে শহরের আশ-পাশটা দেখে আসাই অবশ্য আসল উদ্দেশ্য।

রাস্তার পাথরে আর টমটমের লোহা-লাগানো চাকায় শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড় করে। চাবুকের লাঠি ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে বাজিয়ে বাজিয়ে ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছে গাড়োয়ান। মাঝে মাঝে নিজের মনের ফুর্তিতেই হেঁকে উঠছে—'চলে গাড়ি পবা-নওহাট্টা'। দু হাতে রাশ টেনে ধরে গাড়োয়ান বলল, পবায় যাবেন কোথায়, বাবু?

বললাম, কোথাও না। বেড়াতে বেরিয়েছি, তোর গাড়িতেই ফিরে আসব। পবার সকলকেই বুঝি চিনিস?

—তা চিনি বই-কি। কটুকুন-বা গাঁ, আর ক'টাই-বা মানুষ।

বলে ফেললাম, মধুকে চিনিস? মধু গাউলি?

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে সে উত্তর দিল, সেই ডাকুটা, যে ফুল বেচে?

—ঠিক ধরেছিস। তার ওখানে নিয়ে চল।

গাড়োয়ান বলল, সে আমাকে দুর থেকে তার বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তফাতে অপেক্ষা করবে।

—তা কেন রে?

—ও যে ডাকু, কে না ডরায়?

—কেন, খুন-টুন করেছে নাকি?

গাড়োয়ান বলল, করে নি। কিন্তু করতে কতক্ষণ। ধরমদাসকে শাসিয়ে দিয়েছে।

ঝুঁকে বসে বললাম, কি জন্যে? কি হয়েছে।

—এক খুপসুরত মেয়ে আছে ওর। উঃ, কী রূপ। পবার রাণী সে। তাকে ধরমদাস সাদি করতে চায়। এ তো বাবু সব্বাই জানে, আপনি শোনেন নি বুঝি?

শুনিনি বলে আক্ষেপই হল। আগে শোনা থাকলে মধুর কাছ থেকে সব গল্পই এতদিনে জানা হয়ে যেত। যাই হোক, গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। মাঠ পার হয়ে আমি মধুর ডেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খড়ে-ছাওয়া ছোট একটা ঘর। ঘরের এক দিকে বেড়া দেওয়া একটা বাগান।

ডাকলাম, মধু, মধু গাউলি বাড়ি আছ।

মধু সাড়া দিল ভিতর থেকে। বেড়ার পাশ দিয়ে উঁকি দিল একটা মুখ। আমি তৈরি ছিলাম না, চমকে উঠলাম। সে মুখ সত্যি একটা মুখ যেন নয়, জীবন্ত একটি সূর্যমুখী। গাড়োয়ানের কথা তাহলে মিথ্যে নয়, পবার রাণীই তো বটে। পশ্চিম-আকাশে এখন যে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে, ওই সূর্যমুখী-মুখে যেন তারই পরিপূর্ণ ছায়াও দেখতে পেলাম। এক ঝলকের দেখা, কিন্তু দু-চোখ তা'তেই অপলক হয়ে গেল।

মধু বেরিয়ে আসা মাত্র ধমকের সুরে বললাম, এসব আরম্ভ করেছ কি। ফুল দিয়ে এসেছ, দাম নিয়ে আস নি।

আজ ধমক খেয়ে হেসে ফেলল মধু। এবড়োখেবড়ো দাড়ি ভরতি মুখ, আর সেই ভয়ংকর ঠোঁটের নীচে বেলফুলের মত ধবধবে সাদা দাঁতের সার।

ওর হাতে পয়সা গুঁজে দিয়েই চলে আসছিলাম। মধু এগিয়ে এসে বলল, থাক, আমি যাব নিয়ে আসব।

আবছা আলোয় দূরে আমার টমটম দাঁড়িয়ে। এখান থেকে ওটাকে কাঠকয়লায় আঁকা একটা ছবির মত দেখাচ্ছে। আমি এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মধু বলল, রাঙা ফুলের কথা বলেছিলেন একদিন, সেটা দেখে যান।

থমকে দাঁড়ালাম। মধু হাঁক দিল, ছুজিয়া।

বাপের ডাক শুনে ছুটে এল সে। মধু সগর্বে বলল, এই আমার মেয়ে।

রাঙা ফুল? মনে মনে বললাম, কিন্তু একে যে এক্ষুনি হলুদ রঙের সূর্যমুখীর সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছি। নোঙরা কাপড় পরনে, মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু

তার মুখের রঙ আর চোখের চাহনিতে যেন ধন্য হয়ে গেছে ময়লা কাপড়খানা আর তেলহীন চুলের রুক্ষতা। সে দাঁড়িয়েছে তার বাপের গা ঘেঁষে। মনে হল, বাজে-পোড়া বটগাছের আশ্রয়ে যেন সদ্য একটা মল্লিকার চারা গজিয়ে উঠেছে। কি বলব ভেবে পেলাম না। নতুন কি বলে সুখ্যাতি করব একে। পবার রাণী বলে তো অভিষিক্ত এ হয়েই গেছে।

এর পর মধু এসেছে অনেকবার। তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করি নি। তার মেয়ের প্রসঙ্গও তুলি নি। মনে মনে ভেবেছি, চোখে যা দেখে এসেছি তা-ই লেগে থাক দুচোখে, বেশি কিছু জানতে গেলে স্বপ্নের মত সেই সৌন্দর্যটা হয়তো ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এক-একবার অনুশোচনাও হয়েছে। ভেবেছি না গেলেই হত পবায়। অকারণে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ আর অশান্তি এনে জড়ো করা হয়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে নির্বিকারভাবে যেমন পড়ে থাকতাম নিজের ঘরে, তেমনি পড়ে থাকাই উচিত ছিল। আখেরের কথা ভাবতে গিয়ে এই অশান্তির দায়ে তাহলে পড়তে হত না।

সত্যি কথা বলতে কি, মধুর কন্যার কথা এখন প্রায় সব সময়ই ভাবি। ভাবি তার বাপের কথাও। এমন বাপ এমন মেয়ে পেল কোত্থেকে।

—ওর মাকে তো তবু দেখেন নি বাবু। এ যদি হয় ফুল, সে ছিল তারা; এ যদি হয় তারা, সে ছিল চাঁদিমা। চিকোলির নাম শুনেছেন, আর হরিনিয়ার ?—এই দুই গাঁয়ের লোক পাগলা বনে গিয়েছিল, বাবু। দুজিয়া যদি পবার রাণী, সে ছিল তবে দুনিয়ার রাণী।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসল মধু গাউলি। অনেকক্ষণ বসে রইল সেইভাবে। মনে হল, সে যেন কাঁদছে।

দু-তিনবার ডেকেও উত্তর না পেয়ে উঠে গিয়ে তার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললাম, এই মধু।

আমারই ভুল হয়েছে, সে কাঁদছিল না। দুই চোখ তার শুকনো, কিন্তু রক্তজবার মত লাল।

—কি হল রে?

—কুছ নেহি।

আর কোনো কথা না বলে উঠে সে চলে গেল।

মজা মন্দ না। কোথাকার একটা কে, তার জন্যে অশান্তির আর উদ্বেগের শেষ নেই। দুনিয়া খুঁজলে এমন কত মধুই হয়তো পাওয়া যাবে, আর এমন কত— থমকে গেলাম, না বোধ'য়, এমন কত দুজিয়া হয়তো পাওয়া যাবে না। কেবল দুজিয়া নয়, সেইদিনকার সেই রক্তসন্ধ্যাটাও লেগে আছে আমার চোখে। প্রত্যহই তো পশ্চিমের আকাশে সেজেগুজে এসে দাঁড়ায় ওই রক্তসন্ধ্যা, আগেও তো কত দিন কত বিচিত্র রঙের বাহার নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। কিন্তু পবার সন্ধ্যাটা সব সন্ধ্যাকে এভাবে ম্লান করে দিল কেন। শুধু কি সন্ধ্যাটাই, সেদিনের সেই দুই-চাকার টমটম গাড়িটাও একটা ছবি মত লেগে আছে চোখে।

পবার পথে আবার একদিন সফরে বের হতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মনে জোর পাই নে। আমি ছাড়া যার কথা সবাই জানে, সেই জানাজানির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সঙ্কোচে জড়োসড়ে হয়ে উঠি।

কেবল বেলফুল নয়, জবা জুঁই আর এক গুচ্ছ সূর্যমুখী এনে রাখল আমার টেবিলে মধু।

বললাম, অছিস কেমন?

—ভালো।

—আর বাড়ির সকলে?

মধু সরাসরি জবাব দিল, কে, দুজিয়া? আচ্ছাই হ্যায়। লেকিন—

কি-যেন বলতে গিয়ে মধু থেমে গেল, দম নিয়ে বলল, লেকিন ওই ধরমদাস—

এ যে শোনা নাম। সোজা হয়ে বসে বললাম, সে কে? কি হল তার?

—কুছ নেহি।

মধু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম, বললাম, দাম, দাম নিয়ে গেলে না?

দাম নাকি সে নেবে না। আজ এটা আমাকেও ভেট হিসেবে দিল। নিজের গাছের ফুল, এতে তার আবার লোকসান কি। মধু হাসল. বলল, আমি ডাকু, আপ ভকিল।

আমাকে তাহলে বুঝি হাতে রাখতে চায়? কখনো কোনো ফ্যাসাদে পড়ে গেলে আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করাতে চায়?

মধু আবার হাসল, অপকটেই বলল, জী হাঁ।

লোকটা তো চলে গেল হাসতে হাসতে। কিন্তু আমি ভয়ংকর দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম। ওর দেওয়া ফুল থেকে যে সুগন্ধ বের হচ্ছে, তাও ভালো লাগল না। অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলাম, খেয়াল হতেই দেখি, আমার হাতে সূর্যমুখীর গুচ্ছটা।

মধু নাকি বরাবর এমন ছিল না। এমন বর্বর আর এমন বীভৎস তাকে বানিয়েছে নাকি পাঁচজন মিলে। বহু দূরের সেই নাগপুর, সেখানকার সেই চিকোলি গাঁ, সেখানে ছিল তার ছোট ঘর আর ছোট সংসার, ছিল তার কয়েক ফালি চাষের খেত। চাষবাস করত দুজনে মিলে—সে আর তার জরু। কিন্তু দিন কি যেমন চাইবে তেমন চলে? সারাটা দিন খেতে খেটে ঘরে ফিরত। দুজিয়ার মা গাইত কাজরি গান, আর সে নাকি সুর বাজাতো কাঠের বাঁশিতে। সেসব এখন খোয়াব। দুজিয়া তখন এতটুকু।

—সব ছিল, বাবু। ছিল না শুধু— মধু শূন্যে বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে বলল, ছিল না শুধু তঙ্কা। তাই রাখতে পারলান না তার মাকে।

—সে বুঝি চলে গেল তোকে ছেড়ে?

ফোঁস করে উঠল মধু, বলল, ছেড়ে যাবার মেয়ে সে নয়। তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

—কে?

একটু স্তব্ধ হয়ে বসে ফের শূন্যে ঝুন দিয়ে সে বলল, তঙ্কা। শেঠ গোবিন্দ। তার টাকা আছে। আমি পারব কেন? কেড়ে নিয়ে চলে গেল। শেঠজী বলে গেল, ও নাকি আমার ঘরে বেমানান।

—তোর বউ কি বলল?

—কুছ নেহি। বলতে দিল কই তাকে? সে শুধু কাঁদতে লাগল। হ্যাঁ, বলেছিল। বলেছিল, আমি যেন সবুর করি, সে ফের ফিরে আসবে। চার বরষ সবুর করেছি, ফিরতে পারেনি। তাই ঘর ছেড়েছি, ডেরা ছেড়েছি, মুলুক ছেড়েছি। ডাকু বনে গিয়েছি।

—খুন-টুন করেছিস নাকি কাউকে।

মধু বলল, না। লেকিন খুন চেপে আছে মাথায়। সাফ করব ওই ধরমদাসকে।

ফের সোজা হয়ে বসে বললাম, সে করেছে কি।

—কুছ নেহি। সাদি করতে চায় তুজিয়াকে।

ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা, বললাম, বিয়েই যখন করতে চায়, তাতে খুন করার কি আছে?

খুন করার নাকি হেতু আছে। ধরমদাসের নাকি তঙ্কা নাই। যার টাকা নাই তাকে সে মেয়ে দেব কেন? সে কি রাখতে পারবে, রুখতে পারবে? ছেলেটা নাকি নওহাটায় মুদির দোকান খুলেছে কিছুদিন হল। তাতে আর পায় কত?

—তোর মেয়ে যদি ভালো হয়—

মধু বলল, ওর মাও আচ্ছা ছিল, কিন্তু রুপেয়া ছিল না আমার। তাই হার হয়ে গেল।

—তবে মেয়ের বিয়ে কি দিবি নে?

—জরুর দেব। তাগত আছে ডঙ্কা আছে এমন জবরদস্ত আদমি যদি পাই।

হেসে উঠলাম, বললাম, তোর মেয়ে যা দেখতে, ঢ্যাঁড়া পিটে দিলে লাখো লাখো লাখোপতি এসে হাজির হবে।

খুব খুশি হয়ে উঠল মধু। দাঁত বার করে হেসে ফেলল। ওই হাসির মধ্যে এক ঝলক যেন দেখতে পেলাম আসল মধুটাকে। বাইরে ওর যে চেহারা, সেটা যেন আসল চেহারা নয়। শেঠ গোবিন্দের দেওয়া একটা আবরণ মাত্র। লোকটা প্রচণ্ড ঘা তাহলে দিয়েছে মধুকে। দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়েছে এক অচেনা অজানা ভিনদেশে।

সে এসে এমন-একটা নির্জন ও নিরিবিলি জায়গা নাকি বেছে নিয়েছে অনেক ভেবে-চিন্তে। যেখানে অনেক টাকার মানুষ নাই, আর মানুষের টাকা নাই। যেখানে চিকোলির মত অত মানুষের ভিড় নাই। এখানে সে তার মেয়েকে যাতে আগলে ঢেকে রাখতে পারে, এই ছিল তার ইচ্ছে। কিন্তু রেহাই কি তার আছে? পবার রাস্তা দিয়ে যে-ই যায়, সেই একবার তাকাবে তার ডেরার দিকে। তুজিয়ার নাম চারদিকে কী করে চালু হয়ে গেল, ভাবলে তার নাকি তাজ্জব লাগে।

সত্যিই তুজিয়ার নাম চালু হয়ে গেছে চারদিকে। আজকাল সাহেব-বাজারেও মেয়েটার রূপের সুখ্যাতি শুনছি। যারা বেশি উৎসাহী, তারা নাকি টমটম চেপে পাখি শিকারের অছিলা করে পবার মাঠে আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। মধু গাউলির নামও ছড়াচ্ছে ক্রমশ। তার মেয়ের কাছে-ভিতে কাকপক্ষী যাতে না আসে, তার জন্যে সে নাকি হুঁশিয়ার। সে নাকি উগ্র আর রুক্ষ মূর্তি ধারণ ক'রে ঘুরে বেড়ায় চারধারে। যতই সে তার এই মূর্তি দেখিয়ে বেড়ায় ততই তার ডাকু নাম চালু হয়।

—কিন্তু বাবু, আমি কি ডাকু? ডাকু হলে কবে সাফ করে দিতাম ওই ধরমদাসকে।

ধরমদাস নাকি খুবই জ্বালাতন আরম্ভ করছে আজকাল। একটু ফাঁক পেলেই এসে বাগিচার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারা করে দুজিয়াকে। তেড়ে যায় নাকি মধু। ধরমদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অমনি হাওয়া হয়ে যায় নাকি নওগাটার পথে।

মধুর কাছে গল্প শুনি, আর মনে হয় এ যেন সত্যিই একটা গল্প। তার সঙ্গে গিয়ে পবার মাঠে দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখার সাধ হয় এক-এক সময়। তামাশা দেখার ছল করে তার বাগানের সূর্যমুখী যদি দেখে আসা যায়, মন্দ হয় না নেহাত। কিন্তু মধু একবারও পিড়াপিড়ি করে না, টানাটানি করে না। মাঝে মাঝে আলগোছে দু-একদিন শুধু বলে তার ডেরার একবার যেতে।

—তোর নাহয় পছন্দ না ধরমদাসকে। কিন্তু তোর মেয়ে কি বলে? তার কি মত।

মধু গুম হয়ে গেল, কোনো উত্তর দিল না।

আবার বললাম, মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিস?

মধু বলল, মেয়েও চায় ওকে, ধরমদাসকে।

পরামর্শ দেওয়ার মত করে বললাম, তাহলে রাজি হয়ে যা। যা যার বরাতে আছে হবেই।

শক্ত হয়ে বসে মধু বলল, উঁহু। হয় না।

যা বুঝেছে, সার বুঝেছে মধু গাউনি। তার রকম দেখে মনে হচ্ছে এতটুকু কথার নড়চড় তার হবে না। শেঠ গোবিন্দ তার জীবনটাকে তাহলে কঠিন করে দিয়ে গেছে। তার নিজের কথা ভেবে, না, দুজিয়ার মায়ের কথা ভেবে সে এমন নির্মম হয়েছে, বোঝা যায় না। কিন্তু নির্মম সে হয়েছে। যুক্তি আছে অবশ্য মধুর। সে বলে, আজ তার মেয়ের চোখ-ছলছল দেখে সে যদি রাজি হয়ে যায় তার কথায়, তাহলে কাল তার সর্বনাশটা সে ঠেকাবে কী করে। ধরমদাসের মনও সে বুঝেছে। তবুও বুঝে-সুজে সে আজ অবুঝ।

বললাম, ফুলের কারবার চলছে কেমন? অনেকদিন ফুলটুল আন না।

মেয়ের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তার নাকি শান্তি নেই। সে নাকি বাগান বাগিচা দেখা বন্ধ করে দিয়েছে প্রায়। রুজি-রোজগার যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্যে যেটুকু বিক্রি না করলে নয়, সেইটুকুই কেবল করে।

আবার পরামর্শ দিলাম, বললাম, ধরমদাসকে ডাক। তাকে ভয় না দেখিয়ে একদিন এখানে নিয়ে এস বলে-কয়ে। দেখি, সে কি বলতে চায়।

মধু আপত্তি ক'রে বলল, হয় না। পেয়ে বসবে তাহলে। তা ছাড়া ভয় একবার ভেঙে গেলে সর্বনাশ।

—অদ্ভুত লোক বটে তুমি।

মধু মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, ঠিক বাবু, ঠিক। এমন মানুষ কখনো যেন না হন, এমন দাগা কোনো গোবিন্দ শেঠ যেন কখনো না দেয়। কারো যেন কলিজা কেউ ছিঁড়ে না নেয় এমন করে।

কেবল মালোপাড়ায় নয়, এ তল্লাটের কোথাও বেলফুলের হাঁক শোনা যাচ্ছে না অনেকদিন ধরে। লোকটা তার কলিজার চিন্তায় হয়তো মশগুল হয়ে গিয়েছে। ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দিনের ঘুম বর্জন করে অর্থ-অর্জনের অজুহাতে শুরু করেছিলাম আদালতে যাতায়াত। কিন্তু ও-পথ হয়তো আমার পথ নয়। কালে-ভদ্রে কখনো-সখনো দু-চার টাকা পেয়ে যাই বটে, কিন্তু তাতে মজুরি পোষায় না। তাই ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার এসে বিছানা নিয়েছি। আবার এসে কান পেতে শুয়ে থাকতে আরম্ভ করেছি, বেলফুলের ধ্বনি বেজে ওঠে কিনা তার প্রতীক্ষা করছি। মধুর ধ্বনিটা তো কিছুতেই আর শুনছি নে, বারান্দায় উঠে জানালা দিয়েও আর উঁকি দিচ্ছে না সে। ধরমদাসের উৎপাত তাহলে হয়তো আরো বেড়েছে, হয়তো সে খাড়া-পাহারায় নিযুক্ত আছে তার ডেরার আড়ালে।

হঠাৎ একদিন মধু এসে হাজির, বিনা নোটিশে, শুধু হাতে। জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। লাফ দিয়ে উঠে বললাম, কে? কে?

—আমি, বাবু, আমি মধু।

ভিতরে এসে সে বসল। তার রুক্ষ মুখখানা দুশ্চিন্তায় ভীষণ ভারি দেখাচ্ছে।

বললাম, খবর কি, মধু।

আশা করছিলাম, এখনি ধরমদাসের নামে অনর্গল অভিযোগ শুনব।

কিন্তু মধু বলল, দুজিয়া। দুজিয়া কথা শুনছে না কিছুতে। বেঁকে বসে আছে।

মধু বলে গেল সব বিবরণ। কেন সে এতদিন ধরে ঘরের বা'র হতে পারে নি। কেন সে আটক হয়ে পড়েছিল তার ডেরায়। ধরমদাস নাকি ঠাণ্ডা হয়েছে। সে নাকি বুঝতে পেরেছে দুজিয়াকে পাওয়া তার বরাতে নেই। একদিন সে নাকি খপ করে ধরে ফেলেছিল ধরমকে, তাকে আচ্ছা করে বকে দিয়েছে। ধরমদাস ছেলেটা নাকি মন্দ না। দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে নাকি ধারণাই বদলে গেছে মধু গাউলির। দুজিয়ার উপর তার যে টান, সে টানে নাকি কোনো ভেজাল নেই—মধু বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুঝেও তার উপায় নেই। সে তার মেয়ের সর্বনাশ করতে পারে না। মেয়ের মনের মত লোকই যদি তার হাতে তুলে দিতে হবে, তাহলে কেন জন্মাল আগুনের মতন অমন রূপ নিয়ে ?

বললাম, খুলে বল। এখন বিপদটা কি ?

—বললাম যে দুজিয়া। ছেলেটার রূপ আছে, আর তার চেয়েও বড় কথা, তঙ্কা আছে। কিন্তু রাজি না দুজিয়া।

মধুর কোনো কথাই বুঝতে পারলাম না। বড়ই এলোমেলো ভাবে কথাগুলি বলতে লাগল। বিরক্তই হচ্ছিলাম। বললাম, যাক গে। তোমার কথা শুনে আমার দরকার নাই।

মধু আমার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম লাল। সে যে ভীষণ সঙ্কটে পড়েছে, তা তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল।

আমার কথায় হয়তো তাপ প্রকাশ করে ফেলেছি, সে সেই টকটকে লাল চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাল খুবই অসহায়ের মত।

বললাম, বল।

ধরম নাকি তার দিলের পরিচয় দিয়েছে। জবর পরিচয়ই নাকি দিয়েছে ধরমদাস। সে নাকি ভুজিয়াকে দিয়ে দিতে রাজি হয়েছে অন্যের হাতে। কিন্তু যার-তার হাতে নাকি সে দেবে না, সে দেবে তার আপনজনের হাতে। মধুর কাছে নিয়ে এসেছিল নাকি সে তার এক ইয়ারকে। এই টাউনেরই মোহন-লালের ব্যাটা, পান্নালাল। অনেক টাকা তার—বিস্তর কাজ-কারবার। মধুর নাকি পছন্দ হয়েছে তাকে। মনে মনে যেমনটি সে ভেবে রেখেছিল, এ ছেলে নাকি ঠিক তেমনটিই। ছেলেটি ধরমদাসের দোস্ত।

মধু একটু থামল, রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, লেকিন—

বললাম, লেকিন আবার কী রে। তাহলে দিয়ে দে। মোহনলালকে সকলকে চেনে। তার ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে পারিস, তাহলে তোর মেয়ের বরাতই নয়, তোরও বরাত বলতে হবে।

কিন্তু মধু আবার নিশ্বাস ফেলে বলল, লেকিন,লেকিন ভুজিয়া এতে গররাজি।

—সে বলে কি ?

—সে বলে ধরমদাস।

ব্যাপারটা তাহলে গুরুতর। তার মেয়ের মনে যে রং লেগেছে, তা বেলফুলের মত সাদা ধবধবে নয়, জবার মতই টুকটুকে রাঙা ; কিংবা সেদিনের সেই সন্ধ্যামেঘের মত রঙ-বেরঙের।

—ধরমদাসকে ঠাণ্ডা করলি, এবার মেয়েকে ঠাণ্ডা কর।

মধু উঠে দাঁড়াল, বলল. তাই করব।

আর কোনো কথা নয়, চলে গেল মধু গাউলি। সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার বুকটা কাঁপতে লাগল দুরদুর করে। ও তো একটা ডাকু। রাগের মাথায় আবার যা-তা সে করে না বসে।

কিন্তু যা-তা করে সে বসেনি। দিন কয়েক বাদে এসে বলে গেল, রাজি সে করিয়েছে। ধরমদাসকে দিয়ে সে বলিয়েছে, তবে নাকি রাজি হয়েছে তার মেয়ে।

বললাম, সাবাস মধু, সাবাস তোর গোঁ।

মধু হেসে বলল, গোঁ আমার কি দেখলেন বাবু, মেয়ের গোঁ যদি দেখতেন।

মধু গাউলির মেয়ের বিয়ে মোহনলালের ছেলের সঙ্গে। শহরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। বুনো ফুল না, বনফুল নাকি নিয়ে আসছে মোহনলাল তার ছেলের জন্যে। এইবার নাকি মেয়েটার আসল রূপ খুলবে। ধুলো-ময়লায় অভাবে-অনটনে যে রূপ ছিল খানিকটা আড়াল করা, এবার চুনিপান্নার ঝকমকে সাজে সেই রূপ নাকি ঝলমল করে উঠবে।

লোকটার ফুলের বেসাতি সার্থক হল। এবার আসল ফুলের তোড়াটাই সে ভেট দিয়ে গেল এই শহরকে—বোয়ালিয়াকে।

মোহনলালের দোকানের সামনে ভিড় জমে। লোকের কৌতূহলের আর সীমা নেই।

মধু ধরে নিয়ে গেল আমাকে। বিয়ে দেখাতে হয়তো ততটা নয়, ধরমদাসের কাণ্ড দেখাতে। সত্যি, কাণ্ডই করেছে ধরমদাস। গাছ কেটে এনে এনে পাতার ঝালর দিয়ে বড় বড় ফটক বানিয়েছে ধরম। দিন-দুই তার নাকি খাওয়া নাই, ঘুম নাই। সে মধুর বাড়ি সাজাচ্ছে। বাগানটা তার ঘরের একটা কোণে, সে বাগান সেখানেই আছে। কিন্তু পাতাবাহারের চারা এনে নওহাটার রাস্তা থেকে মধুর ঘর অবধি বড় মাঠটা ফেলেছে সাজিয়ে। মস্ত একটা বাগানই বানিয়েছে যেন। এর আগে একবার মাত্র এসেছি এখানে। সেই একবারের দেখাতেই জায়গাটা চেনা হয়ে আছে। কিন্তু আজ তা চেনার উপায় রাখেনি ধরমদাস।

মধু ধরমদাসের তারিফ করছিল, আর মেয়ের সৌভাগ্যের জন্যে গর্ব করছিল। ওর মধ্যেই একবার বলল, ওর কলিজা ছাতু হয়ে গেছে।

—কার ?

—ধরমদাসের !

মধু তাহলে ধরমদাসেরও কলিজার খবর রাখে। এত পাতাবাহারের বহর আর ঝাউগাছের ঝালর দেখে তার মধ্যে থেকেও সে-যে কলিজার খবরটা পেয়েছে, এই ঢের।

বললাম, মধু, ভুল করলে না তো ?

মধু বলল, নেহি, পান্নালাল ভি শেঠ আছে।

—মেয়ের কলিজার খবর কিছু বল। আহত সিংহকে খোঁচাই দিলাম হয়তো।

কিন্তু মধু হুঙ্কার দিয়ে উঠল না, বলল, ঠিক হয়ে যাবে। রুপেয়া পাবে, সোনা পাবে, চান্দি পাবে, মোহর পাবে। বিলকুল ভুলে যাবে। —ছলছল করে উঠল মধুর চোখ।

মধুর চোখ ছলছল করে উঠল কেন, হঠাৎ তা ধরতে পারলাম না। একটু পরে মনে হল, এটা বুঝি তার জীবনের অভিযোগ, কিংবা কারো উপর অভিমান।

মধুকে ওসব নিয়ে আর ওস্‌কালাম না। একমনে আমি সত্যসাজানো মধুর বাড়ির চারদিকে তাকাতে লাগলাম। মুদির দোকান নাকি খুলেছে ধরমদাস। কিন্তু সেই মুদির মনের মধ্যেও মৌ আছে। ছক এঁকে নেয়নি, নকশা কষে নেয়নি ; হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই টেনে এনে সে দিব্যি একটা বাগান বানিয়ে তুলেছে পবা-পল্লীর এই তৃণ-ঢাকা মাঠে। একদিন মধুকে সাবাস দিয়েছিলাম মনে পড়ে, আজ ধরমদাসকে ডেকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করেছে।

মধু বলল, ও খাটছে নেশার ঝোঁকে।

—সে কি রে ? গাঁজা-ভাং খায় নাকি ? চমকে উঠে বললাম।

মধু হাসল, বলল, ওসব নেশা নয়। তার চেয়েও বহুৎ কড়া নেশা—মহব্বত।

আড়চোখে তাকালাম মধুর দিকে। লোকটা সব বুঝছে, তবুও নরম হচ্ছে না এতটুকু, এতটুকু মচকাচ্ছে না। আশ্চর্য জিদ বটে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে সে হয়তো দেখছে ধরমদাসের নেশার ঝোঁক। মনে মনে হয়তো দরদও জাগছে একটু-আধটু; কিন্তু তার বাৎ মরদের বাৎ—সে আর নিজের কাছে হার মানতে রাজি নয়।

সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল গ্যাসের আলো। কারবাইডের গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে গেল। ওদিকে বিয়ের আসরের দিকে আরো জোরালো বাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে দেখলাম। তিনটে হ্যাজাক আনা হয়েছে, ধরমদাস উবু হয়ে বসে আলোয় পাম্প্ দিচ্ছে। তার গায়ের সব শক্তি আজ বুঝি সে উজাড় করে দিতে চায়। ঘামে ভেজা মুখ এই আলোয় চিকচিক করছে, গলা বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

ধরমদাসের জীবনে আজ হয়তো চরম ট্রাজিডি। সেই ট্রাজিডির আঘাত চাপা দেওয়ার জন্যেই সম্ভবত তার এই প্রাণপণ উদ্যম।

ভেবেছিলাম, বিয়ে হয়ে যাবার পর ধরমদাস হয়তো কিছু-একটা কাণ্ড করে বসবে। কিন্তু আশ্চর্য, অনেক রাত্রে বিয়ে যখন সত্যিই হয়ে গেল, ওদিকে ব্যাগপাইপের হাওয়া ফুরিয়ে বাঁশির শেষ স্বরটা যখন শূন্যে মিলিয়ে গেল, তখন আমি ধরমদাসের সন্ধানে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখি পান্নালালের কানে কানে সে কথা বলছে আর ইশারা করে তার নতুন বউকে দেখিয়ে মশকরা করছে। পাৎলা ওড়নার জাল ভেদ করে দুজিয়ার রূপ তখন হ্যাজাকের তেজী আলোর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে।

আশ্চর্য সহ্যগুণ বটে ছোকরার। মধুর ভাষায় বলতে গেলে—নিজের কলিজাটা উপড়ে নিয়ে সে ভেট দিয়েছে তার দোস্তকে। একেই দোস্তী বলে, না, একেই বলে মহব্বত?—মধুর এ কথার জবাব দিতে পারিনি।

মধু টাউন ছেড়ে চলে গেছে। এইখানেই এই কাহিনী শেষ হওয়ার কথা। আর তো কিছুই বলার কথাও নেই। যে টাউনে মেয়ে লাখপতির ঘরে চুনি-পান্নায় সেজে বসে আছে, সেই টাউনে সেই মেয়ের বাপ রাস্তায়-রাস্তায় ফুল ফিরি করে বেড়াতে পারে না।

সুতরাং বোয়ালিয়া আজ বেলফুলের হাঁক শুনতে ভুলে গেছে। ক্রমশ ছুজিয়ার কথাও বোয়ালিয়াবাসীর মন থেকে মুছে যায়। ধরমদাসের মন থেকেও হয়তো ঠিক এমনিভাবেই মুছে গেছে ছুজিয়া।

এইখানে উপসংহার টেনে অনেক রাত্রে কাগজপত্র গোছগাছ করে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মন বেশ প্রফুল্ল বোধ হতে লাগল। এতটুকু না ফুলিয়ে বা না ফাঁপিয়ে ঘটনাটাকে যে সাজিয়ে-গুছিয়ে অবিকল লিখে ফেলা গেছে, এতে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। আদালতে যার কোনো পশার নেই, তার সময় কাটাবার জন্যে মধু যে এই মসলাটুকু দিয়ে গেছে চোখ বুজে সেজন্য মধুকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনে হল, বেশ জমে গেছে কাহিনীটা, শেষটাও হয়েছে বেশ ট্রাজিক। পাঠকের মন চট করে দখল করার উপযুক্ত ঘটনাই বটে। তৃপ্তিতে ভরে গেল মন, আত্মবিশ্বাসও এসে গেল অগাধ। মনে হল, গল্প লেখা এমন-একটা কিছু হৈহৈ-রৈরৈ ব্যাপার নয়। সংকল্পও করে ফেললাম, আদালত বাদ দিয়ে এবার এই লাইনেই সবটা মন দিতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরের দিকে হৈহৈ-রৈরৈ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তা দিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। লাফ দিয়ে উঠে বাইরে এলাম। ব্যাপার কি? মোহনলালের ছেলে পান্নালাল নাকি খুন হয়েছে।

—কোথায়? কি ক'রে।

কেউ কিছু জানে না। আগুনের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। তাই সমস্ত শহরটাই ছুটছে একদিকে।

মুশকিলেই পড়া গেল। যে-কাহিনীর উপসংহার টানা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আবার এই টানাটানি কেন।

চোখ থেকে ঘুম রগড়ে মুছে ফেলতে ফেলতে ছুটলাম আমিও। কিন্তু মোহনলালের বাড়ির ত্রিসীমানায় পৌছবার উপায় নেই। লোকে লোকারণ্য, আর পুলিশের ভিড়। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। অথচ প্রত্যেকেই একটা-না-একটা বিবরণ দেয়। বেগতিক দেখে চলে এলাম।

দুপুরের দিকে একটু-একটু করে কিছু খবর পাওয়া গেল। মাঝ রাত্রে নাকি এই কাণ্ডটা ঘটেছে। দুজিয়ার বিকট চীৎকার শুনে নাকি বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়, তারা ছুটে যায় উপর-তলার ঘরে, দুজিয়া তখন নাকি ঘরময় দাপাদাপি করছে। ইতিমধ্যে একটা ছায়ামূর্তি নাকি প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। সবাই স্পষ্ট দেখেছে। রক্তমাখা ছুরিটা নাকি ঘরের মধ্যেই পড়ে ছিল।

প্রথমেই আমার মনে হল, মধুর কথা। লোকটা তো রগ-চটা, আর ডাকু বলে সকলেই তাকে জানে—ওই হয়তো করেছে এই কাণ্ড। কিন্তু অনেকদিন তো সে শহর-ছাড়া।

বিকেলের দিকে দুজিয়া একটু শান্ত হলে তার জবানবন্দী নাকি নেওয়া হয়েছে। সে কিছু গোপন করেনি, পরিষ্কারভাবে সে তার জীবনের সব ঘটনা নাকি বলে দিয়েছে অকপটে। সেই জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে পুলিশের নাকি সন্দেহ হয়েছে ধরমদাসের উপর, সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই নওহাটায় তাকে তাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধরমদাসের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ভড়কে গেলাম। তার মত নিরীহের উপর যদি পুলিশের সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে আমার উপর হতেই-বা কতক্ষণ। আমিও তো জড়িয়ে পড়েছিলাম ওদের সঙ্গে। তাছাড়া যে কাহিনীটা লিখে রেখেছি তার মধ্যেও তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করা আছে যে, ওই সূর্যমুখী আমার মনেও একটু রঙের ছোপ লাগিয়েছিল। লেখাটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েছিলাম;

কিন্তু মায়া হল। তাই পুরনো বইপত্রের মাঝখানে গুঁজে রেখে দিলাম।

যে আদালতের মায়া ত্যাগ করে মনকে অন্য পথে চালনা করব বলে সংকল্প করে ফেলেছিলাম, সেই আদালতই এবার আমাকে টানতে লাগল। রোজ যেতে শুরু করলাম কোর্টে। পান্নালাল-খুনের মামলা চলেছে। আদালত সরগম।

সাক্ষী-সাবুদের শেষ নেই, মোহনলাল থেকে শুরু করে তার বাড়ির কনিষ্ঠতম চাকরটিকে পর্যন্ত হাজির করা হচ্ছে। যে যেটুকু জানে সে তাই বলে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে সুরাহার কোনো ইঙ্গিৎই জুটছে না। পেশার আমার নেই বটে, কিন্তু আইন যখন পাশ করতে হয়েছে তখন তার ধারা-উপধারার সামান্য কিছু অন্তত বুঝি। আমার বুদ্ধিতে তো এ মামলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কো া ধারণাই হল না।.

আসামীর কাঠগড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ধরমদাস। একটা পাথরের মূর্তির মত। সে যেন এইসব ব্যাপারে স্তব্ধ আর বোবা হয়ে গেছে। একটা কথা বলে না, একটা আপত্তি জানায় না।

কয়েকদিন বাদে আদালতে এল পবার রাণী। রূপের বন্যায় ভেসে গেল আদালত-প্রাঙ্গণ আর বিচার-গৃহ। সূর্যমুখীকে আজ দেখাচ্ছে এক অপরাজিতার মত।

এতটুকু গলা কাঁপল না তুজিয়ার। কোনো সংকোচও তার নেই, কোনো শঙ্কাও নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গলায় সে সব কথার জবাব দিতে লাগল।

হ্যাঁ, প্রেম তার ছিল ধরমদাসের সঙ্গে। তার সাদির পরেও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হত। প্রকাশ্যেও, গোপনেও। তার উপর ধরমদাসের কেন, ধরমদাসের উপরও তার টান ছিল। এ কথা প্রকাশ করায় আজ আর তার ভয় নেই।

কোনো দিকে না তাকিয়ে মাথা নীচু করে বলে গেল ছুজিয়া। জবানবন্দীতে সে যা বলেছে, আদালতের এতলোকের সামনেও সে সেই কথাই বলতে লাগল। গলা কাঁপল না।

তারা দুজনেই দুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পাগল হয়ে থাকত নাকি। একদিন দেখা না হলে মন-মেজাজ বিগড়ে যেত, সব আঁধার ঠেকত। পান্নালাল একটু-একটু বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা। যেদিন ধরমদাস টের পেল যে, পান্না একটু-আধটু জেনেছে, সেই দিন থেকে ধরম বন্ধ করে দিল আসা।

—তার পর?

তার পর কেটে গেল দু বরষ। এবার রথের সময় পান্নার সঙ্গে সে গিয়েছিল মেলায়, শিবপুরে। সেখানে হঠাৎ ধরমের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে ধরমের চোখ নাকি ভিজে ওঠে, সে তার পাশে এসে বলে, তার জীবন নাকি ফাঁকি হয়ে গেছে, ফাঁকা হয়ে গেছে।

—তার পর?

তার কয়েকদিন পর খুন হয়ে গেল পান্নালাল।

আদালত থেকে প্রশ্ন করা হল, কে খুন করেছে, দেখেছ তাকে?

ছুজিয়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, ঘাড় নেড়ে জানাল, সে দেখেছে।

—তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

—পারব?

মামলা প্রায় খতম হয়ে এসেছে। সারা আদালত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছুজিয়ার শেষ কথাটার উপর। কিন্তু ধরমদাস অটল।

আদালত আঙুল দিয়ে বলল, একে চেন?

ছুজিয়া এবার চোখ তুলল, সরাসরি তাকাল ধরমদাসের দিকে। ধরমদাস নিশ্চল, কিন্তু থরথর করে একবার মাত্র কেঁপে উঠল তার ঠোঁট দুটো।

—চিনি। ধরমদাস।

—এই তবে সেই খুনী ?

ডুজিয়া একটু থামল, একটা অসহ্য আবেগে চোখ বুজে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে উঠল, নেহি, নেহি।

আশ্চর্য, পাগলা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ ডিঙিয়ে নদীর উজান স্রোত উপেক্ষা করে এ যেন ঘাটের পাষাণে লেগে নৌকাডুবির মত।

সারা আদালত কিনারার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছিল, এক নিমেষের মধ্যে সকলে সদলে যেন তলিয়ে গেল।

অনেক চাপ দেওয়া হল ডুজিয়াকে। কিন্তু তার কথার নড়চড় নেই। সে খুনীকে দেখেছে বলেই সে খুনী ধরমদাসই, তা কেন। ধরমদাস তাকে চায় বলেই সে তার দোস্তকে জবাই করবে, তা কেন। খুনীকে ধরে এনে দেখিয়ে দাও, সে চিনতে পারবে; কিন্তু তার চেনা লোককে ধরে আনলেই তাকে খুনী বলে দেখিয়ে দিতে হবে, তা কেন।

বড় বিপদেই ফেলল সকলকে এই গাউলি মেয়ে। তার মুখ থেকে একটা কথা পেলেই ধরমদাসকে লটকে দেওয়া যায়। জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে তোলা হল ডুজিয়াকে। কিন্তু তার কথার নড়চড় নেই।

ধরমদাস কাঠগড়ার রেলিঙে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর ডুজিয়ার দিকে। মনে পড়ছিল ডুজিয়ার বিয়ের রাত্রের সেই সমারোহ, পাতাবাহারের সেই বাহার, আর হ্যাজাকের সেই তীব্র আলোর ছটা।

অগত্যা। ধরমদাসকে আর ধরে রাখা যায় না। তাকে খালাসই দিতে হল।

ডুজিয়া নেমে চলে যাচ্ছিল কাঠগড়া থেকে, ধরমদাস দু পা এগিয়ে এল তার কাছে— হয়তো কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। কিন্তু তাচ্ছিল্য, ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা, ঘৃণা— কী নয়— একসঙ্গে সব ফুটে উঠল ডুজিয়ার মুখে। ধরমদাসের দিকে অবহেলার দৃষ্টিপাত করে এগিয়ে গেল ডুজিয়া। নির্মম গলায় বলল, পথ ছোড়ো।

থমকে গেল ধরমদাস। দুজিয়ার এই গলা শুনে সে যেন চমকে গেল। তবু আবার এগলো আর এক পা। অনুনয়ের সুরে বলল, তবে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে কেন ?

ব্যঙ্গের হাসি হাসল দুজিয়া, এবং হয়তো-বা বিদ্রূপেরও। সন্ধ্যার সূর্যমুখীর মত তার মুখখানা ম্লান ও বিবর্ণ। কোনো কথা সে বলল না। মোহনলালের ঝকঝকে মোটর গাড়িতে চেপে হুশ করে চলে গেল। আদালতের বারান্দা থেকে একটা বিরাট জনতা এই দৃশ্য দেখল।

ভিড় পাৎলা হয়ে গেলে নেমে যাচ্ছিলাম। সিঁড়ির উপর, এ কে ? মধু ?

মধু উঠে দাঁড়াল, বলল, খবর শুনে সে এসেছে কয়েকদিন হল।

—কোথায় থাক এখন ? জিজ্ঞাসা করলাম।

—ডিব্রুগড়। তেল-খনিতে খাটি।

বললাম, দেখলে ব্যাপারটা ?

মধু হাসল, বলল, আমার ডাকু নামটা বিলকুল মুফত। ধরমদাস আছে সাচ্চা চিজ।

হঠাৎ মধুর চোখ রাঙা হয়ে উঠল জবাফুলের মত। বলল, চলি বাবু-সাহেব।

—কোথায় চললে ? ডিব্রুগড়ে ?

রুখে দাঁড়াল মধু গাউলি, তার মূর্তি দেখে মনে হল তার মাথায় খুন চেপে গেছে, বলল, নেহি। চিকোলি।